জীবনস্মৃতি

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২১০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২১০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
প্রকাশক—রায়সাহেব শ্রীজগদানন্দ রায়।

জীবনস্মৃতি

পুনর্মুদ্রণ (১১০০) মাঘ, ১৩৩৫

শান্তিনিকেতন প্রেস। শান্তিনিকেতন, (বীরভূম)।
রায়সাহেব শ্রীজগদানন্দ রায় কর্তৃক মুদ্রিত।

জীবন-স্মৃতি

স্মৃতির পটে জীবনের ছবি কে আঁকিয়া যায় জানি না। কিন্তু যেই আঁকুক সে ছবিই আঁকে। অর্থাৎ যাহা কিছু ঘটিতেছে তাহার অবিকল নকল রাখিবার জন্য সে তুলি হাতে বসিয়া নাই। সে আপনার অভিরুচি অনুসারে কত কি বাদ দেয় কত কি রাখে। কত বড়োকে ছোটো করে, ছোটোকে বড়ো করিয়া তোলে। সে আগের জিনিষকে পাছে ও পাছের জিনিষকে আগে সাজাইতে কিছুমাত্র দ্বিধা করে না। বস্তুত তাহার কাজই ছবি আঁকা, ইতিহাস লেখা নয়।

এইরূপে জীবনের বাহিরের দিকে ঘটনার ধারা চলিয়াছে, আর ভিতরের দিকে সঙ্গে সঙ্গে ছবি আঁকা চলিতেছে! দুয়ের মধ্যে যোগ আছে অথচ দুই ঠিক এক নহে।

আমাদের ভিতরের এই চিত্রপটের দিকে ভালো করিয়া

তাকাইবার আমাদের অবসর থাকে না। ক্ষণে ক্ষণে ইহার এক একটা অংশের দিকে আমরা দৃষ্টিপাত করি। কিন্তু ইহার অধিকাংশই অন্ধকারে অগোচরে পড়িয়া থাকে। যে চিত্রকর অনবরত আঁকিতেছে, সে যে কেন আঁকিতেছে, তাহার আঁকা যখন শেষ হইবে তখন এই ছবিগুলি যে কোন্ চিত্রশালায় টাঙাইয়া রাখা হইবে, তাহা কে বলিতে পারে।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একদিন কেহ আমাকে আমার জীবনের ঘটনা জিজ্ঞাসা করাতে একবার এই ছবির ঘরে খবর লইতে গিয়াছিলাম। মনে করিয়াছিলাম জীবন-বৃত্তান্তের দুই চারিটা মোটামুটি উপকরণ সংগ্রহ করিয়া ক্ষান্ত হইব। কিন্তু দ্বার খুলিয়া দেখিতে পাইলাম জীবনের স্মৃতি জীবনের ইতিহাস নহে—তাহা কোন্ এক অদৃশ্য চিত্রকরের স্বহস্তের রচনা। তাহাতে নানা জায়গায় যে নানা রঙ পড়িয়াছে তাহা বাহিরের প্রতিবিম্ব নহে, সে রঙ তাহার নিজের ভাণ্ডারের; সে রঙ তাহাকে নিজের রসে গুলিয়া লইতে হইয়াছে—সুতরাং পটের উপর যে ছাপ পড়িয়াছে তাহা আদালতে সাক্ষ্য দিবার কাজে লাগিবে না।

এই স্মৃতির ভাণ্ডারে অত্যন্ত যথাযথরূপে ইতিহাস সংগ্রহের চেষ্টা ব্যর্থ হইতে পারে কিন্তু ছবি দেখার একটা নেশা আছে, সেই নেশা আমাকে পাইয়া বসিল। যখন পথিক যে পথটাতে চলিতেছে বা যে পান্থশালায় বাস করিতেছে তখন সে পথ বা সে পান্থশালা তাহার কাছে ছবি নহে,—তখন তাহা অত্যন্ত বেশি প্রয়োজনীয় এবং অত্যন্ত

অধিক প্রত্যক্ষ। যখন প্রয়োজন চুকিয়াছে, যখন পথিক তাহা পার হইয়া আসিয়াছে তখনই তাহা ছবি হইয়া দেখা দেয়। জীবনের প্রভাতে যে-সকল সহর এবং মাঠ, নদী এবং পাহাড়ের ভিতর দিয়া চলিতে হইয়াছে, অপরাহ্নে বিশ্রাম-শালায় প্রবেশের পূর্ব্বে যখন তাহার দিকে ফিরিয়া তাকানো যায়, তখন আসন্ন দিবাবসানের আলোকে সমস্তটা ছবি হইয়া চোখে পড়ে। পিছন ফিরিয়া সেই ছবি দেখার যখন অবসর ঘটিল, সে দিকে একবার যখন তাকাইলাম, তখন তাহাতেই মন নিবিষ্ট হইয়া গেল।

মনের মধ্যে যে ঔৎসুক্য জন্মিল তাহা কি কেবলমাত্র নিজের অতীত জীবনের প্রতি স্বাভাবিক মমত্বজনিত? অবশ্য মমতা কিছু না থাকিয়া যায় না—কিন্তু ছবি বলিয়াই ছবিরও একটা আকর্ষণ আছে। উত্তর-রামচরিতের প্রথম অঙ্কে সীতার চিত্তবিনোদনের জন্য লক্ষ্মণ যে ছবিগুলি তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহাদের সঙ্গে সীতার জীবনের যোগ ছিল বলিয়াই যে তাহারা মনোহর তাহা সম্পূর্ণ সত্য নহে।

এই স্মৃতির মধ্যে এমন কিছু নাই যাহা চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবার যোগ্য। কিন্তু বিষয়ের মর্য্যাদার উপরেই যে সাহিত্যের নির্ভর তাহা নহে; (যাহা ভালো করিয়া অনুভব করিয়াছি তাহাকে অনুভবগম্য করিয়া তুলিতে পারিলেই মানুষের কাছে তাহার আদর আছে।) নিজের স্মৃতির মধ্যে যাহা চিত্ররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাকে কথার মধ্যে ফুটাইতে পারিলেই তাহা সাহিত্যে স্থান পাইবার যোগ্য।

এই স্মৃতি-চিত্রগুলিও সেইরূপ সাহিত্যের সামগ্রী। ইহাকে জীবন-বৃত্তান্ত লিখিবার চেষ্টা হিসাবে গণ্য করিলে ভুল করা হইবে। সে হিসাবে এ লেখা নিতান্ত অসম্পূর্ণ এবং অনাবশ্যক।

শিক্ষারম্ভ

আমরা তিনটি বালক একসঙ্গে মানুষ হইতে ছিলাম। আমার সঙ্গী দুটি আমার চেয়ে দুই বছরের বড়ো। তাঁহারা যখন গুরুমহাশয়ের কাছে পড়া আরম্ভ করিলেন আমারও শিক্ষা সেই সময়ে সুরু হইল কিন্তু সে কথা আমার মনেও নাই।

কেবল মনে পড়ে, "জল পড়ে পাতা নড়ে।" তখন "কর, খল" প্রভৃতি বানানের তুফান কাটাইয়া সবেমাত্র কূল পাইয়াছি। সেদিন পড়িতেছি, "জল পড়ে পাতা নড়ে।" আমার জীবনে এইটেই আদিকবির প্রথম কবিতা। সে দিনের আনন্দ আজও যখন মনে পড়ে তখন বুঝিতে পারি কবিতার মধ্যে মিল জিনিষটার এতো প্রয়োজন কেন। মিল আছে বলিয়াই কথাটা শেষ হইয়াও শেষ হয় না—তাহার

বক্তব্য যখন ফুরায় তখনো তাহার ঝঙ্কারটা ফুরায় না—মিলটাকে লইয়া কানের সঙ্গে মনের সঙ্গে খেলা চলিতে থাকে। এমনি করিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া সেদিন আমার সমস্ত চৈতন্যের মধ্যে জল পড়িতে ও পাতা নড়িতে লাগিল।

এই শিশুকালের আর একটা কথা মনের মধ্যে বাঁধা পড়িয়া গেছে। আমাদের একটি অনেক কালের খাজাঞ্চি ছিল, কৈলাস মুখুয্যে তাহার নাম। সে আমাদের ঘরের আত্মীয়েরই মতো। লোকটি ভারি রসিক। সকলের সঙ্গেই তাহার হাসি তামাসা। বাড়িতে নূতনসমাগত জামাতা-দিগকে সে বিদ্রূপে কৌতুকে বিপন্ন করিয়া তুলিত। মৃত্যুর পরেও তাহার কৌতুকপরতা কমে নাই এরূপ জনশ্রুতি আছে। একসময়ে আমার গুরুজনেরা প্ল্যাঞ্চেট-যোগে পরলোকের সহিত ডাক বসাইবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত ছিলেন। একদিন তাঁহাদের প্ল্যাঞ্চেটের পেন্সিলের রেখায় কৈলাস মুখুয্যের নাম দেখা দিল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, তুমি যেখানে আছ সেখানকার ব্যবস্থাটা কিরূপ, বল দেখি। উত্তর আসিল, আমি মরিয়া যাহা জানিয়াছি, আপনারা বাঁচিয়াই তাহা ফাঁকি দিয়া জানিতে চান? সেটি হইবে না।

সেই কৈলাস মুখুয্যে আমার শিশুকালে অতি দ্রুতবেগে মস্ত একটা ছড়ার মতো বলিয়া আমার মনোরঞ্জন করিত। সেই ছড়াটার প্রধান নায়ক ছিলাম আমি এবং তাহার মধ্যে একটি ভাবী নায়িকার নিঃসংশয় সমাগমের আশা অতিশয় উজ্জ্বলভাবে বর্ণিত ছিল। এই যে ভুবনমোহিনী বধূটি

ভবিতব্যতার কোল আলো করিয়া বিরাজ করিতেছিল ছড়া শুনিতে শুনিতে তাহার চিত্রটিতে মন ভারি উৎসুক হইয়া উঠিত। আপাদমস্তক তাহার যে বহুমূল্য অলঙ্কারের তালিকা পাওয়া গিয়াছিল এবং মিলনোৎসবের যে অভূতপূর্ব্ব সমারোহের বর্ণনা শুনা যাইত তাহাতে অনেক প্রবীণবয়স্ক সুবিবেচক ব্যক্তির মন চঞ্চল হইতে পারিত—কিন্তু বালকের মন যে মাতিয়া উঠিত এবং চোখের সাম্‌নে নানাবর্ণে বিচিত্র আশ্চর্য্য সুখচ্ছবি দেখিতে পাইত তাহার মূল কারণ ছিল সেই দ্রুত উচ্চারিত অনর্গল শব্দচ্ছটা এবং ছন্দের দোলা। শিশুকালের সাহিত্যরসসম্ভোগের এই দুটো স্মৃতি এখনো জাগিয়া আছে—আর মনে পড়ে, "বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এলো বান।" ঐ ছড়াটা যেন শৈশবের মেঘদূত।

তাহার পরে যে কথাটা মনে পড়িতেছে, তাহা ইস্কুলে যাওয়ার সূচনা। একদিন দেখিলাম দাদা এবং আমার বয়োজ্যেষ্ঠ ভাগিনেয় সত্য, ইস্কুলে গেলেন, কিন্তু আমি ইস্কুলে যাইবার যোগ্য বলিয়া গণ্য হইলাম না। উচ্চৈঃস্বরে কান্না ছাড়া যোগ্যতা প্রচার করার আর কোনো উপায় আমার হাতে ছিলনা। ইহার পূর্ব্বে কোনো দিন গাড়িও চড়ি নাই, বাড়ির বাহিরও হই নাই, তাই সত্য যখন ইস্কুল-পথের ভ্রমণ-বৃত্তান্তটিকে অতিশয়োক্তি অলঙ্কারে প্রত্যহই অত্যুজ্জ্বল করিয়া তুলিতে লাগিল তখন ঘরে আর মন কিছুতেই টিঁকিতে চাহিল না। যিনি আমাদের শিক্ষক ছিলেন তিনি আমার মোহ বিনাশ করিবার জন্য প্রবল চপেটাঘাতসহ এই

সারগর্ভ কথাটি বলিয়াছিলেন :—"এখন ইস্কুলে যাবার জন্য যেমন কাঁদিতেছ, না যাবার জন্য ইহার চেয়ে অনেক বেশি কাঁদিতে হইবে।" সেই শিক্ষকের নাম ধাম আকৃতি প্রকৃতি আমার কিছুই মনে নাই—কিন্তু সেই গুরুবাক্য ও গুরুতর চপেটাঘাত স্পষ্ট মনে জাগিয়াছে। এত বড়ো অব্যর্থ ভবিষ্যদ্বাণী জীবনে আর কোনোদিন কর্ণগোচর হয় নাই।

কান্নার জোরে ওরিয়েণ্টাল সেমিনারিতে অকালে ভর্তি হইলাম। সেখানে কী শিক্ষালাভ করিলাম মনে নাই কিন্তু একটা শাসন-প্রণালীর কথা মনে আছে। পড়া বলিতে না পারিলে ছেলেকে বেঞ্চে দাঁড় করাইয়া তাহার দুই প্রসারিত হাতের উপর ক্লাসের অনেকগুলি শ্লেট একত্র করিয়া চাপাইয়া দেওয়া হইত। এরূপে ধারণাশক্তির অভ্যাস বাহির হইতে অন্তরে সঞ্চারিত হইতে পারে কি না তাহা মনস্তত্ত্ববিদ্‌দিগের আলোচ্য।

এমনি করিয়া নিতান্ত শিশুবয়সেই আমার পড়া আরম্ভ হইল। চাকরদের মহলে যে সকল বই প্রচলিত ছিল তাহা লইয়াই আমার সাহিত্যচর্চ্চার সূত্রপাত হয়। তাহার মধ্যে চাণক্যশ্লোকের বাংলা অনুবাদ ও কৃত্তিবাস রামায়ণই প্রধান। সেই রামায়ণ পড়ার একটা দিনের ছবি মনে স্পষ্ট জাগিতেছে।

সেদিন মেঘলা করিয়াছে ; বাহিরবাড়িতে রাস্তার ধারের লম্বা বারান্দাটাতে খেলিতেছি। মনে নাই সত্য কী কারণে আমাকে ভয় দেখাইবার জন্য হঠাৎ "পুলিস্‌ম্যান্" "পুলিস্-

ম্যান্‌” করিয়া ডাকিতে লাগিল। পুলিস্‌ম্যানের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে অত্যন্ত মোটামুটি রকমের একটা ধারণা আমার ছিল। আমি জানিতাম একটা লোককে অপরাধী বলিয়া তাহাদের হাতে দিবামাত্রই, কুমীর যেমন খাঁজকাটা দাঁতের মধ্যে শিকারকে বিদ্ধ করিয়া জলের তলে অদৃশ্য হইয়া যায় তেমনি করিয়া হতভাগ্যকে চাপিয়া ধরিয়া অতলস্পর্শ থানার মধ্যে অন্তর্হিত হওয়াই পুলিস কর্ম্মচারীর স্বাভাবিক ধর্ম্ম। এরূপ নির্ম্মম শাসনবিধি হইতে নিরপরাধ বালকের পরিত্রাণ কোথায় তাহা ভাবিয়া না পাইয়া একেবারে অন্তঃপুরে দৌড় দিলাম ;—পশ্চাতে তাহারা অনুসরণ করিতেছে এই অন্ধভয় আমার সমস্ত পৃষ্ঠদেশকে কুণ্ঠিত করিয়া তুলিল। মাকে গিয়া আমার আসন্ন বিপদের সংবাদ জানাইলাম ; তাহাতে তাঁহার বিশেষ উৎকণ্ঠার লক্ষণ প্রকাশ পাইল না। কিন্তু আমি বাহিরে যাওয়া নিরাপদ বোধ করিলাম না। দিদিমা—আমার মাতার কোনো এক সম্পর্কে খুড়ি—যে কৃত্তিবাসের রামায়ণ পড়িতেন সেই মার্ব্বেল কাগজ মণ্ডিত কোণ-ছেঁড়া-মলাটওয়ালা মলিন বইখানি কোলে লইয়া মায়ের ঘরের দ্বারের কাছে পড়িতে বসিয়া গেলাম। সম্মুখে অন্তঃপুরের আঙিনা ঘেরিয়া চৌকোণ বারান্দা ; সেই বারান্দায় মেঘাচ্ছন্ন আকাশ হইতে অপরাহ্ণের ম্লান আলো আসিয়া পড়িয়াছে। রামায়ণের কোনো একটা করুণ বর্ণনায় আমার চোখ দিয়া জল পড়িতেছে দেখিয়া দিদিমা জোর করিয়া আমার হাত হইতে বইটা কাড়িয়া লইয়া গেলেন।

ঘর ও বাহির

আমাদের শিশুকালে ভোগবিলাসের আয়োজন ছিলনা বলিলেই হয়। মোটের উপরে তখনকার জীবনযাত্রা এখনকার চেয়ে অনেক বেশি সাদাসিধা ছিল। তখনকার কালের ভদ্রলোকের মানরক্ষার উপকরণ দেখিলে এখনকার কাল লজ্জায় তাহার সঙ্গে সকল প্রকার সম্বন্ধ অস্বীকার করিতে চাহিবে। এই তো তখনকার কালের বিশেষত্ব, তাহার পরে আবার বিশেষভাবে আমাদের বাড়িতে ছেলেদের প্রতি অত্যন্ত বেশি দৃষ্টি দিবার উৎপাত একেবারেই ছিলনা। আসলে, আদর করা ব্যাপারটা অভিভাবকদেরই বিনোদনের জন্য, ছেলেদের পক্ষে এমন বালাই আর নাই।

আমরা ছিলাম চাকরদেরই শাসনের অধীনে। নিজেদের কর্ত্তব্যকে সরল করিয়া লইবার জন্য তাহারা আমাদের নাড়াচাড়া একপ্রকার বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। সেদিকে বন্ধন যতই কঠিন থাক্ অনাদর একটা মস্ত স্বাধীনতা—সেই স্বাধীনতায় আমাদের মন মুক্ত ছিল। খাওয়ানো পরানো সাজানো গোজানোর দ্বারা আমাদের চিত্তকে চারিদিক হইতে একেবারে ঠাসিয়া ধরা হয় নাই।

আহারে আমাদের সৌখিনতার গন্ধও ছিল না। কাপড় চোপড় এতই যৎসামান্য ছিল যে এখনকার ছেলের চক্ষে

তাহার তালিকা ধরিলে সম্মানহানির আশঙ্কা আছে। বয়স দশের কোঠা পার হইবার পূর্ব্বে কোনো দিন কোনো কারণেই মোজা পরি নাই। শীতের দিনে একটা সাদা জামার উপরে আর একটা সাদা জামাই যথেষ্ট ছিল। ইহাতে কোনোদিন অদৃষ্টকে দোষ দিই নাই। কেবল আমাদের বাড়ির দরজি নেয়ামত খলিফা অবহেলা করিয়া আমাদের জামায় পকেট-যোজনা অনাবশ্যক মনে করিলে দুঃখ বোধ করিতাম,—কারণ, এমন বালক কোনো অকিঞ্চনের ঘরেও জন্মগ্রহণ করে নাই পকেটে রাখিবার মতো স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি যাহার কিছুমাত্র নাই ; বিধাতার কৃপায় শিশুর ঐশ্বর্য্য সম্বন্ধে ধনী ও নির্দ্ধনের ঘরে বেশি কিছু তারতম্য দেখা যায় না। আমাদের চটিজুতা একজোড়া থাকিত, কিন্তু পা দুটা যেখানে থাকিত সেখানে নহে। প্রতিপদক্ষেপে তাহাদিগকে আগে আগে নিক্ষেপ করিয়া চলিতাম—তাহাতে যাতায়াতের সময় পদচালনা অপেক্ষা জুতাচালনা এত বাহুল্য পরিমাণে হইত যে পাদুকাসৃষ্টির উদ্দেশ্য পদে পদে ব্যর্থ হইয়া যাইত।

আমাদের চেয়ে যাঁহারা বড়ো তাঁহাদের গতিবিধি, বেশভূষা, আহার-বিহার, আরাম-আমোদ, আলাপ-আলোচনা সমস্তই আমাদের কাছ হইতে বহুদূরে ছিল। তাহার আভাস পাইতাম কিন্তু নাগাল পাইতাম না। এখনকার কালে ছেলেরা গুরুজনদিগকে লঘু করিয়া লইয়াছে ; কোথাও তাহাদের কোনো বাধা নাই এবং না চাহিতেই তাহারা সমস্ত পায়। আমরা এত সহজে কিছুই পাই নাই। কত তুচ্ছ

সামগ্রীও আমাদের পক্ষে দুর্লভ ছিল; বড়ো হইলে কোনো এক সময়ে পাওয়া যাইবে এই আশায় তাহাদিগকে দূর ভবিষ্যতের জিম্মায় সমর্পণ করিয়া বসিয়া ছিলাম। তাহার ফল হইয়াছিল এই যে, তখন সামান্য যাহা কিছু পাইতাম তাহার সমস্ত রসটুকু পূরা আদায় করিয়া লইতাম, তাহার খোসা হইতে আঁঠি পর্য্যন্ত কিছুই ফেলা যাইত না। এখনকার সম্পন্ন ঘরের ছেলেদের দেখি তাহারা সহজেই সব জিনিষ পায় বলিয়া তাহার বারোআনাকেই আধখানা কামড় দিয়া বিসর্জ্জন করে—তাহাদের পৃথিবীর অধিকাংশই তাহাদের কাছে অপব্যয়েই নষ্ট হয়!

বাহির বাড়িতে দোতলায় দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণের ঘরে চাকরদের মহলে আমাদের দিন কাটিত।

আমাদের এক চাকর ছিল তাহার নাম শ্যাম। শ্যামবর্ণ দোহারা বালক, মাথায় লম্বা চুল, খুলনা জেলায় তাহার বাড়ি। সে আমাকে ঘরের একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসাইয়া আমার চারিদিকে খড়ি দিয়া গণ্ডি কাটিয়া দিত। গম্ভীর মুখ করিয়া তর্জ্জনী তুলিয়া বলিয়া যাইত গণ্ডির বাহিরে গেলেই বিষম বিপদ। বিপদটা আধিভৌতিক কি আধিদৈবিক তাহা স্পষ্ট করিয়া বুঝিতাম না, কিন্তু মনে বড়ো একটা আশঙ্কা হইত। গণ্ডি পার হইয়া সীতার কী সর্ব্বনাশ হইয়াছিল তাহা রামায়ণে পড়িয়াছিলাম, এইজন্য গণ্ডিটাকে নিতান্ত অবিশ্বাসীর মতো উড়াইয়া দিতে পারিতাম না।

জানলার নীচেই একটি ঘাট-বাঁধানো পুকুর ছিলো।

তাহার পূর্ব্বধারের প্রাচীরের গায়ে প্রকাণ্ড একটা চীনা বট—দক্ষিণধারে নারিকেলশ্রেণী। গণ্ডি-বন্ধনের বন্দী আমি জানলার খড়খড়ি খুলিয়া প্রায় সমস্ত দিন সেই পুকুরটাকে একখানা ছবির বহির মতো দেখিয়া দেখিয়া কাটাইয়া দিতাম। সকাল হইতে দেখিতাম প্রতিবেশীরা একে একে স্নান করিতে আসিতেছে। তাহাদের কে কখন আসিবে আমার জানা ছিল। প্রত্যেকেরই স্নানের বিশেষত্বটুকুও আমার পরিচিত। কেহবা দুই কানে আঙুল চাপিয়া ঝুপ্ ঝুপ্ করিয়া দ্রুতবেগে কতকগুলা ডুব পাড়িয়া চলিয়া যাইত; কেহবা ডুব না দিয়া গামছায় জল তুলিয়া ঘন ঘন মাথায় ঢালিতে থাকিত; কেহবা জলের উপরিভাগের মলিনতা এড়াইবার জন্য বারবার দুই হাতে জল কাটাইয়া লইয়া হঠাৎ এক সময়ে ধাঁ করিয়া ডুব পাড়িত; কেহবা উপরের সিঁড়ি হইতেই বিনা ভূমিকায় সশব্দে জলের মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া আত্মসমর্পণ করিত; কেহবা জলের মধ্যে নামিতে নামিতে এক নিঃশ্বাসে কতকগুলি শ্লোক আওড়াইয়া লইত; কেহবা ব্যস্ত, কোনোমতে স্নান সারিয়া লইয়া বাড়ি যাইবার জন্য উৎসুক; কাহারো বা ব্যস্ততা লেশমাত্র নাই, ধীরেসুস্থে স্নান করিয়া, গা মুছিয়া, কাপড় ছাড়িয়া, কোঁচাটা দুই তিনবার ঝাড়িয়া, বাগান হইতে কিছুবা ফুল তুলিয়া মৃদুমন্দ দোদুল গতিতে স্নানস্নিগ্ধ শরীরের আরামটিকে বায়ুতে বিকীর্ণ করিতে করিতে বাড়ির দিকে তাহার যাত্রা। এমনি করিয়া দুপুর বাজিয়া যায়, বেলা একটা হয়। ক্রমে পুকুরের ঘাট জনশূন্য, নিস্তব্ধ। কেবল

রাজহাঁস ও পাতিহাঁসগুলা সারাবেলা ডুব দিয়া গুগ্‌লি তুলিয়া খায়, এবং চঞ্চুচালনা করিয়া ব্যতিব্যস্তভাবে পিঠের পালক সাফ করিতে থাকে।

পুষ্করিণী নির্জ্জন হইয়া গেলে সেই বটগাছের তলাটা আমার সমস্ত মনকে অধিকার করিয়া লইত। তাহার গুঁড়ির চারিধারে অনেকগুলা ঝুরি নামিয়া একটা অন্ধকারময় জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছিল। সেই কুহকের মধ্যে, বিশ্বের সেই একটা অস্পষ্ট কোণে যেন ভ্রমক্রমে বিশ্বের নিয়ম ঠেকিয়া গেছে। দৈবাৎ সেখানে যেন স্বপ্নযুগের একটা অসম্ভবের রাজত্ব বিধাতার চোখ এড়াইয়া আজও দিনের আলোর মাঝখানে রহিয়া গিয়াছে। মনের চক্ষে সেখানে যে কাহাদের দেখিতাম এবং তাহাদের ক্রিয়াকলাপ যে কি রকম, আজ তাহা স্পষ্ট ভাষায় বলা অসম্ভব। এই বটকেই উদ্দেশ করিয়া একদিন লিখিয়াছিলাম—

নিশিদিসি দাঁড়িয়ে আছ মাথায় ল'য়ে জট,
ছোট ছেলেটি মনে কি পড়ে, ওগো প্রাচীন বট ?

কিন্তু হায়, সে বট এখন কোথায়! যে পুকুরটি এই বনস্পতির অধিষ্ঠাত্রী-দেবতার দর্পণ ছিল তাহাও এখন নাই; যাহারা স্নান করিত তাহারাও অনেকেই এই অন্তর্হিত বটগাছের ছায়ারই অনুসরণ করিয়াছে। আর সেই বালক আজ বাড়িয়া উঠিয়া নিজের চারিদিক হইতে নানাপ্রকারের ঝুরি নামাইয়া দিয়া বিপুল জটিলতার মধ্যে সুদিনদুর্দ্দিনের ছায়ারৌদ্রপাত গণনা করিতেছে।

বাড়ির বাহিরে আমাদের যাওয়া বারণ ছিল ; এমন কি বাড়ির ভিতরেও আমরা সর্ব্বত্র যেমন-খুসি যাওয়া-আসা করিতে পারিতাম না। সেইজন্য বিশ্বপ্রকৃতিকে আড়াল-আবডাল হইতে দেখিতাম। বাহির বলিয়া একটি অনন্ত-প্রসারিত পদার্থ ছিল যাহা আমার অতীত, অথচ যাহার রূপ শব্দ গন্ধ দ্বার-জানলার নানা ফাঁক-ফুকর দিয়া এদিক ওদিক হইতে আমাকে চকিতে ছুঁইয়া যাইত। সে যেন গরাদের ব্যবধান দিয়া নানা ইসারায় আমার সঙ্গে খেলা করিবার নানা চেষ্টা করিত। সে ছিল মুক্ত, আমি ছিলাম বদ্ধ,—মিলনের উপায় ছিল না, সেইজন্য প্রণয়ের আকর্ষণ ছিল প্রবল। আজ সেই খড়ির গণ্ডি মুছিয়া গেছে, কিন্তু গণ্ডি তবু ঘোচে নাই। দূর এখনো দূরে, বাহির এখনো বাহিরেই। বড়ো হইয়া যে কবিতাটা লিখিয়াছিলাম তাহাই মনে পড়ে—

খাঁচার পাখী ছিল সোনার খাঁচাটিতে,
বনের পাখী ছিল বনে।
একদা কী করিয়া মিলন হ'ল দোঁহে,
কী ছিল বিধাতার মনে!
বনের পাখী বলে—"খাঁচার পাখী আয়,
বনেতে যাই দোঁহে মিলে।"
খাঁচার পাখী বলে, "বনের পাখী আয়
খাঁচায় থাকি নিরিবিলে।"

বনের পাখী বলে—"না,
আমি শিকলে ধরা নাহি দিব।"
খাঁচার পাখী বলে—"হায়,
আমি কেমনে বনে বাহিরিব!"

আমাদের বাড়ির ভিতরের ছাদের প্রাচীর আমার মাথা ছাড়াইয়া উঠিত। যখন একটু বড়ো হইয়াছি এবং চাকরদের শাসন কিঞ্চিৎ শিথিল হইয়াছে, যখন বাড়িতে নূতন বধূ-সমাগম হইয়াছে এবং অবকাশের সঙ্গীরূপে তাঁহার কাছে প্রশ্রয় লাভ করিতেছি, তখন এক-একদিন মধ্যাহ্নে সেই ছাদে আসিয়া উপস্থিত হইতাম। তখন বাড়িতে সকলের আহার শেষ হইয়া গিয়াছে; গৃহকর্ম্মে ছেদ পড়িয়াছে; অন্তঃপুর বিশ্রামে নিমগ্ন; স্নানসিক্ত শাড়িগুলি ছাদের কার্ণিসের উপর হইতে ঝুলিতেছে; উঠানের কোণে যে উচ্ছিষ্ট ভাত পড়িয়াছে তাহারই উপর কাকের দলের সভা বসিয়া গেছে। সেই নির্জ্জন অবকাশে প্রাচীরের রন্ধ্রের ভিতর হইতে এই খাঁচার পাখীর সঙ্গে ঐ বনের পাখীর চঞ্চুতে চঞ্চুতে পরিচয় চলিত! দাঁড়াইয়া চাহিয়া থাকিতাম—চোখে পড়িত আমাদের বাড়ির ভিতরের বাগান-প্রান্তের নারিকেল-শ্রেণী; তাহারই ফাঁক দিয়া দেখা যাইত সিঙ্গির বাগানপল্লীর একটা পুকুর, এবং সেই পুকুরের ধারে, যে তারা গয়লানী আমাদের দুধ দিত তাহারই গোয়ালঘর; আরো দূরে দেখা যাইত তরুচূড়ার সঙ্গে মিশিয়া কলিকাতা সহরের নানা আকারে ও নানা আয়তনের উচ্চনীচ ছাদের শ্রেণী মধ্যাহ্ন-

রৌদ্রে প্রখর শুভ্রতা বিচ্ছুরিত করিয়া পূর্ব্বদিগন্তের পাণ্ডুবর্ণ নীলিমার মধ্যে উধাও হইয়া চলিয়া গিয়াছে। সেই সকল অতি দূর বাড়ির ছাদে একটি চিলেকোঠা উঁচু হইয়া থাকিত, মনে হইত তাহারা যেন নিশ্চল তর্জ্জনী তুলিয়া চোক টিপিয়া আপনার ভিতরকার রহস্য আমার কাছে সঙ্কেতে বলিবার চেষ্টা করিতেছে। ভিক্ষুক যেমন প্রাসাদের বাহিরে দাঁড়াইয়া রাজভাণ্ডারের রুদ্ধ সিন্ধুকগুলার মধ্যে অসম্ভব রত্নমাণিক কল্পনা করে, আমিও তেমনি ঐ অজানা বাড়িগুলিকে কত খেলা কত স্বাধীনতায় আগাগোড়া বোঝাইকরা মনে করিতাম তাহা বলিতে পারি না। মাথার উপরে অকাশব্যাপী খরদীপ্তি, তাহারই দূরতম প্রান্ত হইতে চিলের সূক্ষ্ম তীক্ষ্ণ ডাক্ আমার কানে আসিয়া পৌঁছিত এবং সিঙ্গিরবাগানের পাশের গলিতে দিবাসুপ্ত নিস্তব্ধ বাড়িগুলার সম্মুখ দিয়া পসারী সুর করিয়া "চাই, চুড়ি চাই, খেল্না চাই" হাঁকিয়া যাইত—তাহাতে আমার সমস্ত মনটা উদাস করিয়া দিত।

পিতৃদেব প্রায়ই ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন, বাড়িতে থাকিতেন না। তাঁহার তেতলার ঘর বন্ধ থাকিত। খড়খড়ি খুলিয়া হাত গলাইয়া ছিট্‌কিনি টানিয়া দরজা খুলিতাম এবং তাঁহার ঘরের দক্ষিণ প্রান্তে একটি সোফা ছিল—সেইটিতে চুপ করিয়া পড়িয়া আমার মধ্যাহ্ন কাটিত। একে তো অনেক দিনের বন্ধ করা ঘর, নিষিদ্ধ-প্রবেশ, সে ঘরে যেন একটা রহস্যের ঘন গন্ধ ছিল। তাহার পরে সম্মুখের জনশূন্য খোলা ছাদের উপর রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিত, তাহাতেও মনটাকে

উদাস করিয়া দিত। তার উপরে আরো একটা আকর্ষণ ছিল। তখন সবেমাত্র সহরে জলের কল হইয়াছে। তখন নূতন মহিমার ঔদার্য্যে বাঙালি পাড়াতেও তাহার কার্পণ্য সুরু হয় নাই। সহরের উত্তরে দক্ষিণে তাহার দাক্ষিণ্য সমান ছিল। সেই জলের কলের সত্যযুগে আমার পিতার স্নানের ঘরে তেতলাতেও জল পাওয়া যাইত। ঝাঁঝরি খুলিয়া দিয়া অকালে মনের সাধ মিটাইয়া স্নান করিতাম। সে স্নান আরামের জন্য নহে, কেবলমাত্র ইচ্ছাটাকে লাগাম ছাড়িয়া দিবার জন্য। একদিকে মুক্তি, আর একদিকে বন্ধনের আশঙ্কা এই দুইয়ে মিলিয়া কোম্পানির কলের জলের ধারা আমার মনের মধ্যে পুলক-শর-বর্ষণ করিত।

বাহিরের সংস্রব আমার পক্ষে যতই দুর্লভ থাক্ বাহিরের আনন্দ আমার পক্ষে হয় তো সেই কারণেই সহজ ছিল। উপকরণ প্রচুর থাকিলে মনটা কুঁড়ে হইয়া পড়ে, সে কেবলি বাহিরের উপরেই সম্পূর্ণ বরাত দিয়া বসিয়া থাকে, ভুলিয়া যায় আনন্দের ভোজে বাহিরের চেয়ে অন্তরের অনুষ্ঠানটাই গুরুতর। শিশুকালে মানুষের সর্ব্বপ্রথম শিক্ষাটাই এই। তখন তাহার সম্বল অল্প এবং তুচ্ছ, কিন্তু আনন্দলাভের পক্ষে ইহার চেয়ে বেশি তাহার কিছুই প্রয়োজন নাই। সংসারে যে হতভাগ্য শিশু খেলার জিনিষ অপর্য্যাপ্ত পাইয়া থাকে তাহার খেলা মাটি হইয়া যায়।

বাড়ির ভিতরে আমাদের যে বাগান ছিল তাহাকে বাগান বলিলে অনেকটা বেশি বলা হয়। একটা বাতাবি

লেবু, একটা কুলগাছ, একটা বিলাতি আমড়া ও একসার নারিকেল গাছ তাহার প্রধান সঙ্গতি। মাঝখানে ছিল একটা গোলাকার বাঁধানো চাতাল। তাহার ফাটালের রেখায় রেখায় ঘাস ও নানাপ্রকার গুল্ম অনধিকার প্রবেশ পূর্ব্বক জবর-দখলের পতাকা রোপণ করিয়াছিল। যে ফুলগাছগুলো অনাদরেও মরিতে চায় না তাহারাই মালীর নামে কোনো অভিযোগ না আনিয়া, নিরভিমানে যথাশক্তি আপন কর্ত্তব্য পালন করিয়া যাইত। উত্তর কোণে একটা ঢেঁকিঘর ছিল, সেখানে গৃহস্থালির প্রয়োজনে মাঝেমাঝে অন্তঃপুরিকাদের সমাগম হইত। কলিকাতায় পল্লীজীবনের সম্পূর্ণ পরাভব স্বীকার করিয়া এই ঢেঁকিশালাটি কোনো একদিন নিঃশব্দে মুখ ঢাকিয়া অন্তর্ধান করিয়াছে। প্রথম মানব আদমের স্বর্গোদ্যানটি যে আমাদের এই বাগানের চেয়ে বেশি সুসজ্জিত ছিল আমার এরূপ বিশ্বাস নহে। কারণ, প্রথম মানবের স্বর্গলোক আবরণহীন—আয়োজনের দ্বারা সে আপনাকে আচ্ছন্ন করে নাই। জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাওয়ার পর হইতে যে পর্য্যন্ত না সেই ফলটাকে সম্পূর্ণ হজম করিতে পারিতেছে সে পর্য্যন্ত মানুষের সাজসজ্জার প্রয়োজন কেবলি বাড়িয়া উঠিতেছে। বাড়ির ভিতরের বাগান আমার সেই স্বর্গের বাগান ছিল—সেই আমার যথেষ্ট ছিল। বেশ মনে পড়ে শরৎকালের ভোরবেলায় ঘুম ভাঙিলেই এই বাগানে আসিয়া উপস্থিত হইতাম। একটি শিশির-মাখা ঘাসপাতার গন্ধ ছুটিয়া আসিত, এবং স্নিগ্ধ নবীন রৌদ্রটি লইয়া আমাদের

পূবদিকের প্রাচীরের উপর নারিকেল পাতার কম্পমান ঝালরগুলির তলে প্রভাত আসিয়া মুখ বাড়াইয়া দিত।

আমাদের বাড়ির উত্তর অংশে আর একখণ্ড ভূমি পড়িয়া আছে, আজ পর্য্যন্ত ইহাকে আমরা গোলাবাড়ি বলিয়া থাকি। এই নামের দ্বারা প্রমাণ হয় কোনো এক পুরাতন সময়ে ওখানে গোলা করিয়া সম্বৎসরের শস্য রাখা হইত— তখন সহর এবং পল্লী অল্প বয়সের ভাই ভগিনীর মতো অনেকটা একরকম চেহারা লইয়া প্রকাশ পাইত—এখন দিদির সঙ্গে ভাইয়ের মিল খুঁজিয়া পাওয়াই শক্ত।

ছুটির দিনে সুযোগ পাইলে এই গোলাবাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইতাম। খেলিবার জন্য যাইতাম বলিলে ঠিক বলা হয় না। খেলাটার চেয়ে এই জায়গাটারই প্রতি আমার টান বেশি ছিল। তাহার কারণ কী বলা শক্ত। বোধ হয় বাড়ির কোণের একটা নিভৃত পোড়ো জায়গা বলিয়াই আমার কাছে তাহার কী একটা রহস্য ছিল। সে আমাদের বাসের স্থান নহে, ব্যবহারের ঘর নহে; সেটা কাজের জন্যও নহে; সেটা বাড়িঘরের বাহির, তাহাতে নিত্য প্রয়োজনের কোনো ছাপ নাই; তাহা শোভাহীন অনাবশ্যক পতিত জমি, কেহ সেখানে ফুলের গাছও বসায় নাই; এইজন্য সেই উজাড় জায়গাটায় বালকের মন আপন ইচ্ছামতো কল্পনায় কোনো বাধা পাইত না। রক্ষকদের শাসনের একটুমাত্র রন্ধ্র দিয়া যে দিন কোনো মতে এইখানে আসিতে পারিতাম সে দিন ছুটির দিন বলিয়াই বোধ হইত।

বাড়িতে আরো একটা জায়গা ছিল সেটা যে কোথায় তাহা আজ পর্য্যন্ত বাহির করিতে পারি নাই। আমার সমবয়স্কা খেলার সঙ্গিনী একটি বালিকা সেটাকে রাজার বাড়ি বলিত। কখনো কখনো তাহার কাছে শুনিতাম "আজ সেখানে গিয়াছিলাম।" কিন্তু একদিনও এমন শুভযোগ হয় নাই যখন আমিও তাহার সঙ্গ ধরিতে পারি। সে একটা আশ্চর্য্য জায়গা, সেখানে খেলাও যেমন আশ্চর্য্য খেলার সামগ্রীও তেমনি অপরূপ। মনে হইত সেটা অত্যন্ত কাছে; এক তলায় বা দোতলায় কোনো একটা জায়গায়; কিন্তু কোনোমতেই সেখানে যাওয়া ঘটিয়া উঠে না। কতবার বালিকাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, রাজার বাড়ি কি আমাদের বাড়ির বাহিরে? সে বলিয়াছে, না, এই বাড়ির মধ্যেই। আমি বিস্মিত হইয়া বসিয়া ভাবিতাম, বাড়ির সকল ঘরই তো আমি দেখিয়াছি কিন্তু সে ঘর কোথায়? রাজা যে কে সে কথা কোনোদিন জিজ্ঞাসাও করি নাই, রাজত্ব যে কোথায় তাহা আজ পর্য্যন্ত অনাবিষ্কৃত রহিয়া গিয়াছে, কেবল এইটুকু মাত্র পাওয়া গিয়াছে যে, আমাদের বাড়িতেই সেই রাজার বাড়ি।

ছেলেবেলার দিকে যখন তাকানো যায় তখন সবচেয়ে এই কথাটা মনে পড়ে যে, তখন জগৎটা এবং জীবনটা রহস্যে পরিপূর্ণ। সর্ব্বত্রই যে একটি অভাবনীয় আছে এবং কখন যে তাহার দেখা পাওয়া যাইবে তাহার ঠিকানা নাই এই কথাটা প্রতিদিনই মনে জাগিত। প্রকৃতি যেন হাত মুঠা

করিয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিত, কী আছে বল দেখি? কোন্‌টা থাকা যে অসম্ভব তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারিতাম না।

বেশ মনে পড়ে দক্ষিণের বারান্দায় এক কোণে আতার বীচি পুঁতিয়া রোজ জল দিতাম। সেই বীচি হইতে যে গাছ হইতেও পারে একথা মনে করিয়া ভারি বিস্ময় এবং ঔৎসুক্য জন্মিত। আতার বীজ হইতে আজও অঙ্কুর বাহির হয়, কিন্তু মনের মধ্যে তাহার সঙ্গে সঙ্গে আজ আর বিস্ময় অঙ্কুরিত হইয়া উঠে না। সেটা আতার বীজের দোষ নয়, সেটা মনেরই দোষ। গুণদাদার বাগানের ক্রীড়া-শৈল হইতে পাথর চুরি করিয়া আনিয়া আমাদের পড়িবার ঘরের এক কোণে আমরা নকল পাহাড় তৈরি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম,—তাহারই মাঝে মাঝে ফুলগাছের চারা পুঁতিয়া সেবার আতিশয্যে তাহাদের প্রতি এত উপদ্রব করিতাম যে নিতান্তই গাছ বলিয়া তাহারা চুপ করিয়া থাকিত এবং মরিতে বিলম্ব করিত না। এই পাহাড়টার প্রতি আমাদের কী আনন্দ এবং কী বিস্ময় ছিল তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। মনে বিশ্বাস ছিল আমাদের এই সৃষ্টি গুরুজনের পক্ষেও নিশ্চয় আশ্চর্য্যের সামগ্রী হইবে; সেই বিশ্বাসের যেদিন পরীক্ষা করিতে গেলাম সেইদিনই আমাদের গৃহকোণের পাহাড় তাহার গাছপালাসমেত কোথায় অন্তর্দ্ধান করিল। ইস্কুল ঘরের কোণে যে পাহাড়সৃষ্টির উপযুক্ত ভিত্তি নহে, এমন অকস্মাৎ এমন রূঢ়ভাবে সে শিক্ষালাভ করিয়া বড়োই

দুঃখ বোধ করিয়াছিলাম। আমাদের লীলার সঙ্গে বড়োদের ইচ্ছার যে এত প্রভেদ তাহা স্মরণ করিয়া, গৃহভিত্তির অপসারিত প্রস্তরভার আমাদের মনের মধ্যে আসিয়া চাপিয়া বসিল।

তখনকার দিনে এই পৃথিবী বস্তুটার রস কী নিবিড় ছিল সেই কথাই মনে পড়ে। কী মাটি, কী জল, কী গাছপালা, কী আকাশ সমস্তই তখন কথা কহিত—মনকে কোনোমতেই উদাসীন থাকিতে দেয় নাই! পৃথিবীকে কেবলমাত্র উপরের তলাতেই দেখিতেছি, তাহার ভিতরের তলাটা দেখিতে পাইতেছি না, ইহাতে কতদিন যে মনকে ধাক্কা দিয়াছে তাহা বলিতে পারি না। কী করিলে পৃথিবীর উপরকার এই মেটে রঙের মলাটটাকে খুলিয়া ফেলা যাইতে পারে তাহার কতই প্ল্যান ঠাওরাইয়াছি। মনে ভাবিতাম, একটার পর আর একটা বাঁশ যদি ঠুকিয়া ঠুকিয়া পোঁতা যায়; এমনি করিয়া অনেক বাঁশ পোঁতা হইয়া গেলে পৃথিবীর খুব গভীরতম তলাটাকে হয় তো এক রকম করিয়া নাগাল পাওয়া যাইতে পারে। মাঘোৎসব উপলক্ষ্যে আমাদের উঠানের চারিধারে সারি সারি করিয়া কাঠের থাম পুঁতিয়া তাহাতে ঝাড় টাঙানো হইত। পয়লা মাঘ হইতেই এজন্য উঠানে মাটিকাটা আরম্ভ হইত। সর্ব্বত্রই উৎসবের উদ্যোগের আরম্ভটা ছেলেদের কাছে অত্যন্ত ঔৎসুক্যজনক। কিন্তু আমার কাছে বিশেষ ভাবে এই মাটিকাটা ব্যাপারের একটা টান ছিল। যদিচ প্রত্যেক বৎসরই মাটি কাটিতে দেখিয়াছি

—দেখিয়াছি গর্ত্ত বড়ো হইতে হইতে একটু একটু করিয়া সমস্ত মানুষটাই গহ্বরের নীচে তলাইয়া গিয়াছে অথচ তাহার মধ্যে কোনোবারই এমন কিছু দেখা দেয় নাই যাহা কোনো রাজপুত্র বা পাত্রের পুত্রের পাতালপুরযাত্রা সফল করিতে পারে, তবুও প্রত্যেক বারেই আমার মনে হইত একটা রহস্য-সিন্ধুকের ডালা খোলা হইতেছে। মনে হইত যেন আর একটু খুঁড়িলেই হয়—কিন্তু বৎসরের পর বৎসর গেল সেই আরেকটুকু কোনোবারেই খোঁড়া হইল না। পর্দ্দায় একটু-টান দেওয়াই হইল কিন্তু তোলা হইল না। মনে হইত বড়োরা তো ইচ্ছা করিলেই সব করাইতে পারেন তবে তাঁহারা কেন এমন অগভীরের মধ্যে থামিয়া বসিয়া আছেন —আমাদের মতো শিশুর আজ্ঞা যদি খাটিত তাহা হইলে পৃথিবীর গূঢ়তম সংবাদটি এমন উদাসীনভাবে মাটিচাপা পড়িয়া থাকিত না। আর যেখানে আকাশের নীলিমা তাহারই পশ্চাতে আকাশের সমস্ত রহস্য, সে চিন্তাও মনকে ঠেলা দিত। যেদিন বোধোদয় পড়াইবার উপলক্ষ্যে পণ্ডিত-মহাশয় বলিলেন, আকাশের ঐ নীল গোলকটি কোনো একটা বাধামাত্রই নহে তখন সেটা কী অসম্ভব আশ্চর্য্যই মনে হইয়াছিল! তিনি বলিলেন, সিঁড়ির উপর সিঁড়ি লাগাইয়া উপরে উঠিয়া যাও না, কোথাও মাথা ঠেকিবে না। আমি ভাবিলাম সিঁড়ি সম্বন্ধে বুঝি তিনি অনাবশ্যক কার্পণ্য করিতেছেন। আমি কেবলি সুর চড়াইয়া বলিতে লাগিলাম, আরো সিঁড়ি, আরো সিঁড়ি, আরো সিঁড়ি শেষকালে যখন

বুঝা গেল সিঁড়ির সংখ্যা বাড়াইয়া কোনো লাভ নাই তখন স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম এবং মনে করিলাম এটা এমন একটা আশ্চর্য্য খবর যে পৃথিবীতে যাহারা মাষ্টার মশায় তাহারাই কেবল এটা জানেন আর কেহ নয়।

ভৃত্যরাজক তন্ত্র

ভারতবর্ষের ইতিহাসে দাসরাজদের রাজত্বকাল সুখের কাল ছিল না। আমার জীবনের ইতিহাসেও ভৃত্যদের শাসনকালটা যখন আলোচনা করিয়া দেখি তখন তাহার মধ্যে মহিমা বা আনন্দ কিছুই দেখিতে পাই না। এই সকল রাজাদের পরিবর্ত্তন বারম্বার ঘটিয়াছে কিন্তু আমাদের ভাগ্যে সকল তা'তেই নিষেধ ও প্রহারের ব্যবস্থার বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই। তখন এ সম্বন্ধে তত্ত্বালোচনার অবসর পাই নাই—পিঠে যাহা পড়িত তাহা পিঠে করিয়াই লইতাম এবং মনে জানিতাম সংসারের ধর্ম্মই এই—বড়ো যে সে মারে; ছোটো যে সে মার খায়। ইহার বিপরীত কথাটা, অর্থাৎ, ছোটো যে সেই মারে, বড়ো যে সেই মার খায়—শিখিতে বিস্তর বিলম্ব হইয়াছে।

কোন্‌টা দুষ্ট এবং কোন্‌টা শিষ্ট, ব্যাধ তাহা পাখীর দিক হইতে দেখে না, নিজের দিক হইতেই দেখে। সেই জন্য গুলি খাইবার পূর্ব্বেই যে সতর্ক পাখী চীৎকার করিয়া দল ভাগায় শিকারী তাহাকে গালি দেয়। মার খাইলে আমরা কাঁদিতাম, প্রহারকর্ত্তা সেটাকে শিষ্টোচিত বলিয়া গণ্য করিত না। বস্তুত সেটা ভৃত্যরাজদের বিরুদ্ধে সিডিশন্‌। আমার বেশ মনে আছে সেই সিডিশন্‌ সম্পূর্ণ দমন করিবার জন্য জল রাখিবার বড়ো বড়ো জালার মধ্যে আমাদের রোদনকে বিলুপ্ত করিয়া দিবার চেষ্টা করা হইত। রোদন জিনিষটা প্রহারকারীর পক্ষে অত্যন্ত অপ্রিয় এবং অসুবিধাজনক একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না।

এখন এক-একবার ভাবি ভৃত্যদের হাত হইতে কেন এমন নির্ম্মম ব্যবহার আমরা পাইতাম। মোটের উপরে আকার প্রকারে আমরা যে স্নেহদয়ামায়ার অযোগ্য ছিলাম তাহা বলিতে পারি না। আসল কারণটা এই, ভৃত্যদের উপরে আমাদের সম্পূর্ণ ভার পড়িয়াছিল। সম্পূর্ণ ভার জিনিষটা বড়ো অসহ্য। পরমাত্মীয়ের পক্ষেও দুর্ব্বহ। ছোটো ছেলেকে যদি ছোটো ছেলে হইতে দেওয়া যায়—সে যদি খেলিতে পায়, দৌড়িতে পায়, কৌতূহল মিটাইতে পারে তাহা হইলেই সে সহজ হয়। কিন্তু যদি মনে কর উহাকে বাহির হইতে দিব না, খেলায় বাধা দিব, ঠাণ্ডা করিয়া বসাইয়া রাখিব তাহা হইলে অত্যন্ত দুরূহ সমস্যার সৃষ্টি করা হয়। তাহা হইলে, ছেলেমানুষ ছেলেমানুষির দ্বারা নিজের যে ভার নিজে

অনায়াসেই বহন করে সেই ভার শাসনকর্ত্তার উপরে পড়ে। তখন ঘোড়াকে মাটিতে চলিতে না দিয়া তাহাকে কাঁধে লইয়া বেড়ান হয়। যে বেচারা কাঁধে করে তাহার মেজাজ ঠিক থাকে না। মজুরির লোভে কাঁধে করে বটে কিন্তু ঘোড়া বেচারার উপর পদে পদে শোধ লইতে থাকে।

এই আমাদের শিশুকালের শাসনকর্ত্তাদের মধ্যে অনেকেরই স্মৃতি কেবল কিল-চড় আকারেই মনে আছে—তাহার বেশি আর মনে পড়ে না। কেবল একজনের কথা খুব স্পষ্ট মনে জাগিতেছে।

তাহার নাম ঈশ্বর। সে পূর্ব্বে গ্রামে গুরুমশায়গিরি করিত। সে অত্যন্ত শুচিসংযত আচারনিষ্ঠ বিজ্ঞ এবং গম্ভীর-প্রকৃতির লোক। পৃথিবীতে তাহার শুচিতারক্ষার উপযোগী মাটি জলের বিশেষ অসদ্ভাব ছিল। এইজন্য এই মৃৎপিণ্ড মেদিনীর মলিনতার সঙ্গে সর্ব্বদাই তাহাকে যেন লড়াই করিয়া চলিতে হইত। বিদ্যুদ্বেগে ঘটি ডুবাইয়া পুষ্করিণীর তিন চার হাত নীচেকার জল সে সংগ্রহ করিত। স্নানের সময় দুই হাত দিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া পুষ্করিণীর উপরিতলের জল কাটাইতে কাটাইতে অবশেষে হঠাৎ এক সময় দ্রুতগতিতে ডুব দিয়া লইত; যেন পুষ্করিণীটাকে কোনোমতে 'অন্য-মনস্ক 'করিয়া দিয়া ফাঁকি দিয়া মাথা ডুবাইয়া লওয়া তাহার অভিপ্রায়। চলিবার সময়ে তাহার দক্ষিণ হস্তটি এমন একটু বক্রভাবে দেহ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া থাকিত যে বেশ বোঝা যাইত তাহার ডান হাতটা তাহার

শরীরের কাপড় চোপড় গুলাকে পর্য্যন্ত বিশ্বাস করিতেছে না। জলে স্থলে আকাশে এবং লোকব্যবহারের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অসংখ্য দোষ প্রবেশ করিয়া আছে, অহোরাত্র সেই গুলাকে কাটাইয়া চলা তাহার এক বিষম সাধনা ছিল। বিশ্ব-জগৎটা কোনো দিক্ দিয়া তাহার গায়ের কাছে আসিয়া পড়ে ইহা তাহার পক্ষে অসহ্য। অতলস্পর্শ তাহার গাম্ভীর্য্য ছিল। ঘাড় ঈষৎ বাঁকাইয়া মন্দ্র স্বরে চিবাইয়া চিবাইয়া সে কথা কহিত। তাহার সাধুভাষার প্রতি লক্ষ্য করিয়া গুরুজনেরা আড়ালে প্রায়ই হাসিতেন। তাহার সম্বন্ধে আমাদের বাড়িতে একটা প্রবাদ রটিয়া গিয়াছিল যে সে "বরানগর"কে "বরাহনগর" বলে। এটা জনশ্রুতি হইতে পারে কিন্তু আমি জানি, "অমুক লোক ব'সে আছেন"—না বলিয়া সে বলিয়াছিল "অপেক্ষা কর্‌চেন"। তাহার মুখের এই সাধুপ্রয়োগ আমাদের পারিবারিক কৌতুকালাপের ভাণ্ডারে অনেকদিন পর্য্যন্ত সঞ্চিত ছিল। নিশ্চয়ই এখনকার দিনে ভদ্রঘরের কোনো ভৃত্যের মুখে "অপেক্ষা কর্‌চেন" কথাটা হাস্যকর নহে। ইহা হইতে দেখা যায় বাংলায় গ্রন্থের ভাষা ক্রমে চলিত ভাষার দিকে নামিতেছে এবং চলিতভাষা গ্রন্থের ভাষার দিকে উঠিতেছে,—একদিন উভয়ের মধ্যে যে আকাশ পাতাল ভেদ ছিল এখন তাহা প্রতিদিন ঘুচিয়া আসিতেছে।

এই ভূতপূর্ব্ব গুরুমহাশয় সন্ধ্যাবেলায় আমাদিগকে সংযত রাখিবার জন্য একটি উপায় বাহির করিয়াছিল। সন্ধ্যাবেলায়

রেড়ির তেলের ভাঙা সেজের চারিদিকে আমাদের বসাইয়া সে রামায়ণ মহাভারত শোনাইত। চাকরদের মধ্যে আরও দুই চারিটি শ্রোতা আসিয়া জুটিত। ক্ষীণ আলোকে ঘরের কড়ি-কাঠ পর্য্যন্ত মস্ত মস্ত ছায়া পড়িত, টিক্‌টিকি দেওয়ালে পোকা ধরিয়া খাইত, চামচিকে বাহিরের বারান্দায় উন্মত্ত দরবেশের মতো ক্রমাগত চক্রাকারে ঘুরিত আমরা স্থির হইয়া বসিয়া হাঁ করিয়া শুনিতাম। যেদিন কুশলবের কথা আসিল, বীরবালকেরা তাহাদের বাপখুড়াকে একেবারে মাটি করিয়া দিতে প্রবৃত্ত হইল, সেদিনকার সন্ধ্যাবেলার সেই অস্পষ্ট আলোকের সভা নিস্তব্ধ ঔৎসুক্যের নিবিড়তায় যে কিরূপ পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল তাহা এখনো মনে পড়ে। এদিকে রাত হইতেছে, আমাদের জাগরণকালের মেয়াদ ফুরাইয়া আসিতেছে, কিন্তু পরিণামের অনেক বাকি। এ হেন সঙ্কটের সময় হঠাৎ আমাদের পিতার অনুচর কিশোরী চাটুয্যে আসিয়া দাশুরায়ের পাঁচালী গাহিয়া অতি দ্রুত গতিতে বাকি অংশটুকু পূরণ করিয়া গেল;—কৃত্তিবাসের সরল পয়ারের মৃদুমন্দ কলধ্বনি কোথায় বিলুপ্ত হইল—অনুপ্রাসের ঝকমকি ও ঝঙ্কারে আমরা একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম।

কোনো কোনোদিন পুরাণপাঠের প্রসঙ্গে শ্রোতৃসভায় শাস্ত্রঘটিত তর্ক উঠিত, ঈশ্বর সুগভীর বিজ্ঞতার সহিত তাহার মীমাংসা করিয়া দিত। যদিও ছোটো ছেলেদের চাকর বলিয়া ভৃত্যসমাজে পদমর্য্যাদায় সে অনেকের চেয়ে হীন ছিল, তবু, কুরুসভায় ভীষ্ম পিতামহের মতো, সে আপনার

কনিষ্ঠদের চেয়ে নিম্ন আসনে বসিয়াও আপন গুরুগৌরব অবিচলিত রাখিয়াছিল।

এই আমাদের পরম প্রাজ্ঞ রক্ষকটির যে একটি দুর্ব্বলতা ছিল তাহা ঐতিহাসিক সত্যের অনুরোধে অগত্যা প্রকাশ করিতে হইল। সে আফিম খাইত। এই কারণে তাহার পুষ্টিকর আহারের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। এই জন্য আমাদের বরাদ্দ দুধ যখন সে আমাদের সাম্‌নে আনিয়া উপস্থিত করিত তখন সেই দুধ সম্বন্ধে বিপ্রকর্ষণ অপেক্ষা আকর্ষণ শক্তিটাই তাহার মনে বেশি প্রবল হইয়া উঠিত। আমরা দুধ খাইতে স্বভাবতই বিতৃষ্ণা প্রকাশ করিলে আমাদের স্বাস্থ্যোন্নতির দায়িত্ব পালন উপলক্ষ্যেও সে কোনোদিন দ্বিতীয়বার অনুরোধ বা জবরদস্তি করিত না।

আমাদের জলখাবার সম্বন্ধেও তাহার অত্যন্ত সঙ্কোচ ছিল। আমরা খাইতে বসিতাম। লুচি আমাদের সাম্‌নে একটা মোটা কাঠের বারকোসে রাশ করা থাকিত। প্রথমে দুই একখানি মাত্র লুচি যথেষ্ট উঁচু হইতে শুচিতা বাঁচাইয়া সে আমাদের পাতে বর্ষণ করিত। দেবলোকের অনিচ্ছাসত্ত্বেও নিতান্ত তপস্যার জোরে যে-বর মানুষ আদায় করিয়া লয় সেই বরের মতো, লুচি কয়খানা আমাদের পাতে আসিয়া পড়িত; তাহাতে পরিবেষণ কর্ত্তার কুণ্ঠিত দক্ষিণ হস্তের দাক্ষিণ্য প্রকাশ পাইত না। তাহার পর ঈশ্বর প্রশ্ন করিত, আরো দিতে হইবে কি না। আমি জানিতাম কোন্ উত্তরটি সর্ব্বাপেক্ষা সদুত্তর বলিয়া তাহার কাছে গণ্য হইবে!

তাহাকে বঞ্চিত করিয়া দ্বিতীয়বার লুচি চাহিতে আমার ইচ্ছা করিত না। বাজার হইতে আমাদের জন্য বরাদ্দমতো জল-খাবার কিনিবার পয়সা ঈশ্বর পাইত। আমরা কী খাইতে চাই প্রতিদিন সে তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া লইত। জানিতাম সস্তা জিনিষ ফরমাস করিলে সে খুসি হইবে। কখনো মুড়ি প্রভৃতি লঘু পথ্য, কখনো বা ছোলাসিদ্ধ চিনাবাদামভাজা প্রভৃতি অপথ্য আদেশ করিতাম। দেখিতাম শাস্ত্রবিধি আচারতত্ত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে ঠিক সূক্ষ্ম বিচারে তাহার উৎসাহ যেমন প্রবল ছিল আমাদের পথ্যাপথ্য সম্বন্ধে ঠিক তেমনটি ছিল না।

নর্ম্মাল স্কুল

ওরিয়েণ্টাল সেমিনারিতে যখন পড়িতেছিলাম তখন কেবল ছাত্র হইয়া থাকিবার যে হীনতা তাহা মিটাইবার একটা উপায় বাহির করিয়াছিলাম। আমাদের বারান্দার একটি বিশেষ কোণে আমিও একটি ক্লাস খুলিয়াছিলাম। রেলিংগুলা ছিল আমার ছাত্র। একটা কাটি হাতে করিয়া চৌকি লইয়া তাহাদের সামনে বসিয়া মাষ্টারি করিতাম।

রেলিংগুলার মধ্যে কে ভাল ছেলে এবং কে মন্দ ছেলে তাহা একেবারে স্থির করা ছিল। এমন কি ভাল মানুষ রেলিং ও দুষ্ট রেলিং, বুদ্ধিমান রেলিং ও বোকা রেলিঙের শ্রীর প্রভেদ আমি যেন সুস্পষ্ট দেখিতে পাইতাম। দুষ্ট রেলিংগুলার উপর ক্রমাগত আমার লাঠি পড়িয়া পড়িয়া তাহাদের এমনি দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল যে প্রাণ থাকিলে তাহারা প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া শান্তি লাভ করিতে পারিত। লাঠির চোটে যতই তাহাদের বিকৃতি ঘটিত ততই তাহাদের উপর রাগ কেবলি বাড়িয়া উঠিত; কী করিলে তাহাদের যে যথেষ্ট শাস্তি হইতে পারে তাহা যেন ভাবিয়া ভাবিয়া কুলাইতে পারিতাম না। আমার সেই নীরব ক্লাসটির উপর কী ভয়ঙ্কর মাষ্টারি যে করিয়াছি তাহার সাক্ষ্য দিবার জন্য আজ কেহই বর্ত্তমান নাই। আমার সেই সেকালের দারুনির্ম্মিত ছাত্রগণের স্থলে সম্প্রতি লৌহনির্ম্মিত রেলিং ভর্ত্তি হইয়াছে—আমাদের উত্তরবর্ত্তিগণ ইহাদের শিক্ষকতার ভার আজও কেহ গ্রহণ করে নাই; করিলেও তখনকার শাসন-প্রণালীতে এখন কোনো ফল হইত না। ইহা বেশ দেখিয়াছি শিক্ষকের প্রদত্ত বিদ্যাটুকু শিখিতে শিশুরা অনেক বিলম্ব করে, কিন্তু শিক্ষকের ভাবখানা শিখিয়া লইতে তাহাদিগকে কোন দুঃখ পাইতে হয় না। শিক্ষাদান ব্যাপারের মধ্যে যে সমস্ত অবিচার, অধৈর্য্য, ক্রোধ, পক্ষপাত-পরতা ছিল অন্যান্য শিক্ষণীয় বিষয়ের চেয়ে সেটা অতি সহজেই আয়ত্ত করিয়া লইয়াছিলাম।—সুখের বিষয় এই যে, কাঠের রেলিঙের মতো নিতান্ত নির্ব্বাক ও অচল পদার্থ ছাড়া আর

কিছুর উপর সেই সমস্ত বর্ব্বরতা প্রয়োগ করিবার উপায় সেই দুর্ব্বল বয়সে আমার হাতে ছিল না। কিন্তু যদিচ রেলিং-শ্রেণীর সঙ্গে ছাত্রের শ্রেণীর পার্থক্য যথেষ্ট ছিল তবু আমার সঙ্গে আর সঙ্কীর্ণচিত্ত শিক্ষকের মনস্তত্ত্বের লেশমাত্র প্রভেদ ছিল না।

ওরিয়েন্টাল্ সেমিনারিতে বোধ করি বেশি দিন ছিলাম না। তাহার পরে নর্ম্মাল স্কুলে ভর্ত্তি হইলাম। তখন বয়স অত্যন্ত অল্প। একটা কথা মনে পড়ে, বিদ্যালয়ের কাজ আরম্ভ হইবার প্রথমেই গ্যালারিতে সকল ছেলে বসিয়া গানের সুরে কী সমস্ত কবিতা আবৃত্তি করিত। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে কিছু পরিমাণে ছেলেদের মনোরঞ্জনের আয়োজন থাকে নিশ্চয় ইহার মধ্যে সেই চেষ্টা ছিল। কিন্তু গানের কথাগুলো ছিলো ইংরাজি, তাহার সুরও তথৈবচ—আমরা যে কী মন্ত্র আওড়াইতেছি এবং কী অনুষ্ঠান করিতেছি তাহা কিছুই বুঝিতাম না। প্রত্যহ সেই একটা অর্থহীন একঘেয়ে ব্যাপারে যোগ দেওয়া আমাদের কাছে সুখকর ছিল না। অথচ ইস্কুলের কর্ত্তৃপক্ষেরা তখনকার. কোনো একটা থিওরি অবলম্বন করিয়া বেশ নিশ্চিন্ত ছিলেন যে তাঁহারা ছেলেদের আনন্দ-বিধান করিতেছেন ; কিন্তু প্রত্যক্ষ ছেলেদের দিকে তাকাইয়া তাহার ফলাফল বিচার করা সম্পূর্ণ বাহুল্য বোধ করিতেন। যেন তাঁহাদের থিওরি অনুসারে আনন্দ পাওয়া ছেলেদের একটা কর্ত্তব্য, না পাওয়া তাহাদের অপরাধ। এই জন্য যে ইংরেজী বই হইতে তাঁহারা থিওরি সংগ্রহ করিয়া-

ছিলেন তাহা হইতে আস্ত ইংরেজি গানটা তুলিয়া তাঁহারা আরাম বোধ করিয়াছিলেন। আমাদের মুখে সেই ইংরেজিটা কী ভাষায় পরিণত হইয়াছিল তাহার আলোচনা শব্দ-তত্ত্ববিদ্-গণের পক্ষে নিঃসন্দেহ মূল্যবান। কেবল একটা লাইন মনে পড়িতেছে—

"কলোকী পুলোকী সিংগিল মেলালিং মেলালিং মেলালিং।"

অনেক চিন্তা করিয়া ইহার কিয়দংশের মূল উদ্ধার করিতে পারিয়াছি—কিন্তু "কলোকী" কথাটা যে কিসের রূপান্তর তাহা আজও ভাবিয়া পাই নাই। বাকি অংশটা বোধ হয় "Full of glee, singing merrily, merrily, merrily."

ক্রমশঃ নর্ম্মাল স্কুলের স্মৃতিটা যেখানে ঝাপ্‌সা অবস্থা পার হইয়া স্ফুটতর হইয়া উঠিয়াছে সেখানে কোনো অংশেই তাহা লেশমাত্র মধুর নহে। ছেলেদের সঙ্গে যদি মিশিতে পারিতাম তবে বিদ্যাশিক্ষার দুঃখ তেমন অসহ্য বোধ হইত না। কিন্তু সে কোনোমতেই ঘটে নাই। অধিকাংশ ছেলেরই সংস্রব এমন অশুচি ও অপমানজনক ছিল যে ছুটির সময় আমি চাকরকে লইয়া দোতলায় রাস্তারদিকের এক জানালার কাছে একলা বসিয়া কাটাইয়া দিতাম। মনে মনে হিসাব করিতাম, এক বৎসর, দুই বৎসর, তিন বৎসর—আরো কত বৎসর এমন করিয়া কাটাইতে হইবে। শিক্ষকদের মধ্যে একজনের কথা আমার মনে আছে তিনি এমন কুৎসিত ভাষা ব্যবহার করিতেন যে তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধাবশত তাঁহার কোনো প্রশ্নেরই উত্তর করিতাম না। সম্বৎসর তাঁহার ক্লাসে

আমি সকল ছাত্রের শেষে নীরবে বসিয়া থাকিতাম। যখন পড়া চলিত তখন সেই অবকাশে পৃথিবীর অনেক দুরূহ সমস্যার মীমাংসাচেষ্টা করিতাম। একটা সমস্যার কথা মনে আছে। অস্ত্রহীন হইয়াও শত্রুকে কী করিলে যুদ্ধে হারানো যাইতে পারে সেটা আমার গভীর চিন্তার বিষয় ছিল। ঐ ক্লাসের পড়াশুনার গুঞ্জনধ্বনির মধ্যে বসিয়া ঐ কথাটা মনে মনে আলোচনা করিতাম তাহা আজও আমার মনে আছে। ভাবিতাম কুকুর বাঘ প্রভৃতি হিংস্রজন্তুদের খুব ভালো করিয়া শায়েস্তা করিয়া প্রথমে তাহাদের দুই চারি সার যুদ্ধক্ষেত্রে যদি সাজাইয়া দেওয়া যায় তবে লড়াইয়ের আসরের মুখবন্ধটা বেশ সহজেই জমিয়া ওঠে; তাহার পরে নিজেদের বাহুবল কাজে খাটাইলে জয়লাভটা নিতান্ত অসাধ্য হয় না। মনে মনে এই অত্যন্ত সহজ প্রণালীর রণসজ্জার ছবিটা যখন কল্পনা করিতাম তখন যুদ্ধক্ষেত্রে স্বপক্ষের জয় একেবারে সুনিশ্চিত দেখিতে পাইতাম। যখন হাতে কাজ ছিল না তখন কাজের অনেক আশ্চর্য্য সহজ উপায় বাহির করিয়াছিলাম। কাজ করিবার বেলায় দেখিতেছি যাহা কঠিন তাহা কঠিনই—যাহা দুঃসাধ্য তাহা দুঃসাধ্যই; ইহাতে কিছু অসুবিধা আছে বটে কিন্তু সহজ করিবার চেষ্টা করিলে অসুবিধা আরো সাতগুণ বাড়িয়া উঠে।

এমনি করিয়া সেই ক্লাসে একবছর কাটিয়া গেল তখন মধুসূদন বাচস্পতির নিকট আমাদের বাংলার বাৎসরিক পরীক্ষা হইল। সকল ছেলের চেয়ে আমি বেশি নম্বর

পাইলাম। আমাদের ক্লাসের শিক্ষক কর্তৃ-পুরুষদের কাছে জানাইলেন যে পরীক্ষক আমার প্রতি পক্ষপাত প্রকাশ করিয়াছেন। দ্বিতীয়বার আমার পরীক্ষা হইল। এবার স্বয়ং সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পরীক্ষকের পাশে চৌকি লইয়া বসিলেন। এবারেও ভাগ্যক্রমে আমি উচ্চস্থান পাইলাম।

কবিতা রচনারম্ভ

আমার বয়স তখন সাত আট বছরের বেশি হইবে না। আমার এক ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত জ্যোতিঃপ্রকাশ আমার চেয়ে বয়সে বেশ একটু বড়। তিনি তখন ইংরেজি সাহিত্যে প্রবেশ করিয়া খুব উৎসাহের সঙ্গে হ্যাম্‌লেটের স্বগত উক্তি আওড়াইতেছেন। আমার মতো শিশুকে কবিতা লেখাইবার জন্য তাঁহার হঠাৎ কেন যে উৎসাহ হইল তাহা আমি বলিতে পারি না। একদিন দুপুর বেলা তাঁহার ঘরে ডাকিয়া লইয়া বলিলেন তোমাকে পদ্য লিখিতে হইবে। বলিয়া পয়ারছন্দে চৌদ্দ অক্ষরে যোগাযোগের রীতিপদ্ধতি আমাকে বুঝাইয়া দিলেন।

পদ্য জিনিষটিকে এ পর্য্যন্ত কেবল ছাপার বহিতেই

দেখিয়াছি। কাটাকুটি নাই, ভাবচিন্তা নাই, কোনোখানে মর্ত্ত্যজনোচিত দুর্ব্বলতার কোন চিহ্ন দেখা যায় না। এই পদ্য যে নিজে চেষ্টা করিয়া লেখা যাইতে পারে এ কথা কল্পনা করিতেও সাহস হইত না। একদিন আমাদের বাড়িতে চোর ধরা পড়িয়াছিল। অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে অথচ নিরতিশয় কৌতূহলের সঙ্গে তাহাকে দেখিতে গেলাম। দেখিলাম নিতান্তই সে সাধারণ মানুষের মতো। এমন অবস্থায় দারোয়ান যখন মারিতে সুরু করিল আমার মনে অত্যন্ত ব্যথা লাগিল। পদ্যসম্বন্ধেও আমার সেই দশা হইল। গোটাকয়েক শব্দ নিজের হাতে জোড়াতাড়া দিতেই যখন তাহা পায়ার হইয়া উঠিল তখন পদ্যরচনার মহিমাসম্বন্ধে মোহ আর টিকিল না। এখন দেখিতেছি পদ্য বেচারার উপরেও মার সয় না। অনেক সময় দয়াও হয়, কিন্তু মারও ঠেকানো যায় না, হাত নিস্‌পিস্ করে। চোরের পিঠেও এত লোকের এতো বাড়ি পড়ে নাই।

ভয় যখন একবার ভাঙিল তখন আর ঠেকাইয়া রাখে কে? কোনো একটি কর্ম্মচারীর কৃপায় একখানি নীল-কাগজের খাতা জোগাড় করিলাম। তাহাতে স্বহস্তে পেন্সিল দিয়া কতকগুলা অসমান লাইন কাটিয়া বড়ো বড়ো কাঁচা অক্ষরে পদ্য লিখিতে সুরু করিয়া দিলাম।

হরিণ-শিশুর নূতন শিং বাহির হইবার সময় সে যেমন যেখানে সেখানে গুঁতা মারিয়া বেড়ায়, নূতন কাব্যোদ্গম লইয়া আমি সেই রকম উৎপাত আরম্ভ করিলাম। বিশেষতঃ

আমার দাদা আমার এই সকল রচনায় গর্ব্ব অনুভব করিয়া শ্রোতাসংগ্রহের উৎসাহে সংসারকে একেবারে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিলেন। মনে আছে একদিন একতালায় আমাদের জমিদারী কাছারীর আমলাদের কাছে কবিত্ব ঘোষণা করিয়া আমরা দুই ভাই বাহির হইয়া আসিতেছি এমন সময় তখনকার "ন্যাশানাল পেপার" পত্রের এডিটার শ্রীযুক্ত নবগোপাল মিত্র সবেমাত্র আমাদের বাড়িতে পদার্পণ করিয়াছেন। তৎক্ষণাৎ দাদা তাঁহাকে গ্রেফ্‌তার করিয়া কহিলেন "নবগোপাল বাবু, রবি একটা কবিতা লিখিয়াছে, শুনুন্ না।" শুনাইতে বিলম্ব হইল না। কাব্যগ্রন্থাবলীর বোঝা তখন ভারি হয় নাই। কবিকীর্ত্তি কবির জামার পকেটে পকেটেই তখন অনায়াসে ফেরে। নিজেই তখন লেখক, মুদ্রাকর, প্রকাশক এই তিনে-এক একে-তিন হইয়া ছিলাম। কেবল বিজ্ঞাপন দিবার কাজে আমার দাদা আমার সহযোগী ছিলেন। পদ্মের উপরে একটা কবিতা লিখিয়াছিলাম সেটা দেউড়ির সামনে দাঁড়াইয়াই উচ্চকণ্ঠে নবগোপালবাবুকে শুনাইয়া দিলাম। তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন, বেশ হইয়াছে, কিন্তু ঐ "দ্বিরেফ্" শব্দটার মানে কী ?

"দ্বিরেফ" এবং "ভ্রমর" দুটোই তিন অক্ষরের কথা। ভ্রমর শব্দটা ব্যবহার করিলে ছন্দের কোনো অনিষ্ট হইত না। ঐ দুরূহ কথাটা কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলাম, মনে নাই। সমস্ত কবিতাটার মধ্যে ঐ শব্দটার উপরেই আমার আশা ভরসা সব চেয়ে বেশি ছিল। দফ্‌তরখানার আমলা-

মহলে নিশ্চয়ই ঐ কথাটাতে বিশেষ ফল পাইয়াছিলাম কিন্তু নবগোপালবাবুকে ইহাতেও লেশমাত্র দুর্ব্বল করিতে পারিল না। এমন কি, তিনি হাসিয়া উঠিলেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইল নবগোপালবাবু সমজদার লোক নহেন। তাঁহাকে আর কখনো কবিতা শুনাই নাই। তাহার পরে আমার বয়স অনেক হইয়াছে কিন্তু কে সমজদার, কে নয়, তাহা পরখ্ করিবার প্রণালী বিশেষ পরিবর্ত্তন হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। যাই হোক নবগোপালবাবু হাসিলেন বটে কিন্তু "দ্বিরেফ" শব্দটা মধুপান-মত্ত ভ্রমরেরই মতো স্বস্থানে অবিচলিত রহিয়া গেল।

নানা বিদ্যার আয়োজন

তখন নর্ম্মাল ইস্কুলের একটি শিক্ষক শ্রীযুক্ত নীলকমল ঘোষাল মহাশয় বাড়িতে আমাদের পড়াইতেন। তাঁহার শরীর ক্ষীণ, শুষ্ক, ও কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ ছিল। তাঁহাকে মানুষ-জন্মধারী একটি ছিপ্‌ছিপে বেতের মতো বোধ হইত। সকাল ছটা হইতে সাড়ে নয়টা পর্য্যন্ত আমাদের শিক্ষাভার তাঁহার উপর ছিল। চারুপাঠ, বস্তুবিচার, প্রাণিবৃত্তান্ত হইতে আরম্ভ

করিয়া মাইকেলের মেঘনাদবধকাব্য পর্য্যন্ত ইঁহার কাছে পড়া। আমাদিগকে বিচিত্রবিষয়ে শিক্ষাদিবার জন্য সেজদাদার বিশেষ উৎসাহ ছিল। ইস্কুলে আমাদের যাহা পাঠ্য ছিল বাড়িতে তাহার চেয়ে অনেক বেশি পড়িতে হইত। ভোরে অন্ধকার থাকিতে উঠিয়া লঙ্‌টি পরিয়া প্রথমেই এক কাণা পালোয়ানের সঙ্গে কুস্তি করিতে হইত। তাহার পরে সেই মাটিমাখা শরীরের উপরে জামা পরিয়া পদার্থবিদ্যা, মেঘনাদবধকাব্য, জ্যামিতি, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল শিখিতে হইত। স্কুল হইতে ফিরিয়া আসিলেই ড্রয়িং এবং জিম্নাষ্টিকের মাষ্টার আমাদিগকে লইয়া পড়িতেন। সন্ধ্যার সময় ইংরাজি পড়াইবার জন্য অঘোর বাবু আসিতেন। এইরূপে রাত্রি নটার পর ছুটি পাইতাম।

রবিবার সকালে বিষ্ণুর কাছে গান শিখিতে হইত। তা ছাড়া প্রায় মাঝে মাঝে সীতানাথ দত্ত মহাশয় আসিয়া যন্ত্রতন্ত্রযোগে প্রাকৃত বিজ্ঞান শিক্ষা দিতেন। এই শিক্ষাটি আমার কাছে বিশেষ ঔৎসুক্যজনক ছিল। জ্বাল দিবার সময় তাপসংযোগে পাত্রের নীচের জল পাৎলা হইয়া উপরে উঠে, উপরের ভারি জল নীচে নামিতে থাকে এবং এই জন্যই জল টগ্‌বগ্ করে, ইহাই যেদিন তিনি কাচপাত্রের জলে কাঠের গুড়া দিয়া আগুনে চড়াইয়া প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দিলেন সেদিন মনের মধ্যে যে কিরূপ বিস্ময় অনুভব করিয়াছিলাম তাহা আজও স্পষ্ট মনে আছে। দুধের মধ্যে জল জিনিষটা যে একটা স্বতন্ত্র বস্তু, জ্বাল দিলে সেটা বাষ্প আকারে মুক্তি-

লাভ করে বলিয়াই দুধ গাঢ় হয় এ কথাটাও যেদিন স্পষ্ট বুঝিলাম সেদিনও ভারি আনন্দ হইয়াছিল। যে রবিবারে সকালে তিনি না আসিতেন, সে রবিবার আমার কাছে রবিবার বলিয়া মনে হইত না।

ইহা ছাড়া ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলের একটি ছাত্রের কাছে কোনো এক সময়ে অস্থিবিদ্যা শিখিতে আরম্ভ করিলাম। তার দিয়া জোড়া একটি নরকঙ্কাল কিনিয়া আনিয়া আমাদের ইস্কুল ঘরে লট্‌কাইয়া দেওয়া হইল।

ইহারি মাঝে একসময়ে হেরম্ব তত্ত্বরত্ন মহাশয় আমাদিগকে একেবারে "মুকুন্দং সচ্চিদানন্দং" হইতে আরম্ভ করিয়া মুগ্ধবোধের সূত্র মুখস্থ করাইতে সুরু করাইয়া দিলেন। অস্থিবিদ্যার হাড়ের নামগুলা এবং বোপ দেবের সূত্র, দুয়ের মধ্যে জিত কাহার ছিল তাহা ঠিক করিয়া বলিতে পারি না। আমার বোধ হয় হাড়গুলিই কিছু নরম ছিল।

বাংলা শিক্ষা যখন বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে তখন আমরা ইংরেজি শিখিতে আরম্ভ করিয়াছি। আমাদের মাষ্টার অঘোর বাবু মেডিকেল কলেজে পড়িতেন। সন্ধ্যার সময় তিনি আমাদিগকে পড়াইতে আসিতেন। কাঠ হইতে অগ্নি উদ্ভাবনাটাই মানুষের পক্ষে সকলের চেয়ে বড়ো উদ্ভাবন এই কথাটা শাস্ত্রে পড়িতে পাই। আমি তাহার প্রতিবাদ করিতে চাই না। কিন্তু সন্ধ্যাবেলায় পাখীরা আলো জ্বালিতে পারে না এটা যে পাখীর বাচ্ছাদের পরম সৌভাগ্য একথা আমি মনে না করিয়া থাকিতে পারি না। তাহারা যে ভাষা শেখে সেটা

প্রাতঃকালেই শেখে এবং মনের আনন্দেই শেখে সেটা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। অবশ্য, সেটা ইংরেজি ভাষা নয় একথাও স্মরণ করা উচিত।

এই মেডিকেল কলেজের ছাত্র মহাশয়ের স্বাস্থ্য এমন অত্যন্ত অন্যায়রূপে ভালো ছিল যে, তাঁহার তিন ছাত্রের একান্ত মনের কামনা সত্ত্বেও একদিনও তাঁহাকে কামাই করিতে হয় নাই। কেবল একবার যখন মেডিকেল কলেজের ফিরিঙ্গি ছাত্রদের সঙ্গে বাঙালি ছাত্রদের লড়াই হইয়াছিল সেই সময় শত্রুদল চৌকি ছুঁড়িয়া তাঁহার মাথা ভাঙিয়াছিল। ঘটনাটি শোচনীয় কিন্তু সে সময়টাতে মাষ্টারমহাশয়ের ভাঙা কপালকে আমাদেরই কপালের দোষ বলিয়া গণ্য করিতে পারি নাই এবং তাঁহার আরোগ্যলাভকে অনাবশ্যক দ্রুত বলিয়া বোধ হইয়াছিল।

সন্ধ্যা হইয়াছে; মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে; রাস্তায় একহাঁটু জল দাঁড়াইয়াছে। আমাদের পুকুর ভর্ত্তি হইয়া গিয়াছে; বাগানের বেলগাছের ঝাঁকড়া মাথাগুলা জলের উপরে জাগিয়া আছে; বর্ষাসন্ধ্যার পুলকে মনের ভিতরটা কদম্ব ফুলের মতো রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে। মাষ্টার মহাশয়ের আসিবার সময় দুচার মিনিট অতিক্রম করিয়াছে। তবু এখনও বলা যায় না। রাস্তার সম্মুখে বারান্দাটাতে চৌকি লইয়া গলির মোড়ের দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছি। "পততি পতত্রে বিচলিত পত্রে শঙ্কিত ভবদুপযানং" যা'কে বলে। এমন সময় বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডটা যেন হঠাৎ

আছাড় খাইয়া "হা হতোঽস্মি" করিয়া পড়িয়া গেল। দৈবদুর্য্যোগে অপরাহত সেই কালো ছাতাটি দেখা দিয়াছে। হইতে পারে আর কেহ! না, হইতেই পারে না। ভবভূতির সমানধর্ম্মা বিপুল পৃথিবীতে মিলিতেও পারে কিন্তু সেদিন সন্ধ্যাবেলায় আমাদেরি গলিতে মাষ্টার মহাশয়ের সমানধর্ম্মা দ্বিতীয় আর কাহারো অভ্যুদয় একেবারেই অসম্ভব।

যখন সকল কথা স্মরণ করি তখন দেখিতে পাই, অঘোর বাবু নিতান্তই যে কঠোর মাষ্টারমশাইজাতের মানুষ ছিলেন তাহা নহে। তিনি ভুজবলে আমাদের শাসন করিতেন না। মুখেও যেটুকু তর্জ্জন করিতেন তাহার মধ্যে গর্জ্জনের ভাগ বিশেষ কিছু ছিল না বলিলেই হয়। তিনি যত ভালোমানুষই হউন্ তাঁহার পড়াইবার সময় ছিল সন্ধ্যাবেলা এবং পড়াইবার বিষয় ছিল ইংরেজি। সমস্ত দুঃখদিনের পর সন্ধ্যাবেলায় টিম্‌টিমে বাতি জ্বালাইয়া বাঙালি ছেলেকে ইংরেজি পড়াইবার ভার যদি স্বয়ং বিষ্ণুদূতের উপরেও দেওয়া যায় তবু তাহাতে যমদূত বলিয়া মনে হইবেই তাহাতে সন্দেহ নাই। বেশ মনে আছে, ইংরেজি ভাষাটা যে নীরস্ নহে আমাদের কাছে তাহাই প্রমাণ করিতে অঘোর বাবু একদিন চেষ্টা করিয়াছিলেন;—তাহার সরসতার উদাহরণ দিবার জন্য, গদ্য কি পদ্য তাহা বলিতে পারি না, খানিকটা ইংরেজি তিনি মুগ্ধভাবে আমাদের কাছে আবৃত্তি করিয়াছিলেন। আমাদের কাছে সে ভারি অদ্ভুত বোধ হইয়াছিল। আমরা এতই

হাসিতে লাগিলাম যে সেদিন তাঁহাকে ভঙ্গ দিতে হইল; বুঝিতে পারিলেন মকদ্দমাটি নিতান্ত সহজ নহে—ডিক্রি পাইতে হইলে আরো এমন বছর দশ পনেরো রীতিমত লড়ালড়ি করিতে হইবে।

মাষ্টারমশায় মাঝে মাঝে আমাদের পাঠমরুস্থলীর মধ্যে ছাপানো বহির বাহিরের দক্ষিণ হাওয়া আনিবার চেষ্টা করিতেন। একদিন হঠাৎ পকেট হইতে কাগজে মোড়া একটি রহস্য বাহির করিয়া বলিলেন, আজ আমি তোমাদিগকে বিধাতার একটি আশ্চর্য্য সৃষ্টি দেখাইব। এই বলিয়া মোড়কটি খুলিয়া মানুষের একটি কণ্ঠনলী বাহির করিয়া তাহার সমস্ত কৌশল ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। আমার বেশ মনে আছে ইহাতে আমার মনটাতে কেমন একটা ধাক্কা লাগিল। আমি জানিতাম সমস্ত মানুষটাই কথা কয়; কথা কওয়া ব্যাপার-টাকে এমনতর টুকরা করিয়া দেখা যায় ইহা কখনো মনেও হয় নাই। কলকৌশল যত বড়ো আশ্চর্য্য হউক না কেন তাহা তো মোট মানুষের চেয়ে বড়ো নহে। তখন অবশ্য এমন করিয়া ভাবি নাই কিন্তু মনটা কেমন একটু ম্লান হইল; মাষ্টারমশায়ের উৎসাহের সঙ্গে ভিতর হইতে যোগ দিতে পারিলাম না। কথা কওয়ার আসল রহস্যটুকু যে সেই মানুষটির মধ্যেই আছে এই কণ্ঠনলীর মধ্যে নাই দেহব্যব-চ্ছেদের কালে মাষ্টারমশায় বোধ হয় তাহা খানিকটা ভুলিয়া-ছিলেন, এইজন্যই তাঁহার কণ্ঠনলীর ব্যাখ্যা সেদিন বালকের মনে ঠিকমতো বাজে নাই। তার পরে একদিন তিনি

আমাদিগকে মেডিকেল কলেজের শবব্যবচ্ছেদের ঘরে লইয়া গিয়াছিলেন। টেবিলের উপর একটি বৃদ্ধার মৃতদেহ শয়ান ছিল; সেটা দেখিয়া আমার মন তেমন চঞ্চল হয় নাই কিন্তু মেজের উপরে একখণ্ড কাটা পা পড়িয়াছিল সে দৃশ্যে আমার সমস্ত মন একেবারে চমকিয়া উঠিয়াছিল। মানুষকে এইরূপ টুকরা করিয়া দেখা এমন ভয়ঙ্কর, এমন অসঙ্গত যে সেই মেজের উপর পড়িয়া-থাকা একটা কৃষ্ণবর্ণ অর্থহীন পায়ের কথা আমি অনেক দিন পর্য্যন্ত ভুলিতে পারি নাই।

প্যারি সরকারের প্রথম দ্বিতীয় ইংরেজি পাঠ কোনো মতে শেষ করিতেই আমাদিগকে মকলক্স্ কোর্স অফ্ রীডিং শ্রেণীর একখানা পুস্তক ধরানো হইল। একে সন্ধ্যাবেলায় শরীর ক্লান্ত এবং মন অন্তঃপুরের দিকে, তাহার পরে সেই বইখানার মলাট কালো এবং মোটা, তাহার ভাষা শক্ত এবং তাহার বিষয়গুলির মধ্যে নিশ্চয়ই দয়ামায়া কিছুই ছিল না, কেননা শিশুদের প্রতি সেকালে মাতা সরস্বতীর মাতৃভাবের কোনো লক্ষণ দেখি নাই। এখনকার মতো ছেলেদের বইয়ে তখন পাতায় পাতায় ছবির চলন ছিল না। প্রত্যেক পাঠ্য-বিষয়ের দেউড়িতেই থাকে-থাকে-সারবাঁধা সিলেব্‌ল্-ফাঁক-করা বানানগুলো অ্যাক্সেণ্ট চিহ্নের তীক্ষ্ণ সঙীন উঁচাইয়া শিশুপালবধের জন্য কাবাজ করিতে থাকিত। ইংরেজি ভাষার এই পাষাণ দুর্গে মাথা ঠুকিয়া আমরা কিছুতেই কিছু করিয়া উঠিতে পারিতাম না। মাষ্টার মহাশয় তাঁহার অপর একটি কোন্ সুবোধ ছাত্রের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া আমাদের

প্রত্যহ ধিক্কার দিতেন। এরূপ তুলনামূলক সমালোচনায় সেই ছেলেটির প্রতি আমাদের প্রীতিসঞ্চার হইত না, লজ্জাও পাইতাম অথচ সেই কালো বইটার অন্ধকার অটল থাকিত। প্রকৃতিদেবী জীবের প্রতি দয়া করিয়া দুর্ব্বোধ পদার্থমাত্রের মধ্যে নিদ্রাকর্ষণের মোহমন্ত্রটি পড়িয়া রাখিয়াছেন। আমরা যেমনি পড়া সুরু করিতাম অমনি মাথা ঢুলিয়া পড়িত। চোখে জলসেক করিয়া বারান্দায় দৌড় করাইয়া কোনো স্থায়ী ফল হইত না। এমন সময় বড়ো দাদা যদি দৈবাৎ স্কুলঘরের বারান্দা দিয়া যাইবার কালে আমাদের নিদ্রাকাতর অবস্থা দেখিতে পাইতেন তবে তখনি ছুটি দিয়া দিতেন। ইহার পরে ঘুম ভাঙিতে আর মুহূর্ত্তকাল বিলম্ব হইত না।

বাহিরে যাত্রা

একবার কলিকাতায় ডেঙ্গুজ্বরের তাড়ায় আমাদের বৃহৎ পরিবারের কিয়দংশ পেনেটিতে ছাতু বাবুদের বাগানে আশ্রয় লইল। আমরা তাহার মধ্যে ছিলাম।

এই প্রথম বাহিরে গেলাম। গঙ্গার তীরভূমি যেন কোন্ পূর্ব্বজন্মের পরিচয়ে আমাকে কোলে করিয়া লইল।

সেখানে চাকরদের ঘরটির সাম্‌নে গোটাকয়েক পেয়ারা গাছ। সেই ছায়াতলে বারান্দায় বসিয়া সেই পেয়ারা বনের অন্তরাল দিয়া গঙ্গার ধারার দিকে চাহিয়া আমার দিন কাটিত। প্রত্যহ প্রভাতে ঘুম হইতে উঠিবামাত্র আমার কেমন মনে হইত যেন দিনটাকে একখানি সোনালি-পাড়দেওয়া নূতন চিঠির মতো পাইলাম। লেফাফা খুলিয়া ফেলিলে যেন কী অপূর্ব্ব খবর পাওয়া যাইবে! পাছে একটুও কিছু লোকসান হয় এই আগ্রহে তাড়াতাড়ি মুখ ধুইয়া বাহিরে আসিয়া চৌকি লইয়া বসিতাম। প্রতিদিন গঙ্গার উপর সেই জোয়ারভাঁটার আসাযাওয়া, কত রকম রকম নৌকার কত গতিভঙ্গী, সেই পেয়ারাগাছের ছায়ার পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব দিকে অপসারণ, সেই কোন্নগরের পারে শ্রেণীবদ্ধ বনান্ধকারের উপর বিদীর্ণবক্ষ সূর্য্যাস্তকালের অজস্র স্বর্ণশোণিত-প্লাবন। এক-এক দিন সকাল হইতে মেঘ করিয়া আসে; ওপারের গাছগুলি কালো; নদীর উপর কালো ছায়া; দেখিতে দেখিতে সশব্দ বৃষ্টির ধারায় দিগন্ত ঝাপসা হইয়া যায়, ওপারের তটরেখা যেন চোখের জলে বিদায় গ্রহণ করে, নদী ফুলিয়া ফুলিয়া উঠে, এবং ভিজা হাওয়া এপারের ডালপালাগুলার মধ্যে যা-খুসি-তাই করিয়া বেড়ায়।

কড়ি-বরগা-দেয়ালের জঠরের মধ্য হইতে বাহিরের জগতে যেন নূতন জন্মলাভ করিলাম। সকল জিনিষকেই আর-একবার নূতন করিয়া জানিতে গিয়া পৃথিবীর উপর হইতে অভ্যাসের তুচ্ছতার আবরণ একেবারে ঘুচিয়া গেল।

সকাল বেলায় এখো-গুড় দিয়া যে বাসি লুচি খাইতাম নিশ্চয়ই স্বর্গলোকে ইন্দ্র যে অমৃত খাইয়া থাকেন, তাহার সঙ্গে তার স্বাদের বিশেষ কিছু পার্থক্য নাই। কারণ, অমৃত জিনিষটা রসের মধ্যে নাই রসবোধের মধ্যেই আছে—এই জন্য যাহারা সেটাকে খোঁজে তাহারা সেটাকে পায়ই না।

যেখানে আমরা বসিতাম তাহার পিছনে প্রাচীর দিয়া ঘেরা ঘাটবাঁধানো একটা খিড়কির পুকুর—ঘাটের পাশেই একটা মস্ত জামরুল গাছ; চারিধারেই বড়ো বড়ো ফলের গাছ ঘন হইয়া দাঁড়াইয়া ছায়ার আড়ালে পুষ্করিণীটির আব্রু রচনা করিয়া আছে। এই ঢাকা, ঘেরা, ছায়া করা, সঙ্কুচিত একটুখানি খিড়কির বাগানের ঘোমটাপরা সৌন্দর্য্য আমার কাছে ভারি মনোহর ছিল। সম্মুখের উদার গঙ্গাতীরের সঙ্গে এর কতই তফাৎ। এ যেন ঘরের বধূ। কোণের আড়ালে, নিজের হাতের লতাপাতা-আঁকা সবুজ রঙের কাঁথাটি মেলিয়া দিয়া মধ্যাহ্নের নিভৃত আকাশে মনের কথাটিকে মৃদুগুঞ্জনে ব্যক্ত করিতেছে। সেই মধ্যাহ্নেই অনেকদিন জামরুল গাছের ছায়ায় ঘাটে একলা বসিয়া পুকুরের গভীর তলাটার মধ্যে যক্ষপুরীর ভয়ের রাজ্য কল্পনা করিয়াছি।

বাংলা দেশের পাড়াগাঁটাকে ভালো করিয়া দেখিবার জন্য অনেক দিন হইতে মনে আমার ঔৎসুক্য ছিল। গ্রামের ঘরবস্তি চণ্ডীমণ্ডপ রাস্তাঘাট খেলাধূলা হাটমাঠ জীবন-যাত্রার কল্পনা আমার হৃদয়কে অত্যন্ত টানিত। সেই পাড়াগাঁ এই গঙ্গাতীরের বাগানের ঠিক একেবারে পশ্চাতেই ছিল—কিন্তু

সেখানে আমাদের নিষেধ। আমরা বাহিরে আসিয়াছি কিন্তু স্বাধীনতা পাই নাই। ছিলাম খাঁচায়, এখন বসিয়াছি দাঁড়ে—পায়ের শিকল কাটিল না।

এক দিন আমার অভিভাবকের মধ্যে দুই জনে সকালে পাড়ায় বেড়াইতে গিয়াছিলেন। আমি কৌতূহলের আবেগ সাম্‌লাইতে না পারিয়া তাঁহাদের অগোচরে পিছনে পিছনে কিছুদূর গিয়াছিলাম। গ্রামের গলিতে ঘন বনের ছায়ায় সেওড়ার-বেড়া-দেওয়া পানা-পুকুরের ধার দিয়া চলিতে চলিতে বড়ো আনন্দে এই ছবি আমি মনের মধ্যে আঁকিয়া আঁকিয়া লইতেছিলাম। একজন লোক অত বেলায় পুকুরের ধারে খোলা গায়ে দাঁতন করিতেছিল, তাহা আজও আমার মনে রহিয়া গিয়াছে। এমন সময়ে আমার অগ্রবর্ত্তীরা হঠাৎ টের পাইলেন আমি পিছনে আছি। তখনই ভৎর্সনা করিয়া উঠিলেন, যাও, যাও, এখনি ফিরে যাও!—তাঁহাদের মনে হইয়াছিল বাহির হইবার মতো সাজ আমার ছিল না। পায়ে আমার মোজা নাই, গায়ে একখানি জামার উপর অন্য কোন ভদ্র আচ্ছাদন নাই—ইহাকে তাঁহারা আমার অপরাধ বলিয়া গণ্য করিলেন। কিন্তু মোজা এবং পোষাক-পরিচ্ছদের কোনো উপসর্গ আমার ছিলই না, সুতরাং কেবল সেই দিনই যে হতাশ হইয়া আমাকে ফিরিতে হইল তাহা নহে, ত্রুটি সংশোধন করিয়া ভবিষ্যতে আর এক দিন বাহির হইবার উপায়ও রহিল না।

সেই পিছনে আমার বাধা রহিল কিন্তু গঙ্গা সম্মুখ হইতে

আমার সমস্ত বন্ধন হরণ করিয়া লইলেন। পাল-তোলা নৌকায় যখন-তখন আমার মন বিনাভাড়ায় সওয়ারি হইয়া বসিত এবং যে সব দেশে যাত্রা করিয়া বাহির হইত ভূগোলে আজ পর্য্যন্ত তাহাদের কোনো পরিচয় পাওয়া যায় নাই।

সে হয়তো আজ চল্লিশ বছরের কথা। তারপরে সেই বাগানের পুষ্পিত চাঁপাতলার স্নানের ঘাটে আর এক দিনের জন্যও পদার্পণ করি নাই। সেই গাছপালা, সেই বাড়িঘর নিশ্চয়ই এখনো আছে, কিন্তু জানি সে বাগান আর নাই; কেননা বাগান তো গাছপালা দিয়া তৈরি নয়, একটি বালকের নববিস্ময়ের আনন্দ দিয়া সে গড়া—সেই নববিস্ময়টি এখন কোথায় পাওয়া যাইবে?

জোড়াসাঁকোর বাড়িতে আবার ফিরিলাম। আমার দিন-গুলি নর্ম্মাল স্কুলের হাঁ-করা মুখবিবরের মধ্যে তাহার প্রাত্যহিক বরাদ্দ গ্রাসপিণ্ডের মতো প্রবেশ করিতে লাগিল।

কাব্যরচনাচর্চ্চা

সেই নীল খাতাটি ক্রমেই বাঁকা বাঁকা লাইনে ও সরু মোটা অক্ষরে কীটের বাসার মতো ভরিয়া উঠিতে চলিল। বালকের আগ্রহপূর্ণ চঞ্চল হাতের পীড়নে প্রথমে তাহা কুঞ্চিত হইয়া গেল। ক্রমে তাহার ধারগুলি ছিঁড়িয়া কতকগুলি

আঙ্গুলের মতো হইয়া ভিতরের লেখাগুলিকে যেন মুঠা করিয়া চাপিয়া রাখিয়া দিল। সেই নীলফুল্‌স্‌কাপের খাতাটি লইয়া করুণাময়ী বিলুপ্তিদেবী কবে বৈতরণীর কোন্ ভাঁটার স্রোতে ভাসাইয়া দিয়াছেন জানি না। আহা, তাহার ভবভয় আর নাই। মুদ্রাযন্ত্রের জঠরযন্ত্রণার হাত সে এড়াইল!

আমি কবিতা লিখি এ খবর যাহাতে রটিয়া যায় নিশ্চয়ই সে সম্বন্ধে আমার ঔদাসীন্য ছিল না। সাতকড়ি দত্ত মহাশয় যদিচ আমাদের ক্লাসের শিক্ষক ছিলেন না তবু আমার প্রতি তাঁহার বিশেষ স্নেহ ছিল। তিনি প্রাণিবৃত্তান্ত নামে একখানা বই লিখিয়াছিলেন। আশা করি কোনো সুদক্ষ পরিহাসরসিক ব্যক্তি সেই গ্রন্থলিখিত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া তাঁহার স্নেহের কারণ নির্ণয় করিবেন না। তিনি এক দিন আমাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি নাকি কবিতা লিখিয়া থাক? লিখিয়া যে থাকি সে কথা গোপন করি নাই। ইহার পর হইতে তিনি আমাকে উৎসাহ দিবার জন্য মাঝে মাঝে দুই এক পদ কবিতা দিয়া তাহা পূরণ করিয়া আনিতে বলিতেন। তাহার মধ্যে একটি আমার মনে আছে:—

রবিকরে জ্বালাতন আছিল সবাই,
বরষা ভরসা দিল আর ভয় নাই।

আমি ইহার সঙ্গে যে পদ্য জুড়িয়াছিলাম তাহার কেবল দুটো লাইন মনে আছে। আমার সেকালের কবিতাকে কোনো

মতেই যে দুর্ব্বোধ বলা চলে না তাহারই প্রমাণস্বরূপে লাইন দুটোকে এই সুযোগে এখানে দলিলভুক্ত করিয়া রাখিলাম ঃ—

মীনগণ হীন হয়ে ছিল সরোবরে
এখন তাহারা সুখে জলক্রীড়া করে।

ইহার মধ্যে যেটুকু গভীরতা আছে তাহা সরোবরসংক্রান্ত—অত্যন্ত স্বচ্ছ। আর একটি কোনো ব্যক্তিগত বর্ণনা হইতে চার লাইন উদ্ধৃত করি—আশা করি ইহার ভাষা ও ভাব অলঙ্কারশাস্ত্রে প্রাঞ্জল বলিয়া গণ্য হইবে ঃ—

আমসত্ত দুধে ফেলি তাহাতে কদলী দলি,
সন্দেশ মাখিয়া দিয়া তাতে—
হাপুস্ হুপুস্ শব্দ, চারিদিক নিস্তব্ধ,
পিঁপিড়া কাঁদিয়া যায় পাতে।

আমাদের ইস্কুলের গোবিন্দ বাবু ঘনকৃষ্ণবর্ণ বেঁটেখাটো মোটাসোটা মানুষ, ইনি ছিলেন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। কালো চাপকান পরিয়া দোতলায় আপিস ঘরে খাতাপত্র লইয়া লেখাপড়া করিতেন। ইঁহাকে আমরা ভয় করিতাম। ইনিই ছিলেন বিদ্যালয়ের দণ্ডধারী বিচারক। একদিন অত্যাচারে পীড়িত হইয়া দ্রুতবেগে ইঁহার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলাম। আসামী ছিল পাঁচ ছয় জন বড়ো বড়ো ছেলে; আমার পক্ষে সাক্ষী কেহই ছিল না। সাক্ষীর মধ্যে ছিল আমার অশ্রুজল! সেই ফৌজদারীতে আমি জিতিয়াছিলাম এবং সেই পরিচয়ের পর হইতে গোবিন্দ বাবু আমাকে করুণার চক্ষে দেখিতেন।

একদিন ছুটির সময় তাঁহার ঘরে আমার হঠাৎ ডাক পড়িল। আমি ভীতচিত্তে তাঁহার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইতেই তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি না কি কবিতা লেখ? কবুল করিতে ক্ষণমাত্র দ্বিধা করিলাম না। মনে নাই কী একটা উচ্চ অঙ্গের সুনীতি সম্বন্ধে আমাকে কবিতা লিখিয়া আনিতে আদেশ করিলেন। গোবিন্দবাবুর মতো ভীষণ-গম্ভীর লোকের মুখ হইতে কবিতা লেখার এই আদেশ যে কিরূপ অদ্ভুত সুললিত তাহা যাঁহারা তাঁহার ছাত্র নহেন তাঁহারা বুঝিবেন না। পরদিন লিখিয়া যখন তাঁহাকে দেখাইলাম তিনি আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া ছাত্রবৃত্তির ক্লাসের সম্মুখে দাঁড় করাইয়া দিলেন। বলিলেন, পড়িয়া শোনাও। আমি উচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তি করিয়া গেলাম।

এই নীতিকবিতাটির প্রশংসা করিবার একটিমাত্র বিষয় আছে—এটি সকাল সকাল হারাইয়া গেছে। ছাত্রবৃত্তি ক্লাসে ইহার নৈতিক ফল যাহা দেখা গেল তাহা আশাপ্রদ নহে। অন্তত এই কবিতার দ্বারায় শ্রোতাদের মনে কবির প্রতি কিছুমাত্র সদ্ভাবসঞ্চার হয় নাই। অধিকাংশ ছেলেই আপনাদের মধ্যে বলাবলি করিতে লাগিল এ লেখা নিশ্চয় আমার নিজের রচনা নহে। একজন বলিল, যে ছাপার বই হইতে এ লেখা চুরি সে তাহা আনিয়া দেখাইয়া দিতে পারে। কেহই তাহাকে দেখাইয়া দিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিল না। বিশ্বাস করাই তাহাদের আবশ্যক—প্রমাণ করিতে গেলে তাহার ব্যাঘাত হইতে পারে। ইহার পরে কবিযশঃপ্রার্থীর

সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। তাহারা যে পথ অবলম্বন করিল তাহা নৈতিক উন্নতির প্রশস্ত পথ নহে।

এখনকার দিনে ছোটছেলের কবিতা লেখা কিছুমাত্র বিরল নহে। আজকাল কবিতার গুমর একেবারে ফাঁক হইয়া গিয়াছে। মনে আছে তখন দৈবাৎ যে দুই একজন মাত্র স্ত্রীলোক কবিতা লিখিতেন তাঁহাদিগকে বিধাতার আশ্চর্য্য সৃষ্টি বলিয়া সকলে গণ্য করিত। এখন যদি শুনি কোনো স্ত্রীলোক কবিতা লেখেন না তবে সেইটেই এমন অসম্ভব বোধ হয় যে, সহজে বিশ্বাস করিতে পারি না। কবিত্বের অঙ্কুর এখনকার কালে উৎসাহের অনাবৃষ্টিতেও ছাত্রবৃত্তি ক্লাসের অনেক পূর্ব্বেই মাথা তুলিয়া উঠে। অতএব বালকের যে কীর্ত্তিকাহিনী এখানে উদ্‌ঘাটিত করিলাম তাহাতে বর্ত্তমান-কালের কোনো গোবিন্দবাবু বিস্মিত হইবেন না।

শ্রীকণ্ঠবাবু

এই সময়ে একটি শ্রোতালাভ করিয়াছিলাম—এমন আর পাইব না। ভালো লাগিবার শক্তি ইঁহার এতই অসাধারণ যে মাসিকপত্রের সংক্ষিপ্ত সমালোচকপদলাভের ইনি একেবারেই অযোগ্য। বৃদ্ধ একেবারে সুপক্ক বোম্বাই আমটির মতো—অম্লরসের আভাসমাত্রবর্জ্জিত—তাঁহার স্বভাবের

কোথাও এতটুকু আঁশও ছিল না। মাথা-ভরা টাক, গোঁফ-দাড়ি-কামানো স্নিগ্ধ মধুর মুখ, মুখবিবরের মধ্যে দন্তের কোনো বালাই ছিল না, বড়ো বড়ো দুই চক্ষু অবিরাম হাস্যে সমুজ্জ্বল। তাঁহার স্বাভাবিক ভারি গলায় যখন কথা কহিতেন তখন তাঁহার সমস্ত হাত মুখ চোখ কথা কহিতে থাকিত। ইনি সেকালের পার্সিপড়া রসিক মানুষ, ইংরাজির কোনো ধার ধারিতেন না। তাঁহার বামপার্শ্বের নিত্যসঙ্গিনী ছিল একটি গুড়গুড়ি, কোলে কোলে সর্ব্বদাই ফিরিত একটি সেতার, এবং কণ্ঠে গানের আর বিশ্রাম ছিল না।

পরিচয় থাক্ আর নাই থাক্ স্বাভাবিক হৃদ্যতার জোরে মানুষমাত্রেরই প্রতি তাঁহার এমন একটি অবাধ অধিকার ছিল যে কেহই সেটি অস্বীকার করিতে পারিত না। বেশ মনে পড়ে তিনি একদিন আমাদের লইয়া একজন ইংরেজ ছবি-ওয়ালার দোকানে ছবি তুলিতে গিয়াছিলেন। তাহার সঙ্গে হিন্দীতে বাংলাতে তিনি এমনি আলাপ জমাইয়া তুলিলেন—অত্যন্ত পরিচিত আত্মীয়ের মতো তাহাকে এমন জোর করিয়া বলিলেন, ছবিতোলার জন্য অত বেশি দাম আমি কোনো মতেই দিতে পারিব না, আমি গরীব মানুষ,—না, না, সাহেব সে কিছুতে হইতে পারিবে না—যে, সাহেব হাসিয়া সস্তায় তাঁহার ছবি তুলিয়া দিল। কড়া ইংরেজের দোকানে তাঁহার মুখে এমনতর অসঙ্গত অনুরোধ যে কিছুমাত্র অশোভন শোনাইল না তাহার কারণ সকল মানুষের সঙ্গেই তাঁহার সম্বন্ধটি স্বভাবত নিষ্কণ্টক ছিল—তিনি কাহারো সম্বন্ধেই সঙ্কোচ

রাখিতেন না, কেননা তাঁহার মনের মধ্যে সঙ্কোচের কারণই ছিল না।

তিনি এক-একদিন আমাকে সঙ্গে করিয়া একজন য়ুরোপীয় মিশনরির বাড়িতে যাইতেন। সেখানে গিয়া তিনি গান গাহিয়া, সেতার বাজাইয়া, মিশনরির মেয়েদের আদর করিয়া তাহাদের বুটপরা ছোট দুইটি পায়ের অজস্র স্তুতিবাদ করিয়া সভা এমন জমাইয়া তুলিতেন যে তাহা আর কাহারো দ্বারা কখনই সাধ্য হইত না। আর কেহ এমনতর ব্যাপার করিলে নিশ্চয়ই তাহা উপদ্রব বলিয়া গণ্য হইত—কিন্তু শ্রীকণ্ঠবাবুর পক্ষে ইহা আতিশয্যই নহে—এই জন্য সকলেই তাঁহাকে লইয়া হাসিত, খুসি হইত।

আবার তাঁহাকে কোন অত্যাচারকারী দুর্ব্বৃত্ত আঘাত করিতে পারিত না। অপমানের চেষ্টা তাঁহার উপরে অপমান-রূপে আসিয়া পড়িত না। আমাদের বাড়িতে এক সময়ে একজন বিখ্যাত গায়ক কিছুদিন ছিলেন। তিনি মত্ত অবস্থায় শ্রীকণ্ঠবাবুকে যাহা মুখে আসিত তাহাই বলিতেন। শ্রীকণ্ঠবাবু প্রসন্নমুখে সমস্তই মানিয়া লইতেন, লেশমাত্র প্রতিবাদ করিতেন না। অবশেষে তাঁহার প্রতি দুর্ব্যবহারের জন্য সেই গায়কটিকে আমাদের বাড়ি হইতে বিদায় করাই স্থির হইল। ইহাতে শ্রীকণ্ঠবাবু ব্যাকুল হইয়া তাহাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিলেন। বারবার করিয়া বলিলেন, ও তো কিছুই করে নাই; মদে করিয়াছে।

কেহ দুঃখ পায় ইহা তিনি সহিতে পারিতেন না—ইহার

কাহিনীও তাঁহার পক্ষে অসহ্য ছিল। এই জন্য বালকদের কেহ যখন কৌতুক করিয়া তাঁহাকে পীড়ন করিতে চাহিত তখন বিদ্যাসাগরের সীতার বনবাস বা শকুন্তলা হইতে কোনো একটা করুণ অংশ তাঁহাকে পড়িয়া শোনাইত, তিনি দুই হাত মেলিয়া নিষেধ করিয়া অনুনয় করিয়া কোনো মতে থামাইয়া দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িতেন।

এই বৃদ্ধটি আমার পিতার, তেমনি দাদাদের, তেমনি আমাদেরও বন্ধু ছিলেন। আমাদের সকলেরই সঙ্গে তাঁহার বয়স মিলিত। কবিতা শোনাইবার এমন অনুকূল শ্রোতা সহজে মিলে না। ঝরনার ধারা যেমন এক-টুকরা নুড়ি পাইলেও তাহাকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া নাচিয়া মাৎ করিয়া দেয় তিনিও তেমনি যে-কোনো একটা উপলক্ষ্য পাইলেই আপন উল্লাসে উদ্বেল হইয়া উঠিতেন। দুইটি ঈশ্বরস্তব রচনা করিয়া-ছিলাম। তাহাতে যথারীতি সংসারের দুঃখকষ্ট ও ভবযন্ত্রণার উল্লেখ করিতে ছাড়ি নাই। শ্রীকণ্ঠবাবু মনে করিলেন এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পারমার্থিক কবিতা আমার পিতাকে শুনাইলে নিশ্চয়ই তিনি ভারি খুসি হইবেন। মহা উৎসাহে কবিতা শুনাইতে লইয়া গেলেন। ভাগ্যক্রমে আমি স্বয়ং সেখানে উপস্থিত ছিলাম না—কিন্তু খবর পাইলাম যে সংসারের দুঃসহ দাবদাহ এত সকাল সকালই যে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রকে পীড়া দিতে আরম্ভ করিয়াছে, পয়ারছন্দে তাহার পরিচয় পাইয়া তিনি খুব হাসিয়াছিলেন। বিষয়ের গাম্ভীর্য্যে তাঁহাকে কিছুমাত্র অভিভূত করিতে পারে নাই। আমি নিশ্চয় বলিতে

পারি আমাদের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ গোবিন্দবাবু হইলে সে কবিতা দুটির আদর বুঝিতেন।

গানসম্বন্ধে আমি শ্রীকণ্ঠবাবুর প্রিয় শিষ্য ছিলাম। তাঁহার একটা গান ছিল—"ময়্ ছোড়োঁ ব্রজকি বাসরী।" ঐ গানটি আমার মুখে সকলকে শোনাইবার জন্য তিনি আমাকে ঘরে ঘরে টানিয়া লইয়া বেড়াইতেন। আমি গান ধরিতাম, তিনি সেতার ঝঙ্কার দিতেন এবং যেখানটিতে গানের প্রধান ঝোঁক "ময়্ ছোড়োঁ," সেইখানটাতে মাতিয়া উঠিয়া তিনি নিজে যোগ দিতেন ও অশ্রান্তভাবে সেটা ফিরিয়া ফিরিয়া আবৃত্তি করিতেন এবং মাথা নাড়িয়া মুগ্ধদৃষ্টিতে সকলের মুখের দিকে চাহিয়া যেন সকলকে ঠেলা দিয়া ভাললাগায় উৎসাহিত করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেন।

ইনি আমার পিতার ভক্ত বন্ধু ছিলেন। ইঁহারই দেওয়া হিন্দি গান হইতে ভাঙা একটি ব্রহ্মসঙ্গীত আছে—"অন্তরতর অন্তরতম তিনি যে—ভুলো না রে তাঁয়।" এই গানটি তিনি পিতৃদেবকে শোনাইতে শোনাইতে আবেগে চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেন। সেতারে ঘন ঘন ঝঙ্কার দিয়া একবার বলিতেন—অন্তরতর অন্তরতম তিনি যে—আবার পাল্টাইয়া লইয়া তাঁহার মুখের সম্মুখে হাত নাড়িয়া বলিতেন "অন্তরতর অন্তরতম তুমি যে।"

এই বৃদ্ধ যেদিন আমার পিতার সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎ করিতে আসেন, তখন পিতৃদেব চুঁচুড়ায় গঙ্গার ধারের বাগানে ছিলেন। শ্রীকণ্ঠবাবু তখন অন্তিম রোগে আক্রান্ত, তাঁহার

উঠিবার শক্তি ছিল না, চোখের পাতা আঙুল দিয়া তুলিয়া চোখ মেলিতে হইত। এই অবস্থায় তিনি তাঁহার কন্যার শুশ্রূষাধীনে বীরভূমের রায়পুর হইতে চুঁচুড়ায় আসিয়াছিলেন। বহুকষ্টে একবারমাত্র পিতৃদেবের পদধূলি লইয়া চুঁচুড়ার বাসায় ফিরিয়া আসেন ও অল্পদিনেই তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার কন্যার কাছে শুনিতে পাই আসন্ন মৃত্যুর সময়েও "কী মধুর তব করুণা প্রভো" গানটি গাহিয়া তিনি চিরনীরবতা লাভ করেন।

বাংলাশিক্ষার অবসান

আমরা ইস্কুলে তখন ছাত্রবৃত্তি ক্লাসের এক ক্লাস নীচে বাংলা পড়িতেছি। বাড়িতে আমরা সে ক্লাসের বাংলা পাঠ্য ছাড়াইয়া অনেকদূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছি। বাড়িতে আমরা অক্ষয়কুমার দত্তের পদার্থবিদ্যা শেষ করিয়াছি, মেঘনাদবধ পড়া হইয়া গিয়াছে। পদার্থবিদ্যা পড়িয়াছিলাম, কিন্তু পদার্থের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক ছিল না, কেবল পুঁথির পড়া— বিদ্যাও তদনুরূপ হইয়াছিল। সে সময়টা সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়াছিল। [আমার তো মনে হয় নষ্ট হওয়ার চেয়ে বেশি;

কারণ, কিছু না করিয়া যে সময় নষ্ট হয় তাহার চেয়ে অনেক বেশি লোকসান করি কিছু করিয়া যে সময়টা নষ্ট করা যায়। মেঘনাদবধ কাব্যটিও আমাদের পক্ষে আরামের জিনিষ ছিল না। যে জিনিষটা পাতে পড়িলে উপাদেয় সেইটাই মাথায় পড়িলে গুরুতর হইয়া উঠিতে পারে। ভাষা শিখাইবার জন্য ভালো কাব্য পড়াইলে তরবারি দিয়া ক্ষৌরি করাইবার মতো হয়—তরবারির তো অমর্য্যাদা হয়ই, গণ্ডদেশেরও বড়ো দুর্গতি ঘটে। কাব্য জিনিষটাকে রসের দিক হইতে পুরা-পুরি কাব্য হিসাবেই পড়ানো উচিত, তাহার দ্বারা ফাঁকি দিয়া অভিধান ব্যাকরণের কাজ চালাইয়া লওয়া কখনই সরস্বতীর তুষ্টিকর নহে।

এই সময়ে আমাদের নর্ম্মাল ইস্কুলের পালা হঠাৎ শেষ হইয়া গেল। তাহার একটু ইতিহাস আছে। আমাদের বিদ্যালয়ের কোনো একজন শিক্ষক কিশোরীমোহন মিত্রের রচিত আমার পিতামহের ইংরেজি জীবনী পড়িতে চাহিয়া-ছিলেন। আমার সহপাঠী ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদ সাহসে ভর করিয়া পিতৃদেবের নিকট হইতে সেই বইখানি চাহিতে গিয়া-ছিল। সে মনে করিয়াছিল সর্ব্বসাধারণের সঙ্গে সচরাচর যে প্রাকৃত বাংলায় কথা কহিয়া থাকি সেটা তাঁহার কাছে চলিবে না। সেই জন্য সাধু গৌড়ীয় ভাষায় এমন অনিন্দনীয় রীতিতে সে বাক্যবিন্যাস করিয়াছিল যে পিতা বুঝিলেন আমাদের বাংলাভাষা অগ্রসর হইতে হইতে শেষকালে নিজের বাংলাত্বকেই প্রায় ছাড়াইয়া যাইবার জো করিয়াছে। পরদিন

সকালে যখন যথানিয়মে দক্ষিণের বারান্দায় টেবিল পাতিয়া দেয়ালে কালো বোর্ড ঝুলাইয়া নীলকমল বাবুর কাছে পড়িতে বসিয়াছি এমন সময় পিতার তেতালার ঘরে আমাদের তিনজনের ডাক পড়িল। তিনি কহিলেন, আজ হইতে তোমাদের আর বাংলা পড়িবার দরকার নাই। খুসিতে আমাদের মন নাচিতে লাগিল।

তখনো নীচে বসিয়া আছেন আমাদের নীলকমল পণ্ডিত মহাশয়; বাংলা জ্যামিতির বইখানা তখনো খোলা এবং মেঘনাদবধ কাব্যখানা বোধ করি পুনরাবৃত্তির সংকল্প চলিতেছে। কিন্তু মৃত্যুকালে পরিপূর্ণ ঘরকন্নার বিচিত্র আয়োজন মানুষের কাছে যেমন মিথ্যা প্রতিভাত হয়, আমাদের কাছেও পণ্ডিতমহাশয় হইতে আরম্ভ করিয়া আর ঐ বোর্ড টাঙাইবার পেরেকটা পর্য্যন্ত তেমনি এক মুহূর্ত্তে মায়ামরীচিকার মতো শূন্য হইয়া গিয়াছে। কী রকম করিয়া যথোচিত গাম্ভীর্য্য রাখিয়া পণ্ডিত মহাশয়কে আমাদের নিষ্কৃতির খবরটা দিব সেই এক মুস্কিল হইল। সংযতভাবেই সংবাদটা জানাইলাম। দেয়ালে টাঙানো কালো বোর্ডের উপরে জ্যামিতির বিচিত্র রেখাগুলা আমাদের মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল—যে মেঘনাদবধের প্রত্যেক অক্ষরটিই আমাদের কাছে অমিত্র ছিল সে আজ এতই নিরীহভাবে টেবিলের উপর চিৎ হইয়া পড়িয়া রহিল যে তাহাকে আজ মিত্র বলিয়া কল্পনা করা অসম্ভব ছিল না।

বিদায় লইবার সময় পণ্ডিতমশায় কহিলেন—কর্ত্তব্যের

অনুরোধে তোমাদের প্রতি অনেক সময় অনেক কঠোর ব্যবহার করিয়াছি সেকথা মনে রাখিয়ো না। তোমাদের যাহা শিখাইয়াছি ভবিষ্যতে তাহার মূল্য বুঝিতে পারিবে।

মূল্য বুঝিতে পারিয়াছি। ছেলেবেলায় বাংলা পড়িতেছিলাম বলিয়াই সমস্ত মনটার চালনা সম্ভব হইয়াছিল। শিক্ষা জিনিষটা যথাসম্ভব আহার-ব্যাপারের" মতো হওয়া উচিত। খাদ্যদ্রব্যে প্রথম কামড়টা দিবামাত্রেই তাহার স্বাদের সুখ আরম্ভ হয়—পেট ভরিবার পূর্ব্ব হইতেই পেটটি খুসি হইয়া জাগিয়া উঠে—তাহাতে তাহার জারক রসগুলির আলস্য দূর হইয়া যায়। বাঙালির পক্ষে ইংরেজি শিক্ষায় এটি হইবার জো নাই। তাহার প্রথম কামড়েই দুইপাটি দাঁত আগাগোড়া নড়িয়া উঠে—মুখবিবরের মধ্যে একটা ছোটো-খাটো ভূমিকম্পের অবতারণা হয়। তার পরে সেটা যে লোষ্ট্রজাতীয় পদার্থ নহে, সেটা যে রসে পাক করা মোদক বস্তু তাহা বুঝিতে বুঝিতেই বয়স অর্দ্ধেক পার হইয়া যায়। বানানে ব্যাকরণে বিষম লাগিয়া নাক চোখ দিয়া যখন অজস্র জলধারা বহিয়া যাইতেছে অন্তরটা তখন একেবারেই উপবাসী হইয়া আছে। অবশেষে বহুকষ্টে অনেক দেরিতে খাবারের সঙ্গে যখন পরিচয় ঘটে তখন ক্ষুধাটাই যায় মরিয়া। প্রথম হইতেই মনটাকে চালনা করিবার সুযোগ না পাইলে মনের চলৎ-শক্তিতেই মন্দা পড়িয়া যায়। যখন চারিদিকে খুব কষিয়া ইংরেজি পড়াইবার ধুম পড়িয়া গিয়াছে তখন যিনি সাহস করিয়া আমাদিগকে দীর্ঘকাল বাংলা শিখাইবার ব্যবস্থা

করিয়াছিলেন সেই আমার স্বর্গগত মেজদাদার উদ্দেশে সকৃতজ্ঞ প্রণাম নিবেদন করিতেছি।

নর্ম্মাল স্কুল ত্যাগ করিয়া আমরা বেঙ্গল একাডেমি নামক এক ফিরিঙ্গি স্কুলে ভর্ত্তি হইলাম। ইহাতে আমাদের গৌরব কিছু বাড়িল। মনে হইল আমরা অনেকখানি বড়ো হইয়াছি—অন্তত স্বাধীনতার প্রথম তলাটাতে উঠিয়াছি। বস্তুত এ বিদ্যালয়ে আমরা যেটুকু অগ্রসর হইয়াছিলাম সে কেবলমাত্র ঐ স্বাধীনতার দিকে। সেখানে কী যে পড়িতেছি তাহা কিছুই বুঝিতাম না, পড়াশুনা করিবার কোনো চেষ্টাই করিতাম না, না করিলেও বিশেষ কেহ লক্ষ্য করিত না। এখানকার ছেলেরা ছিল দুর্ব্বৃত্ত, কিন্তু ঘৃণ্য ছিল না, সেইটে অনুভব করিয়া খুব আরাম পাইয়াছিলাম। তাহারা হাতের তেলোয় উল্টা করিয়া ass লিখিয়া "হেলো" বলিয়া যেন আদর করিয়া পিঠে চাপড় মারিত, তাহাতে জনসমাজে অবজ্ঞাভাজন উক্ত চতুষ্পদের নামাক্ষরটি পিঠের কাপড়ে অঙ্কিত হইয়া যাইত; হয়তো বা হঠাৎ চলিতে চলিতে মাথার উপরে খানিকটা কলা থেঁতলাইয়া দিয়া কোথায় অন্তর্হিত হইত ঠিকানা পাওয়া যাইত না; কখনো বা ধাঁ করিয়া মারিয়া অত্যন্ত নিরীহ ভালোমানুষটির মতো অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া থাকিত, দেখিয়া পরম সাধু বলিয়া ভ্রম হইত। এ সকল উৎপীড়ন গায়েই লাগে মনে ছাপ দেয় না,—এ সমস্তই উৎপাৎমাত্র, অপমান নহে! তাই আমার মনে হইল এ যেন পাঁকের থেকে উঠিয়া পাথরে পা দিলাম—তাহাতে পা কাটিয়া

যায় সেও ভালো, কিন্তু মলিনতা হইতে রক্ষা পাওয়া গেল। এই বিদ্যালয়ে আমার মতো ছেলের মস্ত সুবিধা এই ছিল যে লেখাপড়া করিয়া উন্নতি লাভ করিব সেই অসম্ভব দুরাশা আমাদের সম্বন্ধে কাহারো মনে ছিল না। ছোটো স্কুল, আয় অল্প, স্কুলের অধ্যক্ষ আমাদের একটি সদ্‌গুণে মুগ্ধ ছিলেন—আমরা মাসে মাসে নিয়মিত বেতন চুকাইয়া দিতাম। এইজন্য ল্যাটিন ব্যাকরণ আমাদের পক্ষে দুঃসহ হইয়া উঠে নাই এবং পাঠচর্চ্চার গুরুতর ত্রুটিতেও আমাদের পৃষ্ঠদেশ অনাহত ছিল। বোধ করি বিদ্যালয়ের যিনি অধ্যক্ষ ছিলেন তিনি এ সম্বন্ধে শিক্ষকদিগকে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন—আমাদের প্রতি মমতাই তাহার কারণ নহে।

এই ইস্কুলে উৎপাত কিছুই ছিল না, তবু হাজার হইলেও ইহা ইস্কুল। ইহার ঘরগুলা নির্ম্মম, ইহার দেওয়ালগুলা পাহারাওয়ালার মতো,—ইহার মধ্যে বাড়ির ভাব কিছুই নাই—ইহা খোপওয়ালা একটা বড়ো বাক্স। কোথাও কোনও সজ্জা নাই, ছবি নাই, রঙ নাই, ছেলেদের হৃদয়কে আকর্ষণ করিবার লেশমাত্র চেষ্টা নাই। ছেলেদের যে ভালো মন্দ লাগা বলিয়া একটা খুব মস্ত জিনিষ আছে বিদ্যালয় হইতে সেই চিন্তা একেবারে নিঃশেষে নির্ব্বাসিত। সেইজন্য বিদ্যালয়ের দেউড়ি পার হইয়া তাহার সঙ্কীর্ণ আঙিনার মধ্যে পা দিবামাত্র তৎক্ষণাৎ সমস্ত মন বিমর্ষ হইয়া যাইত—অতএব ইস্কুলের সঙ্গে আমার সেই পলাইবার সম্পর্ক আর ঘুচিল না।

পলায়নের একটি সহায় পাইয়াছিলাম। দাদারা এক-

জনের কাছে পার্সি পড়িতেন—তাঁহাকে সকলে মুন্সী বলিত—নামটা কী ভুলিয়াছি। লোকটি প্রৌঢ়—অস্থিচর্ম্মসার। তাঁহার কঙ্কালটাকে যেন একখানা কালো মোমজামা দিয়া মুড়িরা দেওয়া হইয়াছে: তাহাতে রস নাই, চর্ব্বি নাই। পার্সি হয় তো তিনি ভালই জানিতেন, এবং ইংরেজি তাঁর চলনসই রকম জানা ছিল, কিন্তু সে ক্ষেত্রে যশোলাভ করিবার চেষ্টা তাঁহার কিছুমাত্র ছিল না। তাঁহার বিশ্বাস ছিল লাঠি খেলায় তাঁহার যেমন আশ্চর্য্য নৈপুণ্য, সঙ্গীতবিদ্যায় সেইরূপ অসামান্য পারদর্শিতা। আমাদের উঠানে রৌদ্রে দাঁড়াইয়া তিনি নানা অদ্ভুত ভঙ্গীতে লাঠি খেলিতেন—নিজের ছায়া ছিল তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী। বলা বাহুল্য তাঁহার ছায়া কোনো দিন তাঁহার সঙ্গে জিতিতে পারিত না—এবং হুহুঙ্কারে তাহার উপরে বাড়ি মারিয়া যখন তিনি জয়গর্ব্বে ঈষৎ হাস্য করিতেন তখন ম্লান হইয়া তাঁহার পায়ের কাছে নীরবে পড়িয়া থাকিত। তাঁহার নাকী বেসুরের গান প্রেতলোকের রাগিণীর মতো শুনাইত—তাহা প্রলাপে বিলাপে মিশ্রিত একটা বিভীষিকা ছিল। আমাদের গায়ক বিষ্ণু মাঝে মাঝে তাঁহাকে বলিতেন, মুন্সীজি, আপনি আমার রুটি মারিলেন।—কোনো উত্তর না দিয়া তিনি অত্যন্ত অবজ্ঞা করিয়া হাসিতেন।

ইহা হইতে বুঝিতে পারিবেন মুন্সীকে খুসি করা শক্ত ছিল না। আমরা তাঁহাকে ধরিলেই তিনি আমাদের ছুটির প্রয়োজন জানাইয়া স্কুলের অধ্যক্ষের নিকট পত্র লিখিয়া দিতেন। বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ এরূপ পত্র লইয়া অধিক বিচার

বিতর্ক করিতেন না—কারণ তাঁহার নিশ্চয় জানা ছিল যে আমরা ইস্কুলে যাই বা না যাই তাহাতে বিদ্যাশিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের কিছুমাত্র ইতরবিশেষ ঘটিবে না।

এখন আমার নিজের একটি স্কুল আছে এবং সেখানে ছাত্রেরা নানাপ্রকার অপরাধ করিয়া থাকে—কারণ, অপরাধ করা ছাত্রদের, এবং ক্ষমা না করা শিক্ষকদের ধর্ম্ম। যদি আমাদের কেহ তাহাদের ব্যবহারে ক্রুদ্ধ ও ভীত হইয়া বিদ্যালয়ের অমঙ্গল আশঙ্কায় অসহিষ্ণু হন ও তাহাদিগকে সদাই কঠিন শাস্তি দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠেন, তখন আমার নিজের ছাত্র অবস্থার সমস্ত পাপ সারি সারি দাঁড়াইয়া আমার মুখের দিকে তাকাইয়া হাসিতে থাকে।

আমি বেশ বুঝিতে পারি, ছেলেদের অপরাধকে আমরা বড়োদের মাপ-কাঠিতে মাপিয়া থাকি, ভুলিয়া যাই যে, ছোট ছেলেরা নির্ঝরের মতো বেগে চলে ;—সে জলে দোষ যদি স্পর্শ করে তবে হতাশ হইবার কারণ নাই, কেন না সচলতার মধ্যে সকল দোষের সহজ প্রতিকার আছে ; বেগ যেখানে থামিয়াছে সেইখানেই বিপদ,—সেইখানেই সাবধান হওয়া চাই। এইজন্য শিক্ষকদের অপরাধকে যত ভয় করিতে হয় ছাত্রদের তত নহে।

জাত বাঁচাইবার জন্য বাঙালি ছাত্রদের একটি স্বতন্ত্র জলখাবারের ঘর ছিল। এই ঘরে দুই একটি ছাত্রের সঙ্গে আমাদের আলাপ হইল। তাহাদের সকলেই আমাদের চেয়ে বয়সে অনেক বড়ো। তাহাদের মধ্যে একজন কাফি

স্তম্ভিত হইয়া যাইতাম—পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য আমার এত ঔৎসুক্য জন্মিত যে আমাকে অধীর করিয়া তুলিত। কিন্তু দ্রব্যগুলি প্রায়ই এমন দুর্লভ ছিল যে সিন্ধুবাদ নাবিকের অনুসরণ না করিলে তাহা পাইবার কোনো উপায় ছিল না। একবার নিশ্চয়ই অসতর্কতাবশত প্রোফেসর কোনো একটি অসাধ্যসাধনের অপেক্ষাকৃত সহজ পন্থা বলিয়া ফেলাতে আমি সেটাকে পরীক্ষা করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলাম। মনসা-সিজের আঠা একুশবার বীজের গায়ে মাখাইয়া শুকাইয়া লইলেই যে সে-বীজ হইতে এক ঘণ্টার মধ্যেই গাছ বাহির হইয়া ফল ধরিতে পারে একথা কে জানিত। কিন্তু যে প্রোফেসর ছাপার বই বাহির করিয়াছে তাহার কথা একেবারে অবিশ্বাস করিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না।

আমরা আমাদের বাগানের মালীকে দিয়া কিছুদিন ধরিয়া যথেষ্ট পরিমাণে মনসাসিজের আঠা সংগ্রহ করিলাম এবং একটা আমের আঁটির উপর পরীক্ষা করিবার জন্য রবিবার ছুটির দিনে আমাদের নিভৃত রহস্য-নিকেতনে তেতালার ছাদে গিয়া উপস্থিত হইলাম।

আমি তো একমনে আঁটিতে আঠা লাগাইয়া কেবলই রৌদ্রে শুকাইতে লাগিলাম—তাহাতে যে কিরূপ ফল ধরিয়াছিল নিশ্চয়ই জানি বয়স্ক পাঠকেরা সে সম্বন্ধে কোনো প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিবেন না। কিন্তু সত্য তেতালার কোন্ একটা কোণে এক ঘণ্টার মধ্যেই ডালপালাসমেত একটা অদ্ভুত মায়াতরু যে জাগাইয়া তুলিয়াছে আমি তাহার

কোনো খবরই জানিতাম না। তাহার ফলও বড়ো বিচিত্র হইল।

এই ঘটনার পর হইতে প্রোফেসর যে আমার সংস্রব সসঙ্কোচে পরিহার করিয়া চলিতেছে তাহা আমি অনেকদিন লক্ষ্যই করি নাই। গাড়িতে সে আমার পাশে আর বসে না, সর্ব্বত্রই সে আমার নিকট হইতে কিছু যেন দূরে দূরে চলে।

একদিন হঠাৎ আমাদের পড়িবার ঘরে মধ্যাহ্নে সে প্রস্তাব করিল, এসো, এই বেঞ্চের উপর হইতে লাফাইয়া দেখা যাক্ কাহার কিরূপ লাফাইবার প্রণালী। আমি ভাবিলাম সৃষ্টির অনেক রহস্যই প্রোফেসরের বিদিত, বোধ করি লাফানো সম্বন্ধেও কোনো একটা গূঢ়তত্ত্ব তাহার জানা আছে। সকলেই লাফাইল আমিও লাফাইলাম। প্রোফেসর একটি অন্তররুদ্ধ অব্যক্ত হুঁ বলিয়া গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িল। অনেক অনুনয়েও তাহার কাছ হইতে ইহা অপেক্ষা স্ফুটতর কোনো বাণী বাহির করা গেল না।

একদিন যাদুকর বলিল, কোনো সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলেরা তোমাদের সঙ্গে আলাপ করিতে চায় একবার তাহাদের বাড়ি যাইতে হইবে। অভিভাবকেরা আপত্তির কারণ কিছুই দেখিলেন না, আমরাও সেখানে গেলাম।

কৌতূহলীর দলে ঘর ভর্ত্তি হইয়া গেল। সকলেই আমার গান শুনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিল। আমি দুই একটা গান গাহিলাম। তখন আমার বয়স অল্প, কণ্ঠস্বরও সিংহ-

গর্জ্জনের মতো সুগম্ভীর ছিল না। অনেকেই মাথা নাড়িয়া বলিল—তাইতো, ভারি গলা।

তাহার পরে যখন খাইতে গেলাম তখনো সকলে ঘিরিয়া বসিয়া আহার-প্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। তৎপূর্ব্বে বাহিরের লোকের সঙ্গে নিতান্ত অল্পই মিশিয়াছি, সুতরাং স্বভাবটা সলজ্জ ছিল। তাহা ছাড়া পূর্ব্বেই জানাইয়াছি আমাদের ঈশ্বর চাকরের লোলুপ দৃষ্টির সম্মুখে খাইতে খাইতে অল্প খাওয়াই আমার চিরকালের মতো অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে। সেদিন আমার আহারে সঙ্কোচ দেখিয়া দর্শকেরা সকলেই বিস্ময় প্রকাশ করিল। যেরূপ সূক্ষ্ম-দৃষ্টিতে সেদিন সকলে নিমন্ত্রিত বালকের কার্য্যকলাপ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল তাহা যদি স্থায়ী এবং ব্যাপক হইত তাহা হইলে বাংলা দেশে প্রাণিবিজ্ঞানের অসাধারণ উন্নতি হইতে পারিত।

ইহার অনতিকাল পরে পঞ্চমাঙ্কে যাদুকরের নিকট হইতে দুই একখানা অদ্ভুত পত্র পাইয়া সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিতে পারিলাম। ইহার পরে যবনিকা পতন।

সত্যর কাছে শোনা গেল একদিন আমের আঁটির মধ্যে যাদুপ্রয়োগ করিবার সময় সে প্রোফেসরকে বুঝাইয়া দিয়াছিল যে বিদ্যা শিক্ষার সুবিধার জন্য আমার অভিভাবকেরা আমাকে বালকবেশে বিদ্যালয়ে পাঠাইতেছিলেন কিন্তু ওটা আমার ছদ্মবেশ। যাঁহারা স্বকপোলকল্পিত বৈজ্ঞানিক আলোচনায় কৌতূহলী তাঁহাদিগকে একথা বলিয়া রাখা

উচিত, লাফানোর পরীক্ষায় আমি বাঁ পা আগে বাড়াইয়াছিলাম—সেই পদক্ষেপটা যে আমার কত বড়ো ভুল হইয়াছিল তাহা জানিতেই পারি নাই।

পিতৃদেব

আমার জন্মের কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতেই আমার পিতা প্রায় দেশভ্রমণেই নিযুক্ত ছিলেন। বাল্যকালে তিনি আমার কাছে অপরিচিত ছিলেন বলিলেই হয়। মাঝে মাঝে তিনি কখনো হঠাৎ বাড়ি আসিতেন; সঙ্গে বিদেশী চাকর লইয়া আসিতেন, তাহাদের সঙ্গে ভাব করিয়া লইবার জন্য আমার মনে ভারি ঔৎসুক্য হইত। একবার লেনু বলিয়া অল্পবয়স্ক একটি পাঞ্জাবী চাকর তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিল। সে আমাদের কাছে যে সমাদরটা পাইয়াছিল তাহা স্বয়ং রণজিত সিংহের পক্ষেও কম হইত না। সে একে বিদেশী তাহাতে পাঞ্জাবী—ইহাতেই আমাদের মন হরণ করিয়া লইয়াছিল। পুরাণে ভীমার্জ্জুনের প্রতি যে রকম শ্রদ্ধা ছিল, এই পাঞ্জাবী জাতের প্রতিও মনে সেই প্রকারের একটা সম্ভ্রম ছিল। ইহারা যোদ্ধা—ইহারা কোনো কোনো লড়াইয়ে হারিয়াছে বটে কিন্তু সেটাকেও

ইহাদের শত্রুপক্ষেরই অপরাধ বলিয়া গণ্য করিয়াছি। সেই জাতের লেন্নুকে ঘরের মধ্যে পাইয়া মনে খুব একটা স্ফীতি অনুভব করিয়াছিলাম। বৌঠাকুরাণীর ঘরে একটা কাচা-বরণে ঢাকা খেলার জাহাজ ছিল, তাহাতে দম দিলেই রং-করা কাপড়ের ঢেউ ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিত এবং জাহাজটা আর্গিন বাদ্যের সঙ্গে দুলিতে থাকিত। অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া এই আশ্চর্য্য সামগ্রীটি বৌঠাকুরাণীর কাছ হইতে চাহিয়া লইয়া প্রায় মাঝে মাঝে এই পাঞ্জাবীকে চমৎকৃত করিয়া দিতাম। ঘরের খাঁচায় বদ্ধ ছিলাম বলিয়া যাহা কিছু বিদেশের যাহা কিছু দূরদেশের তাহাই আমার মনকে অত্যন্ত টানিয়া লইত। তাই লেন্নুকে লইয়া ভারি ব্যস্ত হইয়া পড়িতাম। এই কারণেই গাব্রিয়েল বলিয়া একটি য়িহুদি তাহার ঘুন্টি দেওয়া য়িহুদি পোষাক পরিয়া যখন আতর বেচিতে আসিত আমার মনে ভারি একটা নাড়া দিত, এবং ঝোলাঝুলিওয়ালা ঢিলাঢালা ময়লা পায়জামাপরা বিপুলকায় কাবুলিওয়ালাও আমার পক্ষে ভীতিমিশ্রিত রহস্যের সামগ্রী ছিল।

যাহা হউক, পিতা যখন আসিতেন আমরা কেবল আশপাশ হইতে দূরে তাঁহার চাকরবাকরদের মহলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কৌতূহল মিটাইতাম। তাঁহার কাছে পৌঁছানো ঘটিয়া উঠিত না।

বেশ মনে আছে আমাদের ছেলেবেলার কোনো এক সময়ে ইংরেজ গবর্মেণ্টের চিরন্তন জুজু রাশিয়ান কর্ত্তৃক ভারত-

আক্রমণের আশঙ্কা লোকের মুখে আলোচিত হইতেছিল। কোনো হিতৈষিণী আত্মীয়া আমার মায়ের কাছে সেই আসন্ন বিপ্লবের সম্ভাবনাকে মনের সাধে পল্লবিত করিয়া বলিয়া-ছিলেন। পিতা তখন পাহাড়ে ছিলেন। তিব্বত ভেদ করিয়া হিমালয়ের কোন্ একটা ছিদ্রপথ দিয়া যে রুশিয়েরা ধূমকেতুর মতো প্রকাশ পাইবে তাহা তো বলা যায় না। এই জন্য মা'র মনে অত্যন্ত উদ্বেগ উপস্থিত হইয়াছিল। বাড়ির লোকেরা নিশ্চয়ই কেহ তাঁহার এই উৎকণ্ঠার সমর্থন করেন নাই। মা সেই কারণে পরিণতবয়স্ক দলের সহায়তালাভের চেষ্টায় হতাশ হইয়া শেষকালে এই বালককে আশ্রয় করিলেন। আমাকে বলিলেন—"রাশিয়ানদের খবর দিয়া কর্তাকে এক-খানা চিঠি লেখ তো! মাতার উদ্বেগ বহন করিয়া পিতার কাছে সেই আমার প্রথম চিঠি। কেমন করিয়া পাঠ লিখিতে হয়, কী করিতে হয় কিছুই জানি না। দফ্তরখানায় মহানন্দ মুন্সীর শরণাপন্ন হইলাম। পাঠ যথাবিহিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু ভাষাটাতে জমিদারী সেরেস্তার সরস্বতী যে জীর্ণ কাগজের শুষ্ক পদ্মদলে বিহার করেন তাহারই গন্ধ মাখানো ছিল। এই চিঠির উত্তর পাইয়াছিলাম। তাহাতে পিতা লিখিয়াছিলেন—ভয় করিবার কোনো কারণ নাই, রাশিয়ানকে তিনি স্বয়ং তাড়াইয়া দিবেন। এই প্রবল আশ্বাসবাণীতেও মাতার রাশিয়ানভীতি দূর হইল বলিয়া বোধ হইল না—কিন্তু পিতার সম্বন্ধে আমার সাহস খুব বাড়িয়া উঠিল। তাহার পর হইতে রোজই আমি তাঁহাকে পত্র

লিখিবার জন্য মহানন্দের দফ্‌তরে হাজির হইতে লাগিলাম। বালকের উপদ্রবে অস্থির হইয়া কয়েক দিন মহানন্দ খসড়া করিয়া দিল। কিন্তু মাশুলের সঙ্গতি তো নাই। মনে ধারণা ছিল মহানন্দের হাতে চিঠি সমর্পণ করিয়া দিলেই বাকি দায়িত্বের কথা আমাকে আর চিন্তা করিতেই হইবে না—চিঠি অনায়াসেই যথাস্থানে গিয়া পোঁছিবে। বলা বাহুল্য মহানন্দের বয়স আমার চেয়ে অনেক বেশি ছিল এবং এ চিঠিগুলি হিমাচলের শিখর পর্য্যন্ত পোঁছে নাই।

বহুকাল প্রবাসে থাকিয়া পিতা অল্প কয়েক দিনের জন্য যখন কলিকাতায় আসিতেন, তখন তাঁহার প্রভাবে যেন সমস্ত বাড়ি ভরিয়া উঠিয়া গম্‌ গম্‌ করিতে থাকিত। দেখিতাম গুরুজনেরা গায়ে জোব্বা পরিয়া, সংযত পরিচ্ছন্ন হইয়া, মুখে পান থাকিলে তাহা বাহিরে ফেলিয়া দিয়া তাঁহার কাছে যাইতেন। সকলেই সাবধান হইয়া চলিতেন। রন্ধনের পাছে কোনো ত্রুটি হয় এই জন্য মা নিজে রান্নাঘরে গিয়া বসিয়া থাকিতেন। বৃদ্ধ কিনু হরকরা তাহার তকমাওয়ালা পাগড়ি ও শুভ্র চাপকান পরিয়া দ্বারে হাজির থাকিত। পাছে বারান্দায় গোলমাল দৌড়াদৌড়ি করিয়া তাঁহার বিরাম ভঙ্গ করি এজন্য পূর্ব্বেই আমাদিগকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আমরা ধীরে ধীরে চলি, ধীরে ধীরে বলি, উঁকি মারিতে আমাদের সাহস হয় না।

একবার পিতা আসিলেন আমাদের তিন জনের উপনয়ন দিবার জন্য। বেদান্তবাগীশকে লইয়া তিনি বৈদিক মন্ত্র হইতে

উপনয়নের অনুষ্ঠান নিজে সংকলন করিয়া লইলেন। অনেক দিন ধরিয়া দালানে বেচারাম বাবু প্রত্যহ আমাদিগকে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মগ্রন্থে সংগৃহীত উপনিষদের মন্ত্রগুলি বিশুদ্ধ-রীতিতে বারম্বার আবৃত্তি করাইয়া লইলেন। যথাসম্ভব প্রাচীন বৈদিক পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া আমাদের উপনয়ন হইল। মাথা মুড়াইয়া বীরবৌলি পরিয়া আমরা তিন বটু তেতালার ঘরে তিন দিনের জন্য আবদ্ধ হইলাম। সে আমাদের ভারি মজা লাগিল। পরস্পরের কানের কুণ্ডল ধরিয়া আমরা টানাটানি বাধাইয়া দিলাম। একটা বাঁয়া ঘরের কোণে পড়িয়াছিল—বারান্দায় দাঁড়াইয়া যখন দেখিতাম নীচের তলা দিয়া কোনো চাকর চলিয়া যাইতেছে ধপাধপ শব্দে আওয়াজ করিতে থাকিতাম—তাহারা উপরে মুখ তুলিয়াই আমাদিগকে দেখিতে পাইয়া তৎক্ষণাৎ মাথা নীচু করিয়া অপরাধ-আশঙ্কায় ছুটিয়া পলাইয়া যাইত। বস্তুত গুরুগৃহে ঋষিবালকদের যে-ভাবে কঠোর সংযমে দিন কাটিবার কথা আমাদের ঠিক সে-ভাবে কাটে নাই। আমার বিশ্বাস, সাবেক কালের তপোবন অন্বেষণ করিলে আমাদের মতো ছেলে যে মিলিত না তাহা নহে; তাহারা খুব যে বেশি ভালোমানুষ ছিল তাহার প্রমাণ নাই। শারদ্বত ও শার্ঙ্গরবের বয়স যখন দশ বারো ছিল তখন তাঁহারা কেবলি বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া অগ্নিতে আহুতিদান করিয়াই দিন কাটাইয়াছেন এ কথা যদি কোনো পুরাণে লেখে তবে তাহা আগাগোড়াই আমরা বিশ্বাস করিতে বাধ্য নই—কারণ শিশুচরিত্র

নামক পুরাণটি সকল পুরাণের অপেক্ষা পুরাতন। তাহার মতো প্রামাণিক শাস্ত্র কোনো ভাষায় লিখিত হয় নাই।

নূতন ব্রাহ্মণ হওয়ার পরে গায়ত্রী মন্ত্রটা জপ করার দিকে খুব একটা ঝোঁক পড়িল। আমি বিশেষ যত্নে এক মনে ঐ মন্ত্র জপ করিবার চেষ্টা করিতাম। মন্ত্রটা এমন নহে যে সে বয়সে উহার তাৎপর্য্য আমি ঠিকভাবে গ্রহণ করিতে পারি। আমার বেশ মনে আছে আমি "ভূর্ভুবঃস্বঃ" এই অংশকে অবলম্বন করিয়া মনটাকে খুব করিয়া প্রসারিত করিতে চেষ্টা করিতাম। কী বুঝিতাম কী ভাবিতাম তাহা স্পষ্ট করিয়া বলা কঠিন, কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে, কথার মানে বোঝাটাই মানুষের পক্ষে সকলের চেয়ে বড়ো জিনিষ নয়। শিক্ষার সকলের চেয়ে বড়ো অঙ্গটা—বুঝাইয়া দেওয়া নহে,—মনের মধ্যে ঘা দেওয়া। সেই আঘাতে ভিতরে যে জিনিষটা বাজিয়া উঠে যদি কোনো বালককে তাহা ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে বলা হয় তবে সে যাহা বলিবে সেটা নিতান্ত একটা ছেলেমানুষী কিছু। কিন্তু যাহা সে মুখে বলিতে পারে তাহার চেয়ে তাহার মনের মধ্যে বাজে অনেক বেশি; যাঁহারা বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা করিয়া কেবল পরীক্ষার দ্বারাই সকল ফল নির্ণয় করিতে চান তাঁহারা এই জিনিষটার কোনো খবর রাখেন না। আমার মনে পড়ে ছেলেবেলায় আমি অনেক জিনিষ বুঝি নাই কিন্তু তাহা আমার অন্তরের মধ্যে খুব একটা নাড়া দিয়াছে। আমার নিতান্ত শিশুকালে মুলাজোড়ে গঙ্গার ধারের বাগানে মেঘোদয়ে বড়োদাদা

ছাদের উপরে একদিন মেঘদূত আওড়াইতেছিলেন, তাহা আমার বুঝিবার দরকার হয় নাই এবং বুঝিবার উপায় ছিল না—তাঁহার আনন্দআবেগপূর্ণ ছন্দ-উচ্চারণই আমার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। ছেলেবেলায় যখন ইংরেজি আমি প্রায় কিছু জানিতাম না তখন প্রচুরছবিওয়ালা একখানি Old Curiosity Shop লইয়া আগাগোড়া পড়িয়াছিলাম। পনেরো আনা কথাই বুঝিতে পারি নাই—নিতান্ত আবছায়া গোছের কী একটা মনের মধ্যে তৈরি করিয়া সেই আপন মনের নানা রঙের ছিন্ন সূত্রে গ্রন্থি বাঁধিয়া তাহাতেই ছবিগুলা গাঁথিয়াছিলাম—পরীক্ষকের হাতে যদি পড়িতাম তবে মস্ত একটা শূন্য পাইতাম সন্দেহ নাই—কিন্তু আমার পক্ষে সে পড়া ততবড়ো শূন্য হয় নাই। একবার বাল্যকালে পিতার সঙ্গে গঙ্গায় বোটে বেড়াইবার সময় তাঁহার বইগুলির মধ্যে একখানি অতি পুরাতন ফোর্ট্ উইলিয়মের প্রকাশিত গীতগোবিন্দ পাইয়াছিলাম। বাংলা অক্ষরে ছাপা; ছন্দ অনুসারে তাহার পদের ভাগ ছিল না; গদ্যের মতো এক লাইনের সঙ্গে আর এক লাইন অবিচ্ছেদে জড়িত। আমি তখন সংস্কৃত কিছুই জানিতাম না। বাংলা ভালো জানিতাম বলিয়া অনেকগুলি শব্দের অর্থ বুঝিতে পারিতাম। সেই গীতগোবিন্দখানা যে কতবার পড়িয়াছি তাহা বলিতে পারি না। জয়দেব যাহা বলিতে চাহিয়াছেন তাহা কিছুই বুঝি নাই, কিন্তু ছন্দে ও কথায় মিলিয়া আমার মনের মধ্যে যে জিনিষটা গাঁথা হইতেছিল তাহা আমার পক্ষে সামান্য নহে।

আমার মনে আছে "নিভৃত নিকুঞ্জগৃহংগত যা নিশি রহসি নিলীয় বসন্তং" এই লাইনটি আমার মনে ভারি একটি সৌন্দর্য্যের উদ্রেক করিত—ছন্দের ঝঙ্কারের মুখে "নিভৃত নিকুঞ্জগৃহং" এই একটিমাত্র কথাই আমার পক্ষে প্রচুর ছিল। গদ্যরীতিতে সেই বইখানি ছাপানো ছিল বলিয়া জয়দেবের বিচিত্র ছন্দকে নিজের চেষ্টায় আবিষ্কার করিয়া লইতে হইত —সেইটেই আমার বড়ো আনন্দের কাজ ছিল। যেদিন আমি—অহহ কলয়ামি বলয়াদিমণিভূষণং হরিবিরহ-দহনবহনেন বহুদূষণং—এই পদটি ঠিকমত যদি রাখিয়া পড়িতে পারিলাম সেদিন কতই খুসি হইয়াছিলাম! জয়দেব সম্পূর্ণ তো বুঝি নাই, অসম্পূর্ণ বোঝা বলিলে যাহা বোঝায় তাহাও নহে, তবু সৌন্দর্য্যে আমার মন এমন ভরিয়া উঠিয়াছিল যে আগাগোড়া সমস্ত গীতগোবিন্দ একখানি খাতায় নকল করিয়া লইয়াছিলাম। আরো একটু বড়ো বয়সে কুমারসম্ভবের—

মন্দাকিনীনির্ঝরশীকরাণাং
বোঢ়া মুহুঃ কম্পিত দেবদারুঃ
যদ্বায়ুরন্বিষ্টমৃগৈঃ কিরাতৈ
রাসেব্যতে ভিন্ন শিখণ্ডিবর্হঃ—

এই শ্লোকটি পড়িয়া একদিন মনের ভিতরটা ভারি মাতিয়া উঠিয়াছিল। আর কিছুই বুঝি নাই—কেবল "মন্দাকিনীনির্ঝর-শীকর" এবং "কম্পিতদেবদারু" এই দুইটি কথাই আমার মন ভুলাইয়াছিল। সমস্ত শ্লোকটির রস ভোগ করিবার জন্য মন

ব্যাকুল হইয়া উঠিল। যখন পণ্ডিত মহাশয় সবটার মানে বুঝাইয়া দিলেন তখন মন খারাপ হইয়া গেল। মৃগঅন্বেষণ-তৎপর কিরাতের মাথায় যে ময়ূরপুচ্ছ আছে বাতাস তাহাকেই চিরিয়া চিরিয়া ভাগ করিতেছে এই সূক্ষ্মতায় আমাকে বড়োই পীড়া দিতে লাগিল। যখন সম্পূর্ণ বুঝি নাই তখন বেশ ছিলাম।

নিজের বাল্যকালের কথা যিনি ভালো করিয়া স্মরণ করিবেন তিনিই ইহা বুঝিবেন যে আগাগোড়া সমস্তই সুস্পষ্ট বুঝিতে পারাই সকলের চেয়ে পরম লাভ নহে। আমাদের দেশের কথকেরা এই তত্ত্বটি জানিতেন—সেইজন্য কথকতার মধ্যে এমন অনেক বড়ো বড়ো কান-ভরাটকরা সংস্কৃত শব্দ থাকে এবং তাহার মধ্যে এমন তত্ত্বকথাও অনেক নিবিষ্ট হয় যাহা শ্রোতারা কখনই সুস্পষ্ট বোঝে না কিন্তু আভাসে পায়—এই আভাসে পাওয়ার মূল্য অল্প নহে। যাঁহারা শিক্ষার হিসাবে জমাখরচ খতাইয়া বিচার করেন, তাঁহারাই অত্যন্ত কষাকষি করিয়া দেখেন যাহা দেওয়া গেল তাহা বুঝা গেল কি না। বালকেরা, এবং যাহারা অত্যন্ত শিক্ষিত নহে তাহারা জ্ঞানের যে প্রথম স্বর্গলোকে বাস করে সেখানে মানুষ না বুঝিয়াই পায়—সেই স্বর্গ হইতে যখন পতন হয় তখন বুঝিয়া পাইবার দুঃখের দিন আসে। কিন্তু একথাও সম্পূর্ণ সত্য নহে। জগতে, না বুঝিয়া পাইবার রাস্তাই সকল সময়েই সকলের চেয়ে বড়ো রাস্তা। সেই রাস্তা একেবারে বন্ধ হইয়া গেলে সংসারের পাড়ায় হাটবাজার

বন্ধ হয় না বটে কিন্তু সমুদ্রের ধারে যাইবার উপায় আর থাকে না, পর্ব্বতের শিখরে চড়াও অসম্ভব হইয়া উঠে।

তাই বলিতেছিলাম, গায়ত্রীমন্ত্রের কোনো তাৎপর্য্য আমি সে বয়সে যে বুঝিতাম তাহা নহে কিন্তু মানুষের অন্তরের মধ্যে এমন কিছু একটা আছে সম্পূর্ণ না বুঝিলেও যাহার চলে। তাই আমার একদিনের কথা মনে পড়ে—আমাদের পড়িবার ঘরে শানবাঁধান মেজের এক কোণে বসিয়া গায়ত্রী জপ করিতে করিতে সহসা আমার দুই চোখ ভরিয়া কেবলি জল পড়িতে লাগিল। জল কেন পড়িতেছে তাহা আমি নিজে কিছুমাত্রই বুঝিতে পারিলাম না। অতএব কঠিন পরীক্ষকের হাতে পড়িলে আমি মূঢ়ের মতো এমন কোনো একটা কারণ বলিতাম গায়ত্রীমন্ত্রের সঙ্গে যাহার কোনোই যোগ নাই। আসল কথা, অন্তরের অন্তঃপুরে যে কাজ চলিতেছে বুদ্ধির ক্ষেত্রে সকল সময়ে তাহার খবর আসিয়া পৌঁছায় না।

হিমালয় যাত্রা

পৈতা উপলক্ষ্যে মাথা মুড়াইয়া ভয়ানক ভাবনা হইল ইস্কুল যাইব কী করিয়া। গোজাতির প্রতি ফিরিঙ্গি ছেলের আন্তরিক আকর্ষণ যেমনি থাক্ ব্রাহ্মণের প্রতি তো তাহাদের ভক্তি নাই। অতএব নেড়ামাথার উপরে তাহারা আর কোনো জিনিষ বর্ষণ যদি নাও করে তবে হাস্যবর্ষণ তো করিবেই।

এমন দুশ্চিন্তার সময়ে একদিন তেতালার ঘরে ডাক পড়িল। পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন আমি তাঁহার সঙ্গে হিমালয়ে যাইতে চাই কি না। "চাই" এই কথাটা যদি চীৎকার করিয়া আকাশ ফাটাইয়া বলিতে পারিতাম তবে মনের ভাবের উপযুক্ত উত্তর হইত। কোথায় বেঙ্গল একাডেমি আর কোথায় হিমালয়!

বাড়ি হইতে যাত্রা করিবার সময় পিতা তাঁহার চিররীতি-অনুসারে বাড়ির সকলকে দালানে লইয়া উপাসনা করিলেন। গুরুজনদিগকে প্রণাম করিয়া পিতার সঙ্গে গাড়িতে চড়িলাম। আমার বয়সে এই প্রথম আমার জন্য পোষাক তৈরি হইয়াছে। কী রঙের কিরূপ কাপড় হইবে তাহা পিতা স্বয়ং আদেশ করিয়া দিয়াছিলেন। মাথার জন্য একটা জরির-কাজ-করা গোল মক্‌মলের টুপি হইয়াছিল। সেটা আমার

হাতে ছিল, কারণ নেড়ামাথার উপর টুপি পরিতে আমার মনে মনে আপত্তি ছিল। গাড়িতে উঠিয়াই পিতা বলিলেন, মাথায় পরো। পিতার কাছে যথারীতি পরিচ্ছন্নতার ত্রুটি হইবার জো নাই। লজ্জিত মস্তকের উপর টুপিটা পরিতেই হইল। রেলগাড়িতে একটু সুযোগ বুঝিলেই টুপিটা খুলিয়া রাখিতাম। কিন্তু পিতার দৃষ্টি একবারও এড়াইত না। তখনই সেটাকে স্বস্থানে তুলিতে হইত।

ছোটো হইতে বড়ো পর্য্যন্ত পিতৃদেবের সমস্ত কল্পনা এবং কাজ অত্যন্ত যথাযথ ছিল। তিনি মনের মধ্যে কোনো জিনিষ ঝাপসা রাখিতে পারিতেন না, এবং তাঁহার কাজেও যেমন-তেমন করিয়া কিছু হইবার জো ছিল না। তাঁহার প্রতি অন্যের এবং অন্যের প্রতি তাঁহার সমস্ত কর্ত্তব্য অত্যন্ত সুনির্দ্দিষ্ট ছিল। আমাদের জাতিগত স্বভাবটা যথেষ্ট ঢিলাঢালা। অল্পস্বল্প এদিকওদিক হওয়াকে আমরা ধর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য করি না। সেইজন্য তাঁহার সঙ্গে ব্যবহারে আমাদের সকলকেই অত্যন্ত ভীত ও সতর্ক থাকিতে হইত। উনিশবিশ হইলে হয়তো কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি না হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে ব্যবস্থার যে লেশমাত্র নড়চড় ঘটে সেইখানে তিনি আঘাত পাইতেন। তিনি যাহা সঙ্কল্প করিতেন তাহার প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তিনি মনশ্চক্ষুতে স্পষ্টরূপে প্রত্যক্ষ করিয়া লইতেন। এইজন্য কোনো ক্রিয়াকর্ম্মে কোন্ জিনিষটা ঠিক কোথায় থাকিবে, কে কোথায় বসিবে, কাহার প্রতি কোন কাজের কতটুকু ভার থাকিবে সমস্তই

তিনি আগাগোড়া মনের মধ্যে ঠিক করিয়া লইতেন এবং কিছুতেই কোনো অংশে তাহার অন্যথা হইতে দিতেন না। তাহার পরে সে কাজটা সম্পন্ন হইয়া গেলে নানা লোকের কাছে তাহার বিবরণ শুনিতেন। প্রত্যেকের বর্ণনা মিলাইয়া লইয়া এবং মনের মধ্যে জোড়া দিয়া ঘটনাটি তিনি স্পষ্ট করিয়া দেখিতে চেষ্টা করিতেন। এ সম্বন্ধে আমাদের দেশের জাতিগত ধর্ম্ম তাঁহার একেবারেই ছিল না। তাঁহার সঙ্কল্পে, চিন্তায়, আচরণে ও অনুষ্ঠানে তিলমাত্র শৈথিল্য ঘটিবার উপায় থাকিত না। এইজন্য হিমালয়যাত্রায় তাঁহার কাছে যতদিন ছিলাম একদিকে আমার প্রচুর পরিমাণে স্বাধীনতা ছিল অন্যদিকে সমস্ত আচরণ অলঙ্ঘ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট ছিল। যেখানে তিনি ছুটি দিতেন সেখানে তিনি লেশমাত্র ছিদ্র রাখিতেন না।

যাত্রার আরম্ভে প্রথমে কিছুদিন বোলপুরে থাকিবার কথা। কিছুকাল পূর্ব্বে পিতামাতার সঙ্গে সত্য সেখানে গিয়াছিল। তাহার কাছে ভ্রমণ-বৃত্তান্ত যেরূপ শুনিয়াছিলাম উনবিংশ শতাব্দীর কোনো ভদ্রঘরের শিশু তাহা কখনই বিশ্বাস করিতে পারিত না। কিন্তু আমাদের সেকালে সম্ভব অসম্ভবের মাঝখানে সীমা-রেখাটা যে কোথায় তাহা ভালো করিয়া চিনিয়া রাখিতে শিখি নাই। কৃত্তিবাস কাশীরাম দাস এ সম্বন্ধে আমাদের কোনো সাহায্য করেন নাই। রং-করা ছেলেদের বই এবং ছবি-দেওয়া ছেলেদের কাগজ সত্যমিথ্যা-সম্বন্ধে আমাদিগকে আগেভাগে সাবধান করিয়া দেয় নাই।

জগতে যে একটা কড়া নিয়মের উপসর্গ আছে সেটা আমাদিগকে নিজে ঠেকিয়া শিখিতে হইয়াছে।

সত্য বলিয়াছিলেন বিশেষ দক্ষতা না থাকিলে রেল-গাড়িতে চড়া এক ভয়ঙ্কর সঙ্কট—পা ফস্‌কাইয়া গেলেই আর রক্ষা নাই। তারপর গাড়ি যখন চলিতে আরম্ভ করে, তখন শরীরের সমস্ত শক্তিকে আশ্রয় করিয়া বসা চাই, নহিলে এমন ভয়ানক ধাক্কা দেয় যে, মানুষ কে কোথায় ছিটকাইয়া পড়ে তাহার ঠিকানা পাওয়া যায় না। ষ্টেসনে পৌঁছিয়া মনের মধ্যে বেশ একটু ভয় ভয় করিতেছিল। কিন্তু গাড়িতে এত সহজেই উঠিলাম যে মনে সন্দেহ হইল এখনো হয়তো গাড়ি ওঠার আসল অঙ্গটাই বাকি আছে। তাহার পরে যখন অত্যন্ত সহজে গাড়ি ছাড়িয়া দিল। তখন কোথাও বিপদের একটুও আভাস না পাইয়া মনটা বিমর্ষ হইয়া গেল।

গাড়ি ছুটিয়া চলিল; তরুশ্রেণীর সবুজ নীল পাড় দেওয়া বিস্তীর্ণ মাঠ এবং ছায়াচ্ছন্ন গ্রামগুলি রেলগাড়ির দুই ধারে দুই ছবির ঝরনার মতো বেগে ছুটিতে লাগিল, যেন মরীচিকার বন্যা বহিয়া চলিয়াছে। সন্ধ্যার সময় বোলপুরে পৌঁছিলাম। পাল্কীতে চোখ বুজিলাম। একেবারে কাল সকালবেলায় বোলপুরের সমস্ত বিস্ময় আমার জাগ্রত চোখের সম্মুখে খুলিয়া যাইবে এই আমার ইচ্ছা—সন্ধ্যার অস্পষ্টতার মধ্যে কিছু কিছু আভাস যদি পাই তবে বালকের অখণ্ড আনন্দের রসভঙ্গ হইবে।

ভোরে উঠিয়া বুক দুরু দুরু করিতে করিতে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম। আমার পূর্ব্ববর্ত্তী ভ্রমণকারী আমাকে বলিয়াছিল পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের সঙ্গে বোলপুরের একটা বিষয়ে প্রভেদ এই যে, কুঠি-বাড়ি হইতে রান্নাঘরে যাইবার পথে যদিও কোনো প্রকার আবরণ নাই তবু গায়ে রৌদ্র বৃষ্টি কিছুই লাগে না। এই অদ্ভুত রাস্তাটা খুঁজিতে বাহির হইলাম। পাঠকেরা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন না, যে, আজ পর্য্যন্ত তাহা খুঁজিয়া পাই নাই।

আমরা সহরের ছেলে, কোনো কালে ধানের ক্ষেত দেখি নাই এবং রাখাল বালকের কথা বইয়ে পড়িয়া তাহাদিগকে খুব মনোহর করিয়া কল্পনার পটে আঁকিয়াছিলাম। সত্যর কাছে শুনিলাম, বোলপুরের মাঠে চারিদিকেই ধান ফলিয়া আছে এবং সেখানে রাখালবালকদের সঙ্গে খেলা প্রতিদিনের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। ধানক্ষেত্র হইতে চাল সংগ্রহ করিয়া ভাত রাঁধিয়া রাখালদের সঙ্গে একত্র বসিয়া খাওয়া এই খেলার প্রধান অঙ্গ।

ব্যাকুল হইয়া চারিদিকে চাহিলাম। হায়রে, মরু-প্রান্তরের মধ্যে কোথায় ধানের ক্ষেত। রাখালবালক হয়তো বা মাঠের কোথাও ছিল কিন্তু তাহাদিগকে বিশেষ করিয়া রাখালবালক বলিয়া চিনিবার কোনো উপায় ছিল না।

যাহা দেখিলাম না তাহার খেদ মিটিতে বিলম্ব হইল না —যাহা দেখিলাম তাহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট হইল। এখানে চাকরদের শাসন ছিল না। প্রান্তরলক্ষ্মী দিক্-

চক্রবালে একটিমাত্র নীল রেখার গণ্ডি আঁকিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহাতে আমার অবাধসঞ্চরণের কোনো ব্যাঘাত করিত না।

যদিচ আমি নিতান্ত ছোটো ছিলাম কিন্তু পিতা কখনো আমাকে যথেচ্ছবিহারে নিষেধ করিতেন না। বোলপুরের মাঠের মধ্যে স্থানে স্থানে বর্ষার জলধারায় বালিমাটি ক্ষয় করিয়া প্রান্তরতল হইতে নিম্নে কাঁকর ও নানা প্রকার পাথরে খচিত ছোটো ছোটো শৈলমালা, গুহা গহ্বর নদী উপনদী রচনা করিয়া বালখিল্যদের দেশের ভূবৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়াছে। এখানে এই ঢিবিওয়ালা খাদগুলিকে খোয়াই বলে। এখান হইতে জামার আঁচলে নানা প্রকারের পাথর সংগ্রহ করিয়া পিতার কাছে উপস্থিত করিতাম। তিনি আমার এই অধ্যবসায়কে তুচ্ছ বলিয়া একদিনো উপেক্ষা করেন নাই। তিনি উৎসাহ প্রকাশ করিয়া বলিতেন—কী চমৎকার! এ সমস্ত তুমি কোথায় পাইলে! আমি বলিতাম "এমন আরো কত আছে! কত হাজার হাজার! আমি রোজ আনিয়া দিতে পারি।" তিনি বলিতেন "সে হইলে তো বেশ হয়। ঐ পাথর দিয়া আমার এই পাহাড়টা তুমি সাজাইয়া দাও।"

একটা পুকুর খুঁড়িবার চেষ্টা করিয়া অত্যন্ত কঠিন মাটি বলিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়। এই অসমাপ্ত গর্ত্তের মাটি তুলিয়া দক্ষিণধারে পাহাড়ের অনুকরণের একটি উচ্চ স্তূপ তৈরি হইয়াছিল। সেখানে প্রভাতে আমার পিতা চৌকি লইয়া উপাসনায় বসিতেন। তাঁহার সম্মুখে পূর্ব্বদিকের

প্রান্তর সীমায় সূর্য্যোদয় হইত। এই পাহাড়টাই পাথর দিয়া খচিত করিবার জন্য তিনি আমাকে উৎসাহ দিলেন। বোলপুর ছাড়িয়া আসিবার সময় সেই রাশীকৃত পাথরের সঞ্চয় সঙ্গে আনিতে পারি নাই বলিয়া মনে বড়োই দুঃখ অনুভব করিয়াছিলাম। বোঝামাত্রেই যে বহনের দায় ও মাশুল আছে সে কথা তখন বুঝিতাম না; এবং সঞ্চয় করিয়াছি বলিয়াই যে তাহার সঙ্গে সম্বন্ধরক্ষা করিতে পারিব এমন কোনো দাবি নাই সে কথা আজও বুঝিতে ঠেকে। আমার সেদিনকার একান্ত মনের প্রার্থনায় বিধাতা যদি বর দিতেন যে এই পাথরের বোঝা তুমি চিরদিন বহন করিবে তাহা হইলে এ কথাটা লইয়া আজ এমন করিয়া হাসিতে পারিতাম না।

খোয়াইয়ের মধ্যে একজায়গায় মাটি চুঁইয়া একটা গভীর গর্ত্তের মধ্যে জল জমা হইত। এই জলসঞ্চয় আপন বেষ্টন ছাপাইয়া ঝির্ ঝির্ করিয়া বালির মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইত। অতি ছোটো ছোটো মাছ সেই জলকুণ্ডের মুখের কাছে স্রোতের উজানে সন্তরণের স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিত। আমি পিতাকে গিয়া বলিলাম—"ভারি সুন্দর জলের ধারা দেখিয়া আসিয়াছি, সেখান হইতে আমাদের স্নানের ও পানের জল আনিলে বেশ হয়!" তিনি আমার উৎসাহে যোগ দিয়া বলিলেন "তাইতো, সে তো বেশ হইবে" এবং আবিষ্কারকর্ত্তাকে পুরস্কৃত করিবার জন্য সেইখান হইতেই জল আনাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

আমি যখন-তখন সেই খোয়াইয়ের উপত্যকা অধিত্যকার মধ্যে অভূতপূর্ব্ব কোনো একটা কিছুর সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতাম। এই ক্ষুদ্র অজ্ঞাত রাজ্যের আমি ছিলাম লিভিংষ্টোন। এটা যেন একটা দূরবীণের উল্টা দিকের দেশ। নদীপাহাড়গুলোও যেমন ছোটোছোটো, মাঝে মাঝে ইতস্ততঃ বুনো জাম, বুনো খেজুরগুলাও তেমনি বেঁটেখাটো। আমার আবিষ্কৃত ছোটো নদীটির মাছগুলিও তেমনি, আর আবিষ্কারকর্ত্তাটির তো কথাই নাই।

পিতা বোধ করি আমার সাবধানতাবৃত্তির উন্নতিসাধনের জন্য আমার কাছে দুই চারি আনা পয়সা রাখিয়া বলিতেন হিসাব রাখিতে হইবে; এবং আমার প্রতি তাঁহার দামী সোনার ঘড়িটি দম দিবার ভার দিলেন। ইহাতে যে ক্ষতির সম্ভাবনা ছিল সে চিন্তা তিনি করিলেন না, আমাকে দায়িত্বে দীক্ষিত করাই তাঁহার অভিপ্রায় ছিল। সকালে যখন বেড়াইতে বাহির হইতেন, আমাকে সঙ্গে লইতেন। পথের মধ্যে ভিক্ষুক দেখিলে ভিক্ষা দিতে আমাকে আদেশ করিতেন। অবশেষে তাঁহার কাছে জমা খরচ মেলাইবার সময় কিছুতেই মিলিত না। একদিন তো তহবিল বাড়িয়া গেল। তিনি বলিলেন "তোমাকেই দেখিতেছি আমার ক্যাশিয়ার রাখিতে হইবে, তোমার হাতে আমার টাকা বাড়িয়া উঠে।" তাঁহার ঘড়িতে যত্ন করিয়া নিয়মিত দম দিতাম যত্ন কিছু প্রবল বেগেই করিতাম; ঘড়িটা অনতিকালের মধ্যেই মেরামতের জন্য কলিকাতায় পাঠাইতে হইল।

বড়ো বয়সে কাজের ভার পাইয়া যখন তাঁহার কাছে হিসাব দিতে হইত সেই দিনের কথা এইখানে আমার মনে পড়িতেছে। তখন তিনি পার্ক ষ্ট্রীটে থাকিতেন। প্রতি মাসের ২রা ও ৩রা আমাকে হিসাব পড়িয়া শুনাইতে হইত। তিনি তখন নিজে পড়িতে পারিতেন না। গত মাসের ও গত বৎসরের সঙ্গে তুলনা করিয়া সমস্ত আয় ব্যয়ের বিবরণ তাঁহার সম্মুখে ধরিতে হইত। প্রথমতঃ মোটা অঙ্কগুলা তিনি শুনিয়া লইতেন ও মনে মনে যোগ বিয়োগ করিয়া লইতেন। মনের মধ্যে যদি কোনোদিন অসঙ্গতি অনুভব করিতেন তবে ছোটো ছোটো অঙ্কগুলা শুনাইয়া যাইতে হইত। কোনো কোনো দিন এমন ঘটিয়াছে হিসাবে যেখানে কোনো দুর্ব্বলতা থাকিত সেখানে তাঁহার বিরক্তি বাঁচাইবার জন্য চাপিয়া গিয়াছি কিন্তু কখনো চাপা থাকে নাই। হিসাবের মোট চেহারা তিনি চিত্তপটে আঁকিয়া লইতেন। যেখানে ছিদ্র পড়িত সেইখানেই তিনি ধরিতে পারিতেন। এই কারণে মাসের ঐ দুটা দিন বিশেষ উদ্বেগের দিন ছিল। পূর্ব্বে বলিয়াছি মনের মধ্যে সকল জিনিষ সুস্পষ্ট করিয়া দেখিয়া লওয়া তাঁহার প্রকৃতিগত ছিল—তা হিসাবের অঙ্কেই হোক্, বা প্রাকৃতিক দৃশ্যেই হোক, বা অনুষ্ঠানের আয়োজনেই হোক্। শান্তিনিকেতনের নূতন মন্দির প্রভৃতি অনেক জিনিষ তিনি চক্ষে দেখেন নাই। কিন্তু যে-কেহ শান্তিনিকেতন দেখিয়া তাঁহার কাছে গিয়াছে প্রত্যেক লোকের কাছ হইতে বিবরণ শুনিয়া তিনি অপ্রত্যক্ষ জিনিষগুলিকে মনের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আঁকিয়া না লইয়া

ছাড়েন নাই। তাঁহার স্মরণশক্তি ও ধারণাশক্তি অসাধারণ ছিল। সেই জন্য একবার মনের মধ্যে যাহা গ্রহণ করিতেন তাহা কিছুতেই তাঁহার মন হইতে ভ্রষ্ট হইত না।

ভগবদ্গীতায় পিতার মনের মতো শ্লোকগুলি চিহ্নিত করা ছিল। সেইগুলি বাংলা অনুবাদসমেত আমাকে কাপি করিতে দিয়াছিলেন। বাড়িতে আমি নগণ্য বালক ছিলাম, এখানে আমার পরে এই সকল গুরুতর কাজের ভার পড়াতে তাহার গৌরবটা খুব করিয়া অনুভব করিতে লাগিলাম।

ইতিমধ্যে সেই ছিন্নবিচ্ছিন্ন নীল খাতাটি বিদায় করিয়া একখানা বাঁধানো লেট্স্ ডায়ারি সংগ্রহ করিয়াছিলাম। এখন খাতাপত্র এবং বাহ্যউপকরণের দ্বারা কবিত্বের ইজ্জৎ রাখিবার দিকে দৃষ্টি পড়িয়াছে। শুধু কবিতা লেখা নহে, নিজের কল্পনার সম্মুখে নিজেকে কবি বলিয়া খাড়া করিবার জন্য একটা চেষ্টা জন্মিয়াছে। এই জন্য বোলপুরে যখন কবিতা লিখিতাম তখন বাগানের প্রান্তে একটি শিশু নারি-কেল গাছের তলায় মাটিতে পা ছড়াইয়া বসিয়া খাতা ভরাইতে ভালো বাসিতাম। এটাকে বেশ কবিজনোচিত বলিয়া বোধ হইত। তৃণহীন কঙ্করশয্যায় বসিয়া রৌদ্রের উত্তাপে "পৃথ্বীরাজের পরাজয়" বলিয়া একটা বীররসাত্মক কাব্য লিখিয়াছিলাম। তাহার প্রচুর বীররসেও উক্ত কাব্যটাকে বিনাশের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারে নাই। তাহার উপযুক্ত বাহন সেই বাঁধানো লেট্স্ ডায়ারিটিও জ্যেষ্ঠা সহো-

দরা নীল খাতাটির অনুসরণ করিয়া কোথায় গিয়াছে তাহার ঠিকানা কাহারো কাছে রাখিয়া যায় নাই।

বোলপুর হইতে বাহির হইয়া সাহেবগঞ্জ, দানাপুর, এলাহাবাদ, কানপুর প্রভৃতি স্থানে মাঝে মাঝে বিশ্রাম করিতে করিতে অবশেষে অমৃতসরে গিয়া পৌঁছিলাম।

পথের মধ্যে একটা ঘটনা ঘটিয়াছিল যেটা এখনো আমার মনে স্পষ্ট আঁকা রহিয়াছে। কোনো একটা বড়ো ষ্টেশনে গাড়ি থামিয়াছে। টিকিট-পরীক্ষক আসিয়া আমাদের টিকিট দেখিল। একবার আমার মুখের দিকে চাহিল। কী একটা সন্দেহ করিল কিন্তু বলিতে সাহস করিল না। কিছুক্ষণ পরে আর একজন আসিল—উভয়ে আমাদের গাড়ির দরজার কাছে উস্‌খুস্‌ করিয়া আবার চলিয়া গেল। তৃতীয়বারে বোধ হয় স্বয়ং ষ্টেশনমাষ্টার আসিয়া উপস্থিত। আমার হাফটিকিট পরীক্ষা করিয়া পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল, এই ছেলেটির বয়স কি বারো বছরের অধিক নহে? পিতা কহিলেন, “না”। তখন আমার বয়স এগারো। বয়সের চেয়ে নিশ্চয়ই আমার বৃদ্ধি কিছু বেশি হইয়াছিল। ষ্টেশনমাষ্টার কহিল ইহার জন্য পুরা ভাড়া দিতে হইবে। আমার পিতার দুই চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। তিনি বাক্স হইতে তখনি নোট বাহির করিয়া দিলেন। ভাড়ার টাকা বাদ দিয়া অবশিষ্ট টাকা যখন তাহারা ফিরাইয়া দিতে আসিল তিনি সে টাকা লইয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন, তাহা প্ল্যাটফর্ম্মের পাথরের মেজের উপর ছড়াইয়া পড়িয়া ঝন্‌ ঝন্‌ করিয়া বাজিয়া

উঠিল। ষ্টেশনমাষ্টার অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া চলিয়া গেল—টাকা বাঁচাইবার জন্য পিতা যে মিথ্যা কথা বলিবেন এ সন্দেহের ক্ষুদ্রতা তাহার মাথা হেঁট করিয়া দিল।

অমৃতসরে গুরুদরবার আমার স্বপ্নের মতো মনে পড়ে। অনেক দিন সকালবেলার পিতৃদেবের সঙ্গে পদব্রজে সেই সরোবরের মাঝখানে শিখমন্দিরে গিয়াছি। সেখানে নিয়তই ভজনা চলিতেছে। আমার পিতা সেই শিখ উপাসকদের মাঝখানে বসিয়া সহসা একসময় সুর করিয়া তাহাদের ভজনায় যোগ দিতেন—বিদেশীর মুখে তাহাদের এই বন্দনাগান শুনিয়া তাহারা অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া উঠিয়া তাঁহাকে সমাদর করিত। ফিরিবার সময় মিছ্রির খণ্ড ও হালুয়া লইয়া আসিতেন।

একবার পিতা গুরুদরবারের একজন গায়ককে বাসায় আনাইয়া তাহার কাছ হইতে ভজনগান শুনিয়াছিলেন। বোধ করি তাহাকে যে পুরস্কার দেওয়া হইয়াছিল তাহার চেয়ে কম দিলেও সে খুসি হইত। ইহার ফল হইল এই, আমাদের বাসায় গান শোনাইবার উমেদারের আমদানি এত বেশি হইতে লাগিল যে তাহাদের পথরোধের জন্য শক্ত বন্দোবস্তের প্রয়োজন হইল। বাড়িতে সুবিধা না পাইয়া তাহারা সরকারী রাস্তায় আসিয়া আক্রমণ আরম্ভ করিল। প্রতিদিন সকাল বেলায় পিতা আমাকে সঙ্গে করিয়া বেড়াইতে বাহির হইতেন। এই সময়ে ক্ষণে ক্ষণে হঠাৎ সম্মুখে তানপুরাঘাড়ে গায়কের আবির্ভাব হইত। যে পাখীর কাছে

শিকারী অপরিচিত নহে সে যেমন কাহারো ঘাড়ের উপর বন্দুকের চোঙ দেখিলেই চমকিয়া উঠে, রাস্তায় সুদূর কোনো একটা কোণে তানপুরাযন্ত্রের ডগাটা দেখিলেই আমাদের সেই দশা হইত। কিন্তু শিকার এমনি সেয়ানা হইয়া উঠিয়াছিল, যে তাহাদের তানপুরার আওয়াজ নিতান্ত ফাঁকা আওয়াজের কাজ করিত—তাহা আমাদিগকে দূরে ভাগাইয়া দিত, পাড়িয়া ফেলিতে পারিত না।

যখন সন্ধ্যা হইয়া আসিত পিতা বাগানের সম্মুখে বারান্দায় আসিয়া বসিতেন। তখন তাঁহাকে ব্রহ্মসঙ্গীত শোনাইবার জন্য আমার ডাক পড়িত। চাঁদ উঠিয়াছে, গাছের ছায়ার ভিতর দিয়া জ্যোৎস্নার আলো বারান্দার উপর আসিয়া পড়িয়াছে—আমি বেহাগে গান গাহিতেছি—

“তুমি বিনা কে প্রভু সঙ্কট নিবারে
কে সহায় ভব-অন্ধকারে”—

তিনি নিস্তব্ধ হইয়া নতশিরে কোলের উপর দুই হাত জোড় করিয়া শুনিতেছেন,—সেই সন্ধ্যাবেলাটির ছবি আজও মনে পড়িতেছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি একদিন আমার রচিত দুইটি পারমার্থিক কবিতা শ্রীকণ্ঠ বাবুর নিকট শুনিয়া পিতৃদেব হাসিয়াছিলেন। তাহার পরে বড়ো বয়সে আর একদিন আমি তাহার শোধ লইতে পারিয়াছিলাম। সেই কথাটা এখানে উল্লেখ করিতে ইচ্ছা করি।

একবার মাঘোৎসবে সকালে ও বিকালে আমি অনেকগুলি

গান তৈরি করিয়াছিলাম। তাহার মধ্যে একটা—'নয়ন তোমারে পায়না দেখিতে রয়েছ নয়নে নয়নে"।

(পিতা তখন চুঁচুড়ায় ছিলেন। সেখানে আমার এবং জ্যোতিদাদার ডাক পড়িল। হার্ম্মোনিয়মে জ্যোতিদাদাকে বসাইয়া আমাকে তিনি নূতন গান সব-কটি একে একে গাহিতে বলিলেন। কোনো কোনো গান দুবারও গাহিতে হইল।

গান গাওয়া শেষ হইল। তখন তিনি বলিলেন, দেশের রাজা যদি দেশের ভাষা জানিত ও সাহিত্যের আদর বুঝিত তবে কবিকে তো তাহারা পুরস্কার দিত। রাজার দিক হইতে যখন তাহার কোনো সম্ভাবনা নাই তখন আমাকেই সে কাজ করিতে হইবে। এই বলিয়া তিনি একখানি পাঁচশো টাকার চেক্ আমার হাতে দিলেন।)

পিতা আমাকে ইংরেজি পড়াইবেন বলিয়া Peter Parley's Tales পর্য্যায়ের অনেকগুলি বই লইয়া গিয়াছিলেন। তাহার মধ্য হইতে বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের জীবনবৃত্তান্ত তিনি আমার পাঠ্যরূপে বাছিয়া লইলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন জীবনী অনেকটা গল্পের মতো লাগিবে এবং তাহা পড়িয়া আমার উপকার হইবে। কিন্তু পড়াইতে গিয়া তাঁহার ভুল ভাঙিল। বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন নিতান্তই সুবুদ্ধি মানুষ ছিলেন। তাঁহার হিসাবকরা কেজো ধর্ম্মনীতির সংকীর্ণতা আমার পিতাকে পীড়িত করিত। তিনি এক এক জায়গা পড়াইতে পড়াইতে ফ্রাঙ্কলিনের ঘোরতর সাংসারিক

বিজ্ঞতার দৃষ্টান্তে ও উপদেশবাক্যে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিতেন, এবং প্রতিবাদ না করিয়া থাকিতে পারিতেন না।

ইহার পূর্ব্বে মুগ্ধবোধ মুখস্থ করা ছাড়া সংস্কৃত পড়ার আর কোনো চর্চ্চা হয় নাই। পিতা আমাকে একেবারেই ঋজুপাঠ দ্বিতীয়ভাগ পড়াইতে আরম্ভ করিলেন এবং তাহার সঙ্গে উপক্রমণিকার শব্দরূপ মুখস্থ করিতে দিলেন। বাংলা আমাদিগকে এমন করিয়া পড়িতে হইয়াছিল যে, তাহাতেই আমাদের সংস্কৃত শিক্ষার কাজ অনেকটা অগ্রসর হইয়া গিয়াছিল। একেবারে গোড়া হইতেই যথাসাধ্য সংস্কৃত রচনাকার্য্যে তিনি আমাকে উৎসাহিত করিতেন। আমি যাহা পড়িতাম তাহারই শব্দগুলা উলট্‌পালট্‌ করিয়া লম্বা লম্বা সমাস গাঁথিয়া যেখানে-সেখানে যথেচ্ছ অনুস্বার যোগ করিয়া দেবভাষাকে অপবাদের যোগ্য করিয়া তুলিতাম। কিন্তু পিতা আমার এই অদ্ভুত দুঃসাহসকে একদিনও উপহাস করেন নাই।

ইহা ছাড়া তিনি প্রক্টরের লিখিত সরলপাঠ্য ইংরেজি জ্যোতিষ গ্রন্থ হইতে অনেক বিষয় মুখে মুখে আমাকে বুঝাইয়া দিতেন; আমি তাহা বাংলায় লিখিতাম।

তাঁহার নিজের পড়ার জন্য তিনি যে বইগুলি সঙ্গে লইয়াছিলেন তাহার মধ্যে একটা আমার চোখে খুব ঠেকিত। দশ বারো খণ্ডে বাঁধানো বৃহদাকার গিবনের রোম। দেখিয়া মনে হইত না ইহার মধ্যে কিছুমাত্র রস আছে। আমি মনে ভাবিতাম—আমাকে দায়ে পড়িয়া অনেক জিনিষ পড়িতে

হয়, কারণ আমি বালক, আমার উপায় নাই—কিন্তু ইনি তো ইচ্ছা করিলেই না পড়িলেই পারিতেন, তবে এ দুঃখ কেন?

অমৃতসরে মাসখানেক ছিলাম। সেখান হইতে চৈত্র-মাসের শেষে ড্যালহৌসি পাহাড়ে যাত্রা করা গেল। অমৃত-সরে মাস আর কাটিতেছিল না। হিমালয়ের আহ্বান আমাকে অস্থির করিয়া তুলিতেছিল।

যখন ঝাঁপানে করিয়া পাহাড়ে উঠিতেছিলাম তখন পর্ব্বতের উপত্যকা অধিত্যকা-দেশে নানাবিধ চৈতালি ফসলে স্তরে স্তরে পংক্তিতে পংক্তিতে সৌন্দর্য্যের আগুন লাগিয়া গিয়াছিল। আমরা প্রতঃকালেই দুধরুটি খাইয়া বাহির হইতাম এবং অপরাহ্ণে ডাকবাংলায় আশ্রয় লইতাম। সমস্ত-দিন আমার দুই চোখের বিরাম ছিল না—পাছে কিছু একটা এড়াইয়া যায় এই আমার ভয়। যেখানে পাহাড়ের কোনো কোণে বাঁকে পল্লবভারাচ্ছন্ন বনস্পতির দল নিবিড় রচনা করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, এবং ধ্যানরত বৃদ্ধতপস্বীদের কোলের কাছে লীলাময়ী মুনিকন্যাদের মতো দুই একটি ঝরণার ধারা সেই ছায়াতল দিয়া শৈবালাচ্ছন্ন কালো পাথরগুলার গা বাহিয়া ঘনশীতল অন্ধকারের নিভৃত নেপথ্য হইতে কুল্ কুল্ করিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে, সেখানে ঝাঁপানিরা ঝাঁপান নামাইয়া বিশ্রাম করিত। আমি লুব্ধভাবে মনে করিতাম এ সমস্ত জায়গা আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইতে হইতেছে কেন? এইখানে থাকিলেই তো হয়।

নূতন পরিচয়ের ঐ একটা মস্ত সুবিধা। মন তখনো

জানিতে পারে না যে এমন আরো অনেক আছে। তাহা জানিতে পারিলেই হিসাবী মন মনযোগের খরচটা বাঁচাইতে চেষ্টা করে। যখন প্রত্যেক জিনিষটাকেই একান্ত দুর্লভ বলিয়া মনে করে তখনই মন আপনার কৃপণতা ঘুচাইয়া পূর্ণ মূল্য দেয়। তাই আমি একএকদিন কলিকাতার রাস্তা দিয়া যাইতে যাইতে নিজেকে বিদেশী বলিয়া কল্পনা করি। তখনি বুঝিতে পারি দেখিবার জিনিষ ঢের আছে, কেবল মন দিবার মূল্য দিই না বলিয়া দেখিতে পাই না। এই কারণেই দেখিবার ক্ষুধা মিটাইবার জন্য লোকে বিদেশে যায়।

আমার কাছে পিতা তাঁহার ছোট ক্যাশবাক্সটি রাখিবার ভার দিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে আমিই যোগ্যতম ব্যক্তি সে কথা মনে করিবার হেতু ছিল না। পথখরচের জন্য তাহাতে অনেক টাকাই থাকিত। কিশোরী চাটুর্য্যের হাতে দিলে তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন কিন্তু আমার উপরে বিশেষ ভার দেওয়াই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। ডাকবাংলায় পৌঁছিয়া একদিন বাক্সটি তাঁহার হাতে না দিয়া ঘরের টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়াছিলাম, ইহাতে তিনি আমাকে ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন।

ডাকবাংলায় পৌঁছিলে পিতৃদেব বাংলার বাহিরে চৌকি লইয়া বসিতেন। সন্ধ্যা হইয়া আসিলে পর্ব্বতের স্বচ্ছ আকাশে তারাগুলি আশ্চর্য্য সুস্পষ্ট হইয়া উঠিত এবং পিতা আমাকে গ্রহতারকা চিনাইয়া দিয়া জ্যোতিষ্কসম্বন্ধে আলোচনা করিতেন।

বক্রোটায় আমাদের বাসা একটি পাহাড়ের সর্ব্বোচ্চ চূড়ায় ছিল। যদিও তখন বৈশাখ মাস, কিন্তু শীত অত্যন্ত প্রবল। এমন কি, পথের যে অংশে রৌদ্র পড়িত না সেখানে তখনো বরফ গলে নাই।

এখানেও কোনো বিপদ আশঙ্কা করিয়া আপন ইচ্ছায় পাহাড়ে ভ্রমণ করিতে পিতা আমাকে একদিনও বাধা দেন নাই।

আমাদের বাসার নিম্নবর্ত্তী এক অধিত্যকায় বিস্তীর্ণ কেলুবন ছিল। সেই বনে আমি একলা লৌহফলকবিশিষ্ট লাঠি লইয়া প্রায় বেড়াইতে যাইতাম। বনস্পতিগুলা প্রকাণ্ড দৈত্যের মতো মস্ত মস্ত ছায়া লইয়া দাঁড়াইয়া আছে; তাহাদের কত শত বৎসরের বিপুল প্রাণ। কিন্তু এই সেদিনকার অতি ক্ষুদ্র একটি মানুষের শিশু অসঙ্কোচে তাহাদের গা ঘেঁসিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহারা একটি কথাও বলিতে পারে না। বনের ছায়ার মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্রই যেন তাহার একটা বিশেষ স্পর্শ পাইতাম। যেন সরীসৃপের গাত্রের মতো একটি ঘন শীতলতা, এবং বনতলের শুষ্ক পত্ররাশির উপরে ছায়া-আলোকের পর্য্যায় যেন প্রকাণ্ড একটা আদিম সরীসৃপের গাত্রের বিচিত্র রেখাবলী।

আমার শোবার ঘর ছিল একটা প্রান্তের ঘর। রাত্রে বিছানায় শুইয়া কাচের জানালার ভিতর দিয়া নক্ষত্রালোকের অস্পষ্টতায় পর্ব্বতচূড়ার পাণ্ডুরবর্ণ তুষারদীপ্তি দেখিতে

পাইতাম—জানিনা কতরাত্রে—দেখিতাম পিতা গায়ে একখানি লাল শাল পরিয়া হাতে একটি মোমবাতির সেজ লইয়া নিঃশব্দসঞ্চরণে চলিয়াছেন। কাচের আবরণে ঘেরা বাহিরের বারান্দায় বসিয়া উপাসনা করিতে যাইতেছেন।

তাহার পর আর এক ঘুমের পরে হঠাৎ দেখিতাম পিতা আমাকে ঠেলিয়া জাগাইয়া দিতেছেন। তখনো রাত্রির অন্ধকার সম্পূর্ণ দূর হয় নাই। উপক্রমণিকা হইতে নরঃ নরৌ নরাঃ মুখস্থ করিবার জন্য আমার সেই সময় নির্দ্দিষ্ট ছিল। শীতের কম্বলরাশির তপ্তবেষ্টন হইতে বড়ো দুঃখের এই উদ্বোধন।

সূর্য্যোদয়কালে যখন পিতৃদেব তাঁহার প্রভাতের উপাসনা-অন্তে একবাটি দুধ খাওয়া শেষ করিতেন তখন আমাকে পাশে লইয়া দাঁড়াইয়া উপনিষদের মন্ত্রপাঠদ্বারা আর একবার উপাসনা করিতেন।

তাহার পরে আমাকে লইয়া বেড়াইতে বাহির হইতেন। তাঁহার সঙ্গে বেড়াইতে আমি পারিব কেন? অনেক বয়স্ক লোকেরও সে সাধ্য ছিল না। আমি পথিমধ্যেই কোনো একটা জায়গায় ভঙ্গ দিয়া পায়-চলা পথ বাহিয়া উঠিয়া আমাদের বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইতাম।

পিতা ফিরিয়া আসিলে ঘণ্টাখানেক ইংরেজিপড়া চলিত। তাহার পর দশটার সময় বরফগলা ঠাণ্ডাজলে স্নান। ইহা হইতে কোনো মতে অব্যাহতি ছিল না; তাঁহার আদেশের বিরুদ্ধে ঘড়ায় গরমজল মিশাইতেও ভৃত্যেরা কেহ সাহস

করিত না। যৌবনকালে তিনি নিজে কিরূপ দুঃসহশীতল-জলে স্নান করিয়াছেন আমাকে উৎসাহ দিবার জন্য সেই গল্প করিতেন।

দুধ খাওয়া আমার আর এক তপস্যা ছিল। আমার পিতা প্রচুর পরিমাণে দুধ খাইতেন। আমি এই পৈতৃক দুগ্ধপানশক্তির অধিকারী হইতে পারিতাম কি না নিশ্চয় বলা যায় না, কিন্তু পূর্ব্বেই জানাইয়াছি কী কারণে আমার পানাহারের অভ্যাস সম্পূর্ণ উল্টাদিকে চলিয়াছিল। তাঁহার সঙ্গে বরাবর আমাকে দুধ খাইতে হইত। ভৃত্যদের শরণাপন্ন হইলাম। তাহারা আমার প্রতি দয়া করিয়া বা নিজের প্রতি মমতাবশত-বাটিতে দুধের অপেক্ষা ফেনার পরিমাণ বেশি করিয়া দিত।

মধ্যাহ্নে আহারের পর পিতা আমাকে আর একবার পড়াইতে বসিতেন। কিন্তু সে আমার পক্ষে অসাধ্য হইত। প্রত্যূষের নষ্ট-ঘুম তাহার অকাল-ব্যাঘাতের শোধ লইত। আমি ঘুমে বারবার ঢুলিয়া পড়িতাম। আমার অবস্থা বুঝিয়া পিতা ছুটি দিবামাত্র ঘুম কোথায় ছুটিয়া যাইত। তাহার পরে দেবতাত্মা নগাধিরাজের পালা।

একএকদিন দুপুরবেলায় লাঠিহাতে একলা এক পাহাড় হইতে আর এক পাহাড়ে চলিয়া যাইতাম; পিতা তাহাতে কখনো উদ্বেগ প্রকাশ করিতেন না। তাঁহার জীবনের শেষ পর্য্যন্ত ইহা দেখিয়াছি তিনি কোনোমতেই আমাদের স্বাতন্ত্র্যে বাধা দিতে চাহিতেন না। তাঁহার রুচি ও মতের বিরুদ্ধ

কাজ অনেক করিয়াছি—তিনি ইচ্ছা করিলেই শাসন করিয়া তাহা নিবারণ করিতে পারিতেন কিন্তু কখনো তাহা করেন নাই। যাহা কর্ত্তব্য তাহা আমরা অন্তরের সঙ্গে করিব এজন্য তিনি অপেক্ষা করিতেন। সত্যকে এবং শোভনকে আমরা বাহিরের দিক হইতে লইব ইহাতে তাঁহার মন তৃপ্তি পাইত না—তিনি জানিতেন সত্যকে ভালোবাসিতে না পারিলে সত্যকে গ্রহণ করাই হয় না। তিনি ইহাও জানিতেন যে সত্য হইতে দূরে গেলেও একদিন সত্যে ফেরা যায় কিন্তু কৃত্রিমশাসনে সত্যকে অগত্যা অথবা অন্ধভাবে মানিয়া লইলে সত্যের মধ্যে ফিরিবার পথ রুদ্ধ করা হয়।

আমার যৌবনারম্ভে একসময়ে আমার খেয়াল গিয়াছিল আমি গোরুর গাড়িতে করিয়া গ্র্যাণ্ডট্রঙ্ক রোড ধরিয়া পেশোয়ার পর্য্যন্ত যাইব। আমার এ প্রস্তাব কেহ অনুমোদন করেন নাই এবং ইহাতে আপত্তির বিষয় অনেক ছিল! কিন্তু আমার পিতাকে যখনি বলিলাম, তিনি বলিলেন এ তো খুব ভালো কথা ; রেলগাড়িতে ভ্রমণকে কি ভ্রমণ বলে? এই বলিয়া তিনি কিরূপে পদব্রজে এবং ঘোড়ার গাড়ি প্রভৃতি বাহনে ভ্রমণ করিয়াছেন তাহার গল্প করিলেন। আমার যে ইহাতে কোনো কষ্ট বা বিপদ ঘটিতে পারে তাহার উল্লেখমাত্র করিলেন না।

আর একবার যখন আমি আদিসমাজের সেক্রেটারিপদে নূতন নিযুক্ত হইয়াছি তখন পিতাকে পার্কষ্ট্রীটের বাড়িতে গিয়া জানাইলাম যে আদি ব্রাহ্মসমাজের বেদীতে ব্রাহ্মণ

ছাড়া অন্যবর্ণের আচার্য্য বসেন না ইহা আমার কাছে ভালো বোধ হয় না। তিনি তখনি আমাকে বলিলেন, বেশ তো, যদি তুমি পার তো ইহার প্রতিকার করিয়ো। যখন তাঁহার আদেশ পাইলাম তখন দেখিলাম প্রতিকারের শক্তি আমার নাই। আমি কেবল অসম্পূর্ণতা দেখিতে পারি কিন্তু পূর্ণতা সৃষ্টি করিতে পারি না। লোক কোথায়? ঠিক লোককে আহ্বান করিব এমন জোর কোথায়? ভাঙিয়া সে জায়গায় কিছু গড়িব এমন উপকরণ কই? যতক্ষণ পর্য্যন্ত যথার্থ মানুষ আপনি না আসিয়া জোটে ততক্ষণ একটা বাঁধা নিয়মও ভালো—ইহাই তাঁহার মনে ছিল। কিন্তু ক্ষণকালের জন্যও কোনো বিঘ্নের কথা বলিয়া তিনি আমাকে নিষেধ করেন নাই। যেমন করিয়া তিনি পাহাড়ে পর্ব্বতে আমাকে একলা বেড়াইতে দিয়াছেন সত্যের পথেও তেমনি করিয়া চিরদিন তিনি আপন গম্যস্থান নির্ণয় করিবার স্বাধীনতা দিয়াছেন। ভুল করিব বলিয়া তিনি ভয় পান নাই, কষ্ট পাইব বলিয়া তিনি উদ্বিগ্ন হন নাই। (তিনি আমাদের সম্মুখে জীবনের আদর্শ ধরিয়াছিলেন কিন্তু শাসনের দণ্ড উদ্যত করেন নাই।)

পিতার সঙ্গে অনেক সময়েই বাড়ির গল্প বলিতাম। বাড়ি হইতে কাহারো চিঠি পাইবামাত্র তাঁহাকে দেখাইতাম। নিশ্চয়ই তিনি আমার কাছ হইতে এমন অনেক ছবি পাইতেন যাহা আর কাহারো কাছ হইতে পাইবার কোনো সম্ভাবনা ছিল না।

বড়দাদা মেজদাদার কাছ হইতে কোনো চিঠি আসিলে তিনি আমাকে তাহা পড়িতে দিতেন। কী করিয়া তাঁহাকে চিঠি লিখিতে হইবে এই উপায়ে তাহা আমার শিক্ষা হইয়াছিল। বাহিরের এই সমস্ত কায়দাকানুনসম্বন্ধে শিক্ষা তিনি বিশেষ আবশ্যক বলিয়া জানিতেন।

আমার বেশ মনে আছে, মেজদাদার কোনো চিঠিতে ছিল তিনি "কর্ম্মক্ষেত্রে গলবদ্ধরজ্জু" হইয়া খাটিয়া মরিতেন—সেই স্থানের কয়েকটি বাক্য লইয়া পিতা আমাকে তাহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। আমি যেরূপ অর্থ করিয়াছিলাম তাহা তাঁহার মনোনীত হয় নাই—তিনি অন্য অর্থ করিলেন। কিন্তু আমার এমন ধৃষ্টতা ছিল যে সে অর্থ আমি স্বীকার করিতে চাহিলাম না। তাহা লইয়া অনেকক্ষণ তাঁহার সঙ্গে তর্ক করিয়াছিলাম। আর কেহ হইলে নিশ্চয় আমাকে ধমক দিয়া নিরস্ত করিয়া দিতেন কিন্তু তিনি ধৈর্য্যের সঙ্গে আমার সমস্ত প্রতিবাদ সহ্য করিয়া আমাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

তিনি আমার সঙ্গে অনেক কৌতুকের গল্প করিতেন। তাঁহার কাছ হইতে সেকালের বড়োমানুষীর অনেক কথা শুনিতাম। ঢাকাই কাপড়ের পাড় তাহাদের গায়ে কর্কশ ঠেকিত বলিয়া তখনকার সৌখীন লোকেরা পাড় ছিঁড়িয়া ফেলিয়া কাপড় পরিত—এই সব গল্প তাঁহার কাছে শুনিয়াছি। গয়লা দুধে জল দিত বলিয়া দুধ পরিদর্শনের জন্য ভৃত্য নিযুক্ত হইল, পুনশ্চ তাহার কার্য্যপরিদর্শনের জন্য দ্বিতীয় পরিদর্শক

নিযুক্ত হইল। এইরূপে পরিদর্শকের সংখ্যা যতই বাড়িয়া চলিল দুধের রঙও ততোই ঘোলা এবং ক্রমশ কাকচক্ষুর মতো স্বচ্ছনীল হইয়া উঠিতে লাগিল—এবং কৈফিয়ৎ দিবার কালে গয়লা বাবুকে জানাইল, পরিদর্শক যদি আরো বাড়ানো হয় তবে অগত্যা দুধের মধ্যে শামুক ঝিনুক ও চিংড়িমাছের প্রাদুর্ভাব হইবে। এই গল্প তাঁহারই মুখে প্রথম শুনিয়া খুব আমোদ পাইয়াছি।

এমন করিয়া কয়েক মাস কাটিলে পর পিতৃদেব তাঁহার অনুচর কিশোরী চাটুর্য্যের সঙ্গে আমাকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলেন।

প্রত্যাবর্ত্তন

পূর্ব্বে যে শাসনের মধ্যে সঙ্কুচিত হইয়া ছিলাম হিমালয়ে যাইবার সময়ে তাহা একেবারে ভাঙিয়া গেল। যখন ফিরিলাম তখন আমার অধিকার প্রশস্ত হইয়া গেছে। যে লোকটা চোখেচোখে থাকে সে আর চোখেই পড়ে না; দৃষ্টি-ক্ষেত্র হইতে একবার দূরে গিয়া ফিরিয়া আসিয়া তবেই এবার আমি বাড়ির লোকের চোখে পড়িলাম।

ফিরিবার সময়ে রেলের পথেই আমার ভাগ্যে আদর সুরু

হইল। মাথায় এক জরির টুপি পরিয়া আমি একলা বালক ভ্রমণ করিতেছিলাম—সঙ্গে কেবল একজন ভৃত্য ছিল—স্বাস্থ্যের প্রাচুর্য্যে শরীর পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। পথে যেখানে যত সাহেবমেম গাড়িতে উঠিত আমাকে নাড়াচাড়া না করিয়া ছাড়িত না।

বাড়িতে যখন আসিলাম তখন কেবল যে প্রবাস হইতে ফিরিলাম তাহা নহে—এতকাল বাড়িতে থাকিয়াই যে নির্ব্বাসনে ছিলাম সেই নির্ব্বাসন হইতে বাড়ির ভিতরে আসিয়া পৌঁছিলাম। অন্তঃপুরের বাধা ঘুচিয়া গেল, চাকরদের ঘরে আমাকে কুলাইল না। মায়ের ঘরের সভায় খুব একটা বড়ো আসন দখল করিলাম। তখন আমাদের বাড়ির যিনি কনিষ্ঠ বধূ ছিলেন তাঁহার কাছ হইতে প্রচুর স্নেহ ও আদর পাইলাম।

ছোটবেলায় মেয়েদের স্নেহযত্ন মানুষ না যাচিয়াই পাইয়া থাকে। আলো বাতাসে তাহার যেমন দরকার এই মেয়েদের আদরও তাহার পক্ষে তেমনি আবশ্যক। কিন্তু আলো বাতাস পাইতেছি বলিয়া কেহ বিশেষভাবে অনুভব করে-না—মেয়েদের যত্নসম্বন্ধেও শিশুদের সেইরূপ কিছুই না ভাবাটাই স্বাভাবিক। বরঞ্চ শিশুরা এই প্রকার যত্নের জাল হইতে কাটিয়া বাহির হইয়া পড়িবার জন্যই ছটফট করে। কিন্তু যখনকার যেটি সহজপ্রাপ্য তখন সেটি না জুটিলে মানুষ কাঙাল হইয়া দাঁড়ায়। আমার সেই দশা ঘটিল। ছেলেবেলায় চাকরদের শাসনে বাহিরের ঘরে মানুষ হইতে

হইতে হঠাৎ এক সময়ে মেয়েদের অপর্য্যাপ্ত স্নেহ পাইয়া সে জিনিষটাকে ভুলিয়া থাকিতে পারিতাম না। শিশুবয়সে অন্তঃপুর যখন আমাদের কাছে দূরে থাকিত তখন মনে মনে সেইখানেই আপনার কল্পলোক সৃজন করিয়াছিলাম। যে জায়গাটাকে ভাষায় বলিয়া থাকে অবরোধ সেইখানেই সকল বন্ধনের অবসান দেখিতাম। মনে করিতাম, ওখানে ইস্কুল নাই, মাষ্টার নাই, জোর করিয়া কেহ কাহাকেও কিছুতে প্রবৃত্ত করায় না—ওখানকার নিভৃত অবকাশ অত্যন্ত রহস্যময়—ওখানে কারো কাছে সমস্তদিনের সময়ের হিসাব-নিকাশ করিতে হয় না, খেলাধূলা সমস্ত আপন ইচ্ছামতো। বিশেষত দেখিতাম ছোড়দিদি আমাদের সঙ্গে সেই একই নীলকমল পণ্ডিত মহাশয়দের কাছে পড়িতেন কিন্তু পড়া করিলেও তাঁহার সম্বন্ধে যেমন বিধান, না করিলেও সেইরূপ। দশটার সময় আমরা তাড়াতাড়ি খাইয়া ইস্কুল-যাইবার জন্য ভালমানুষের মতো প্রস্তুত হইতাম—তিনি বেণী দোলাইয়া দিব্য নিশ্চিন্তমনে বাড়ির ভিতরদিকে চলিয়া যাইতেন; দেখিয়া মনটা বিকল হইত। তাহার পরে গলায় সোনার হারটি পরিয়া বাড়িতে যখন নববধূ আসিলেন তখন অন্তঃপুরের রহস্য আরো ঘনীভূত হইয়া উঠিল। যিনি বাহির হইতে আসিয়াছেন অথচ যিনি ঘরের, যাঁহাকে কিছুই জানি না অথচ যিনি আপনার, তাঁহার সঙ্গে ভাব করিয়া লইতে ভারি ইচ্ছা করিত। কিন্তু কোনো সুযোগে কাছে গিয়া পৌঁছিতে পারিলে ছোড়দিদি তাড়া দিয়া বলিতেন—'এখানে তোমরা

কী ক'র্‌তে এসেছ, যাও বাইরে যাও',—তখন একে নৈরাশ্য তাহাতে অপমান, দু-ই মনে বড়ো বাজিত। তারপরে আবার তাঁহাদের আলমারিতে শাসির পাল্লার মধ্য দিয়া সাজানো দেখিতে পাইতাম, কাঁচের এবং চীনামাটির কত দুর্ল্ভ সামগ্রী—তাহার কত রঙ এবং কত সজ্জা! আমরা কোনোদিন তাহা স্পর্শ করিবার যোগ্য ছিলাম না—কখনো তাহা চাহিতেও সাহস করিতাম না। কিন্তু এই সকল দুষ্প্রাপ্য সুন্দর জিনিষগুলি অন্তঃপুরের দুর্ল্ভতাকে আরো কেমন রঙিন করিয়া তুলিত।

এমনি করিয়া তো দূরে দূরে প্রতিহত হইয়া চিরদিন কাটিয়াছে। বাহিরের প্রকৃতি যেমন আমার কাছ হইতে দূরে ছিল, ঘরের অন্তঃপুর ঠিক তেমনিই। সেইজন্য যখন তাহার যেটুকু দেখিতাম আমার চোখে যেন ছবির মতো পড়িত। রাত্রি নটার পর অঘোর মাষ্টারের কাছে পড়া শেষ করিয়া বাড়ির ভিতরে শয়ন করিতে চলিয়াছি—খড়খড়ে দেওয়া লম্বা বারান্দাটাতে মিট্‌মিটে লণ্ঠন জ্বলিতেছে ;—সেই বারান্দা পার হইয়া গোটাচার পাঁচ অন্ধকার সিঁড়ির ধাপ নামিরা একটি উঠানঘেরা অন্তঃপুরের বারান্দায় আসিয়া প্রবেশ করিয়াছি,—বারান্দার পশ্চিমভাগে পূর্ব্বআকাশ হইতে বাঁকা হইয়া জ্যোৎস্নার আলো আসিয়া পড়িয়াছে—বারান্দার অপর অংশগুলি অন্ধকার—সেই একটুখানি জ্যোৎস্নায় বাড়ির দাসীরা পাশাপাশি পা মেলিয়া বসিয়া উরুর উপর প্রদীপের সলিতা পাকাইতেছে এবং মৃদুস্বরে আপনাদের দেশের কথা

বলাবলি করিতেছে এমন কত ছবি মনের মধ্যে একেবারে আঁকা হইয়া রহিয়াছে। তারপরে রাত্রে আহার সারিয়া বাহিরের বারান্দায় জল দিয়া পা ধুইয়া একটা মস্ত বিছানায় আমরা তিনজনে শুইয়া পড়িতাম—শঙ্করী কিম্বা তিনকড়ি আসিয়া শিয়রের কাছে বসিয়া তেপান্তর মাঠের উপর দিয়া রাজপুত্রের ভ্রমণের কথা বলিত—সে কাহিনী শেষ হইয়া গেলে শয্যাতল নীরব হইয়া যাইত;—দেয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া শুইয়া ক্ষীণালোকে দেখিতাম দেয়ালের উপর হইতে মাঝে মাঝে চুনকাম খসিয়া গিয়া কালোয় সাদায় নানা-প্রকারের রেখাপাত হইয়াছে; সেই রেখাগুলি হইতে আমি মনে মনে বহুবিধ অদ্ভুত ছবি উদ্ভাবন করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িতাম,—তারপরে অর্দ্ধরাত্রে কোনো কোনো দিন আধ-ঘুমে শুনিতে পাইতাম, অতি বৃদ্ধ স্বরূপ সর্দ্দার উচ্চস্বরে হাঁক দিতে দিতে এক বারান্দা হইতে আর এক বারান্দায় চলিয়া যাইতেছে।

সেই অল্পপরিচিত কল্পনাজড়িত অন্তঃপুরে একদিন বহু-দিনের প্রত্যাশিত আদর পাইলাম। যাহা প্রতিদিন পরিমিতরূপে পাইতে পাইতে সহজ হইয়া যাইত তাহাই হঠাৎ একদিনে বাকিবকেয়াসমেত পাইয়া যে বেশ ভালো করিয়া তাহা বহন করিতে পারিয়াছিলাম তাহা বলিতে পারি না।

ক্ষুদ্র ভ্রমণকারী বাড়ি ফিরিয়া কিছুদিন ঘরেঘরে কেবলি ভ্রমণের গল্প বলিয়া বেড়াইতে লাগিল। বারবার বলিতে-

বলিতে কল্পনার সংঘর্ষে ক্রমেই তাহা এত অত্যন্ত ঢিলা হইতে লাগিল যে, মূলবৃত্তান্তের সঙ্গে তাহার খাপ খাওয়া অসম্ভব হইয়া উঠিল। হায়, সকল জিনিষের মতই গল্পও পুরাতন হয়, ম্লান হইয়া যায়, যে গল্প বলে তাহার গৌরবের পুঁজি ক্রমেই ক্ষীণ হইয়া আসিতে থাকে। এমনি করিয়া পুরাতন গল্পের উজ্জ্বলতা যতই কমিয়া আসে ততই তাহাতে এক এক পোঁচ করিয়া নূতন রং লাগাইতে হয়।

পাহাড় হইতে ফিরিয়া আসার পর ছাদের উপরে মাতার বায়ুসেবনসভায় আমিই প্রধান বক্তার পদ লাভ করিয়াছিলাম। মার কাছে যশস্বী হইবার প্রলোভন ত্যাগকরা কঠিন এবং যশ লাভকরাটাও অত্যন্ত দুরূহ নহে।

নর্ম্মালস্কুলে পড়িবার সময় যেদিন কোনো একটি শিশুপাঠে প্রথম দেখা গেল সূর্য্য পৃথিবীর চেয়ে চৌদ্দলক্ষগুণে বড়ো সেদিন মাতার সভায় এই সত্যটাকে প্রকাশ করিয়াছিলাম। ইহাতে প্রমাণ হইয়াছিল যাহাকে দেখিতে ছোটো সেও হয়তো নিতান্ত কম বড়ো নয়। আমাদের পাঠ্যব্যাকরণে কাব্যালঙ্কারঅংশে যে সকল কবিতা উদাহৃত ছিল তাহাই মুখস্থ করিয়া মাকে বিস্মিত করিতাম। তাহার একটা আজও মনে আছে।

ওরে আমার মাছি!
আহা কী নম্রতা ধর, এসে হাত জোড় কর,
কিন্তু কেন বারি কর তীক্ষ্ণ শুঁড়গাছি!

সম্প্রতি প্রক্‌টরের গ্রন্থ হইতে গ্রহতারাসম্বন্ধে অল্প যে

একটু জ্ঞানলাভ করিয়াছিলাম তাহাও সেই দক্ষিণবায়ুবীজিত সান্ধ্য-সমিতির মধ্যে বিবৃত করিতে লাগিলাম।

আমার পিতার অনুচর কিশোরীচাটুর্য্যে এককালে পাঁচালির দলের গায়ক ছিল। সে আমাকে পাহাড়ে থাকিতে প্রায় বলিত—আহা দাদাজি, তোমাকে যদি পাইতাম তবে পাঁচালির দল এমন জমাইতে পারিতাম সে আর কী বলিব! শুনিয়া আমার ভারি লোভ হইত—পাঁচালির দলে ভিড়িয়া দেশদেশান্তরে গান গাহিয়া বেড়ানোটা মহা একটা সৌভাগ্য বলিয়া বোধ হইত। সেই কিশোরীর কাছে অনেকগুলি পাঁচালির গান শিখিয়াছিলাম "ওরে ভাই জানকীরে দিয়ে এস বন," "প্রাণত অস্ত হ'ল আমার কমল-আঁখি," "রাঙা জবায় কী শোভা পায় পায়" "কাতরে রেখো রাঙা পায়, মা অভয়ে," "ভাব শ্রীকান্ত নরকান্তকারীরে একান্ত কৃতান্ত ভয়ান্ত হবে," এই গানগুলিতে আমাদের আসর যেমন জমিয়া উঠিত এমন সূর্য্যের অগ্নিউচ্ছ্বাস বা শনির চন্দ্রময়তার আলোচনায় হইত না।

পৃথিবীসুদ্ধ লোকে কৃত্তিবাসের বাংলা রামায়ণ পড়িয়া জীবন কাটায় আর আমি পিতার কাছে স্বয়ং মহর্ষি বাল্মীকির স্বরচিত অনুষ্টুভ ছন্দের রামায়ণ পড়িয়া আসিয়াছি এই খবরটাতে মাকে সকলের চেয়ে বেশি বিচলিত করিতে পারিয়াছিলাম। তিনি অত্যন্ত খুসি হইয়া বলিলেন "আচ্ছা, বাছা, সেই রামায়ণ আমাদের একটু পড়িয়া শোনা দেখি।"

হায়, একে ঋজুপাঠের সামান্য উদ্ধৃত অংশ, তাহার মধ্যে

আবার আমার পড়া অতি অল্পই, তাহাও পড়িতে গিয়া দেখি মাঝেমাঝে অনেকখানি অংশ বিস্মৃতিবশত অস্পষ্ট হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু যে মা পুত্রের বিদ্যাবুদ্ধির অসামান্যতা অনুভব করিয়া আনন্দসম্ভোগ করিবার জন্য উৎসুক হইয়া বসিয়াছেন তাঁহাকে "ভুলিয়া গেছি" বলিবার মতো শক্তি আমার ছিল না। সুতরাং ঋজুপাঠ হইতে যেটুকু পড়িয়া গেলাম তাহার মধ্যে বাল্মীকির রচনা ও আমার ব্যাখ্যার মধ্যে অনেকটা পরিমাণে অসামঞ্জস্য রহিয়া গেল। স্বর্গ হইতে করুণহৃদয় মহর্ষি বাল্মীকি নিশ্চয়ই জননীর নিকট খ্যাতি-প্রত্যাশী অর্ব্বাচীন বালকের সেই অপরাধ সকৌতুকস্নেহহাস্যে মার্জ্জনা করিয়াছেন কিন্তু দর্পহারী মধুসূদন আমাকে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি দিলেন না।

মা মনে করিলেন আমার দ্বারা অসাধ্যসাধন হইয়াছে, তাই আর সকলকে বিস্মিত করিয়া দিবার অভিপ্রায়ে তিনি কহিলেন "একবার দ্বিজেন্দ্রকে শোনা দেখি।" তখন মনে-মনে সমূহ বিপদ গণিয়া প্রচুর আপত্তি করিলাম। মা কোনোমতেই শুনিলেন না। বড়দাদাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। বড়দাদা আসিতেই কহিলেন "রবি কেমন বাল্মীকির রামায়ণ পড়িতে শিখিয়াছে একবার শোন না।" পড়িতেই হইল। দয়ালু মধুসূদন তাঁহার দর্পহারিত্বের একটু আভাস-মাত্র দিয়া আমাকে এ যাত্রা ছাড়িয়া দিলেন। বড়দাদা বোধ হয় কোনো একটা রচনায় নিযুক্ত ছিলেন—বাংলা ব্যাখ্যা শুনিবার জন্য তিনি কোনো আগ্রহ প্রকাশ করিলেন

না। গুটিকয়েক শ্লোক শুনিয়াই "বেশ হইয়াছে" বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

ইহার পর ইস্কুলে যাওয়া আমার পক্ষে পূর্ব্বের চেয়ে আরো অনেক কঠিন হইয়া উঠিল। নানা ছল করিয়া বেঙ্গল একাডেমি হইতে পলাইতে সুরু করিলাম। সেণ্টজেবিয়ার্সে আমাদের ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হইল, সেখানেও কোনো ফল হইল না।

দাদারা মাঝেমাঝে একআধবার চেষ্টা করিয়া আমার আশা একেবারে ত্যাগ করিলেন। আমাকে ভৎর্সনা করাও ছাড়িয়া দিলেন। একদিন বড়োদিদি কহিলেন, আমরা সকলেই আশা করিয়াছিলাম বড়ো হইলে রবি মানুষের মতো হইবে কিন্তু তাহার আশাই সকলের চেয়ে নষ্ট হইয়া গেল। আমি বেশ বুঝিতাম ভদ্রসমাজের বাজারে আমার দর কমিয়া-যাইতেছে কিন্তু তবু যে-বিদ্যালয় চারিদিকের জীবন ও সৌন্দর্য্যের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন জেলখানা ও হাঁসপাতালজাতীয় একটা নির্ম্মম বিভীষিকা, তাহার নিত্যআবর্ত্তিত ঘানির সঙ্গে কোনমতেই আপনাকে জুড়িতে পারিলাম না।

সেণ্টজেবিয়ার্সের একটি পবিত্রস্মৃতি আজ পর্য্যন্ত আমার মনের মধ্যে অম্লান হইয়া রহিয়াছে—তাহা সেখানকার অধ্যাপকের স্মৃতি। আমাদের সকল অধ্যাপক সমান ছিলেন না। বিশেষভাবে যে দুইএকজন আমার ক্লাসের শিক্ষক ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে ভগবদ্ভক্তির গম্ভীর নম্রতা আমি উপলব্ধি করি নাই। বরঞ্চ সাধারণত শিক্ষকেরা যেমন শিক্ষা-

দানের কল হইয়া উঠিয়া বালকদিগকে হৃদয়ের দিকে পীড়িত করিয়া থাকেন, তাঁহারা তাহার চেয়ে বেশি উপরে উঠিতে পারেন নাই। একে তো শিক্ষার কল একটা মস্ত কল, তাহার উপরে, মানুষের হৃদয়প্রকৃতিকে শুষ্ক করিয়া পিশিয়া ফেলিবার পক্ষে ধর্ম্মের বাহ্যঅনুষ্ঠানের মতো জাঁতা জগতে আর নাই। যাহারা ধর্ম্মসাধনার সেই বাহিরের দিকেই আটকা পড়িয়াছে তাহারা যদি আবার শিক্ষকতার কলের চাকায় প্রত্যহ পাক খাইতে থাকে তবে উপাদেয় জিনিষ তৈরি হয় না,—আমার শিক্ষকদের মধ্যে সেই প্রকার দুই-কলে-ছাঁটা নমুনা বোধ করি ছিল। কিন্তু তবু সেণ্টজেবিয়ার্সের সমস্ত অধ্যাপকদের জীবনের আদর্শকে উচ্চ করিয়া ধরিয়া মনের মধ্যে বিরাজ করিতেছে এমন একটি স্মৃতি আমার আছে। ফাদার ডিপেনেরাণ্ডার সহিত আমাদের যোগ তেমন বেশি ছিল না;—বোধ করি কিছুদিন তিনি আমাদের নিয়মিত শিক্ষকের বদলিরূপে কাজ করিয়াছিলেন। তিনি জাতিতে স্পেনীয় ছিলেন। ইংরেজি উচ্চারণে তাঁহার যথেষ্ট বাধা ছিল। বোধ করি সেই কারণে তাঁহার ক্লাসের শিক্ষায় ছাত্রগণ যথেষ্ট মনোযোগ করিত না। আমার বোধ হইত ছাত্রদের সেই ঔদাসীন্যের ব্যাঘাত তিনি মনের মধ্যে অনুভব করিতেন কিন্তু নম্রভাবে প্রতিদিন তাহা সহ্য করিয়া লইতেন। আমি জানি না কেন, তাঁহার জন্য আমার মনের মধ্যে একটা বেদনা বোধ হইত। তাঁহার মুখশ্রী সুন্দর ছিল না, কিন্তু আমার কাছে তাহার কেমন একটি আকর্ষণ ছিল।

তাঁহাকে দেখিলেই মনে হইত তিনি সর্ব্বদাই আপনার মনের মধ্যে যেন একটি দেবোপাসনা বহন করিতেছেন—অন্তরের বৃহৎ এবং নিবিড় স্তব্ধতায় তাঁহাকে যেন আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। আধঘণ্টা আমাদের কপি লিখিবার সময় ছিল—আমি তখন কলম হাতে লইয়া অন্যমনস্ক হইয়া যাহা-তাহা ভাবিতাম। একদিন ফাদার ডিপেনেরাণ্ডা এই ক্লাসের অধ্যক্ষতা করিতেছিলেন। তিনি প্রত্যেক বেঞ্চির পিছনে পদচারণা করিয়া যাইতেছিলেন। বোধ করি তিনি দুইতিন-বার লক্ষ্য করিয়াছিলেন, আমার কলম সরিতেছে না। এক সময়ে আমার পিছনে থামিয়া দাঁড়াইয়া নত হইয়া আমার পিঠে তিনি হাত রাখিলেন এবং অত্যন্ত সস্নেহস্বরে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,টাগোর,তোমার কি শরীর ভালো নাই ?—বিশেষ কিছুই নহে কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তাঁহার সেই প্রশ্নটি ভুলি নাই। অন্য ছাত্রদের কথা বলিতে পারি না কিন্তু আমি তাঁহার ভিতরকার একটি বৃহৎ মনকে দেখিতে পাইতাম—আজও তাহা স্মরণ করিলে আমি যেন নিভৃত নিস্তব্ধ দেব-মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিবার অধিকার পাই।

সে সময়ে আর একজন প্রাচীন অধ্যাপক ছিলেন, তাঁহাকে ছাত্রেরা বিশেষ ভালোবাসিত। তাঁহার নাম ফাদার হেন্‌রি। তিনি উপরের ক্লাসে পড়াইতেন, তাঁহাকে আমি ভালো করিয়া জানিতাম না। তাঁহার সম্বন্ধে একটি কথা আমার মনে আছে, সেটি উল্লেখযোগ্য। তিনি বাংলা জানিতেন। তিনি নীরদ নামক তাঁহার ক্লাসের একটি ছাত্রকে

জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তোমার নামের ব্যুৎপত্তি কী? নিজের সম্বন্ধে নীরদ চিরকাল সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত ছিল—কোনো-দিন নামের ব্যুৎপত্তি লইয়া সে কিছুমাত্র উদ্বেগ অনুভব করে নাই—সুতরাং এরূপ প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য সে কিছুমাত্র প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু অভিধানে এত বড়ো বড়ো অপরিচিত কথা থাকিতে নিজের নামটা সম্বন্ধে ঠকিয়া যাওয়া যেন নিজের গাড়ির তলে চাপাপড়ার মতো দুর্ঘটনা—নীরু তাই অম্লানবদনে তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল—নী ছিল রোদ, নীরদ—অর্থাৎ যাহা উঠিলে রৌদ্র থাকে না, তাহাই নীরদ।

ঘরের পড়া

আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশের পুত্র জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় বাড়িতে আমাদের শিক্ষক ছিলেন। ইস্কুলের পড়ায় যখন তিনি কোনোমতেই আমাকে বাঁধিতে পারিলেন না, তখন হাল ছাড়িয়া দিয়া অন্য পথ ধরিলেন। আমাকে বাংলায় অর্থ করিয়া কুমারসম্ভব পড়াইতে লাগিলেন। তাহা ছাড়া খানিকটা করিয়া ম্যাক্‌বেথ আমাকে বাংলায় মানে করিয়া বলিতেন এবং যতক্ষণ তাহা বাংলা ছন্দে আমি তর্জ্জমা না করিতাম ততক্ষণ ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিতেন। সমস্ত বইটার

অনুবাদ শেষ হইয়া গিয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে সেটি হারাইয়া যাওয়াতে কর্ম্মফলের বোঝা ঐ পরিমাণে হাল্কা হইয়াছে।

রামসর্ব্বস্ব পণ্ডিতমশায়ের প্রতি আমাদের সংস্কৃত অধ্যাপনার ভার ছিল। অনিচ্ছুক ছাত্রকে ব্যাকরণ শিখাইবার দুঃসাধ্যচেষ্টায় ভঙ্গ দিয়া তিনি আমাকে অর্থ করিয়া করিয়া শকুন্তলা পড়াইতেন। তিনি একদিন আমার ম্যাক্‌বেথের তর্জ্জমা বিদ্যাসাগর মহাশয়কে শুনাইতে হইবে বলিয়া আমাকে তাঁহার কাছে লইয়া গেলেন। তখন তাঁহার কাছে রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বসিয়া ছিলেন। পুস্তকে ভরা তাঁহার ঘরের মধ্যে ঢুকিতে আমার বুক দুরুদুরু করিতেছিল—তাঁহার মুখচ্ছবি দেখিয়া যে আমার সাহসবৃদ্ধি হইল তাহা বলিতে পারি না। ইহার পূর্ব্বে বিদ্যাসাগরের মতো শ্রোতা আমি তো পাই নাই—অতএব এখান-হইতে খ্যাতি পাইবার লোভটা মনের মধ্যে খুব প্রবল ছিল। বোধ করি কিছু উৎসাহ সঞ্চয় করিয়া ফিরিয়াছিলাম। মনে আছে রাজকৃষ্ণবাবু আমাকে উপদেশ দিয়াছিলেন, নাটকের অন্যান্য অংশের অপেক্ষা ডাকিনীর উক্তিগুলির ভাষা ও ছন্দের কিছু অদ্ভুত বিশেষত্ব থাকা উচিত।

আমার বাল্যকালে বাংলাসাহিত্যের কলেবর কৃশ ছিল। বোধকরি তখন পাঠ্য অপাঠ্য বাংলা বই যে-কটা ছিল সমস্তই আমি শেষ করিয়াছিলাম। তখন ছেলেদের এবং বড়োদের বইয়ের মধ্যে বিশেষ একটা পার্থক্য ঘটে নাই। আমাদের পক্ষে তাহাতে বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। এখনকার দিনে

শিশুদের জন্য সাহিত্যরসে প্রভূত পরিমাণে জল মিশাইয়া যে সকল ছেলেভুলানো বই লেখা হয় তাহাতে শিশুদিগকে নিতান্তই শিশু বলিয়া মনে করা হয়। তাহাদিগকে মানুষ বলিয়া গণ্য করা হয় না। ছেলেরা যে-বই পড়িবে তাহার কিছু বুঝিবে এবং কিছু বুঝিবে না এইরূপ বিধান থাকা চাই। আমরা ছেলেবেলায় একধার হইতে বই পড়িয়া যাইতাম—যাহা বুঝিতাম এবং যাহা বুঝিতাম না দুই-ই আমাদের মনের উপর কাজ করিয়া যাইত। সংসারটাও ছেলেদের উপর ঠিক তেমনই করিয়া কাজ করে। ইহার যতটুকু তাহারা বোঝে ততটুকু তাহারা পায়, যাহা বোঝে না তাহাও তাহাদিগকে সামনের দিকে ঠেলে।

দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের জামাইবারিক প্রহসন যখন বাহির হইয়াছিল তখন সে বই পড়িবার বয়স আমাদের হয় নাই। আমার কোনো একজন দূর সম্পর্কীয়া আত্মীয়া সেই বইখানি পড়িতেছিলেন। অনেক অনুনয় করিয়াও তাঁহার কাছ হইতে উহা আদায় করিতে পারিলাম না। সেই বই তিনি বাক্সে চাবিবন্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। নিষেধের বাধায় আমার উৎসাহ আরও বাড়িয়া উঠিল, আমি তাহাকে শাসাইলাম, এ বই আমি পড়িবই।

মধ্যাহ্নে তিনি গ্রাবু খেলিতেছিলেন—আঁচলে বাঁধা চাবির গোচ্ছা তাঁর পিঠে ঝুলিতেছিল। তাসখেলায় আমার কোনোদিন মন যায় নাই, তাহা আমার কাছে বিশেষ বিরক্তি-কর বোধ হইত। কিন্তু সেদিন আমার ব্যবহারে তাহা

অনুমান করা কঠিন ছিল। আমি ছবির মতো স্তব্ধ হইয়া বসিয়াছিলাম। কোনো এক পক্ষে আসন্ন ছক্কাপাঞ্জার সম্ভাবনায় খেলা যখন খুব জমিয়া উঠিয়াছে এমন সময় আমি আস্তে আস্তে আঁচল হইতে চাবি খুলিয়া লইবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু এ কার্য্যে অঙ্গুলির দক্ষতা ছিল না, তাহার উপর আগ্রহেরও চাঞ্চল্য ছিল—ধরা পড়িয়া গেলাম। যাঁহার চাবি তিনি হাসিয়া পিঠ হইতে আঁচল নামাইয়া চাবি কোলের উপর রাখিয়া আবার খেলায় মন দিলেন।

এখন একটা উপায় ঠাওরাইলাম। আমার এই আত্মীয়ার দোক্তা খাওয়া অভ্যাস ছিল। আমি কোথাও হইতে একটি পাত্রে পানদোক্তা সংগ্রহ করিয়া তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া দিলাম। যেমনটি আশা করিয়াছিলাম তাহাই ঘটিল। চিক ফেলিবার জন্য তাঁহাকে উঠিতে হইল ;—চাবিসমেত আঁচল কোল হইতে ভ্রষ্ট হইয়া নীচে পড়িল এবং অভ্যাসমতো সেটা তখনি তুলিয়া তিনি পিঠের উপর ফেলিলেন। এবার চাবি চুরি গেল এবং চোর ধরা পড়িল না। বই পড়া হইল। তাহার পরে চাবি এবং বই স্বত্বাধিকারীর হাতে ফিরাইয়া দিয়া চৌর্য্যাপরাধের আইনের অধিকার হইতে আপনাকে রক্ষা করিলাম। আমার আত্মীয়া ভৎসনা করিবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু তাহা যথোচিত কঠোর হইল না ; তিনি মনে মনে হাসিতেছিলেন—আমারও সেই দশা।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় "বিবিধার্থ সংগ্রহ" বলিয়া একটি ছবিওয়ালা মাসিকপত্র বাহির করিতেন। তাহারি

বাঁধানো একভাগ সেজদাদার আলমারির মধ্যে ছিল। সেটি আমি সংগ্রহ করিয়াছিলাম। বারবার করিয়া সেই বইখানি পড়িবার খুসি আজও আমার মনে পড়ে। সেই বড়ো চৌকা বইটাকে বুকে লইয়া আমাদের শোবার ঘরের তক্তা-পোষের উপর চীৎ হইয়া পড়িয়া নর্হাল তিমি মৎস্যের বিবরণ, কাজির বিচারের কৌতুকজনক গল্প, কৃষ্ণকুমারীর উপন্যাস পড়িতে কত ছুটির দিনের মধ্যাহ্ন কাটিয়াছে।

এই ধরণের কাগজ একখানিও এখন নাই কেন? এক-দিকে বিজ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞান, পুরাতত্ত্ব অন্যদিকে প্রচুর গল্পকবিতা ও তুচ্ছ ভ্রমণকাহিনী দিয়া এখনকার কাগজ ভর্ত্তি করা হয়। সর্ব্বসাধারণের দিব্য আরামে পড়িবার একটি মাঝারি শ্রেণীর কাগজ দেখিতে পাই না। বিলাতে চেম্বার্স জার্নাল, কাস্‌লস্‌ ম্যাগাজিন, ষ্ট্র্যাণ্ড ম্যাজিন প্রভৃতি অধিক সংখ্যক পত্রই সর্ব্বসাধারণের সেবায় নিযুক্ত। তাহারা জ্ঞানভাণ্ডার হইতে সমস্ত দেশকে নিয়মিত মোটা ভাত মোটা কাপড় যোগাই-তেছে, এই মোটা ভাত মোটা কাপড়ই বেশির ভাগ লোকের বেশি মাত্রায় কাজে লাগে।

বাল্যকালে আর একটি ছোটো কাগজের পরিচয় লাভ করিয়াছিলাম তাহার নাম অবোধবন্ধু। ইহার আবাঁধা খণ্ডগুলি বড়োদাদার আলমারি হইতে বাহির করিয়া তাঁহারই দক্ষিণদিকের ঘরে খোলা দরজার কাছে বসিয়া বসিয়া কত-দিন পড়িয়াছি। এই কাগজেই বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর কবিতা প্রথম পড়িয়াছিলাম। তখনকার দিনের সকল

কবিতার মধ্যে তাহাই আমার সব চেয়ে মন হরণ করিয়াছিল। তাঁহার সেই সব কবিতা সরল বাঁশির সুরে আমার মনের মধ্যে মাঠের এবং বনের গান বাজাইয়া তুলিত। এই অবোধবন্ধু কাগজেই বিলাতি পৌলবর্জ্জিনী গল্পের সরস বাংলা অনুবাদ পড়িয়া কত চোখের জল ফেলিয়াছি তাহার ঠিকানা নাই। আহা সে কোন্ সাগরের তীর! সে কোন্ সমুদ্র-সমীর-কম্পিত নারিকেলের বন! ছাগলচরা সে কোন্ পাহাড়ের উপত্যকা! কলিকাতা সহরের দক্ষিণের বারান্দায় দুপুরের রৌদ্রে সে কী মধুর মরীচিকা বিস্তীর্ণ হইত! আর সেই মাথায় রঙীন রুমালপরা বর্জ্জিনীর সঙ্গে সেই নির্জ্জন দ্বীপের শ্যামল বনপথে একটি বাঙালী বালকের কী প্রেমই জমিয়াছিল।

অবশেষে বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন আসিয়া বাঙালীর হৃদয় একেবারে লুঠ করিয়া লইল। একে তো তাহার জন্য মাসান্তের প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতাম, তাহার পরে বড়দলে পড়ার শেষের জন্য অপেক্ষা করা আরো বেশি দুঃসহ হইত। বিষবৃক্ষ চন্দ্রশেখর এখন যে খুসি সেই অনায়াসে একেবারে একগ্রাসে পড়িয়া ফেলিতে পারে কিন্তু আমরা যেমন করিয়া মাসের পর মাস, কামনা করিয়া, অপেক্ষা করিয়া, অল্পকালের পড়াকে সুদীর্ঘকালের অবকাশের দ্বারা মনের মধ্যে অনুরণিত করিয়া, তৃপ্তির সঙ্গে অতৃপ্তি, ভোগের সঙ্গে কৌতূহলকে অনেক দিন ধরিয়া গাঁথিয়া গাঁথিয়া পড়িতে পাইয়াছি, তেমন করিয়া পড়িবার সুযোগ আর কেহ পাইবে না।

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র ও অক্ষয় সরকার মহাশয়ের প্রাচীনকাব্যসংগ্রহ সে সময়ে আমার কাছে একটি লোভের সামগ্রী হইয়াছিল। গুরুজনেরা ইহার গ্রাহক ছিলেন কিন্তু নিয়মিত পাঠক ছিলেন না। সুতরাং এগুলি জড় করিয়া আনিতে আমাকে বেশি কষ্ট পাইতে হইত না। বিদ্যাপতির দুর্ব্বোধ বিকৃত মৈথিলী পদগুলি অস্পষ্ট বলিয়াই বেশি করিয়া আমার মনোযোগ টানিত। আমি টীকার উপর নির্ভর না করিয়া নিজে বুঝিবার চেষ্টা করিতাম। বিশেষ কোনো দুরূহ শব্দ যেখানে যতবার ব্যবহৃত হইয়াছে সমস্ত আমি একটি ছোটো বাঁধানো খাতায় নোট করিয়া রাখিতাম। ব্যাকরণের বিশেষত্বগুলিও আমার বুদ্ধি-অনুসারে যথাসাধ্য টুকিয়া রাখিয়াছিলাম।

বাড়ির আবহাওয়া

ছেলেবেলায় আমার একটা মস্ত সুযোগ এই ছিল যে, বাড়িতে দিনরাত্রি সাহিত্যের হাওয়া বহিত। মনে পড়ে খুব যখন শিশু ছিলাম বারান্দার রেলিং ধরিয়া একএকদিন সন্ধ্যার সময় চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতাম। সম্মুখের বৈঠকখানা বাড়িতে আলো জ্বলিতেছে, লোক চলিতেছে,

দ্বারে বড়ো বড়ো গাড়ি আসিয়া দাঁড়াইতেছে। কী হইতেছে ভাল বুঝিতাম না কেবল অন্ধকারে দাঁড়াইয়া সেই আলোক-মালার দিকে তাকাইয়া থাকিতাম। মাঝখানে ব্যবধান যদিও বেশি ছিল না তবু সে আমার শিশুজগৎ হইতে বহু-দূরের আলো। আমার খুড়তুত ভাই গণেন্দ্র দাদা তখন রামনারায়ণ তর্করত্নকে দিয়া নবনাটক লিখাইয়া বাড়িতে তাহার অভিনয় করাইতেছেন। সাহিত্য এবং ললিত কলায় তাঁহাদের উৎসাহের সীমা ছিল না। বাংলার আধুনিক যুগকে যেন তাঁহারা সকল দিক দিয়াই উদ্বোধিত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। বেশে ভূষায় কাব্যে গানে চিত্রে নাট্যে ধর্ম্মে স্বাদেশিকতায় সকল বিষয়েই তাঁহাদের মনে একটি সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ জাতীয়তার আদর্শ জাগিয়া উঠিতেছিল। পৃথিবীর সকল দেশের ইতিহাসচর্চ্চায় গণদাদার অসাধারণ অনুরাগ ছিল। অনেক ইতিহাস তিনি বাংলায় লিখিতে আরম্ভ করিয়া অসমাপ্ত রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচিত বিক্রমোর্ব্বশী নাটকের একটি অনুবাদ অনেক দিন হইল ছাপা হইয়াছিল। তাঁহার রচিত ব্রহ্মসঙ্গীতগুলি এখনো ধর্ম্ম-সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া আছে।

গাও হে তাঁহার নাম
রচিত যাঁর বিশ্বধাম,
দয়ার যাঁর নাহি বিরাম
ঝরে অবিরত ধারে—

বিখ্যাত গানটি তাঁহারই। বাংলায় দেশানুরাগের গান ও

কবিতার প্রথম সূত্রপাত তাঁহারাই করিয়া গিয়াছেন। সে আজ কতদিনের কথা, যখন গণদাদার রচিত "লজ্জায় ভারত-যশ গাহিব কী ক'রে" গানটি হিন্দুমেলায় গাওয়া হইত। যুবাবয়সেই গণদাদার যখন মৃত্যু হয় তখন আমার বয়স নিতান্ত অল্প। কিন্তু তাঁহার সেই সৌম্য গম্ভীর উন্নত গৌর-কান্ত দেহ একবার দেখিলে আর ভুলিবার যো থাকে না। তাঁহার ভারি একটা প্রভাব ছিল। সে প্রভাবটি সামাজিক প্রভাব। তিনি আপনার চারিদিকের সকলকে টানিতে পারিতেন, বাঁধিতে পারিতেন—তাঁহার আকর্ষণের জোরে সংসারের কিছুই যেন ভাঙিয়াচুরিয়া বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়িতে পারিত না।

আমাদের দেশের এক একজন এই রকম মানুষ দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা চরিত্রের একটি বিশেষ শক্তিপ্রভাবে সমস্ত পরিবারের অথবা গ্রামের কেন্দ্রস্থলে অনায়াসে অধিষ্ঠিত হইয়া থাকেন। ইঁহারাই যদি এমন দেশে জন্মিতেন যেখানে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে বাণিজ্যব্যবসায়ে ও নানাবিধ সার্ব্বজনীন কর্ম্মে সর্ব্বদাই বড়ো বড়ো দল বাঁধা চলিতেছে তবে ইঁহারা স্বভাবতই গণনায়ক হইয়া উঠিতে পারিতেন। বহুমানবকে মিলাইয়া এক-একটি প্রতিষ্ঠান রচনা করিয়া তোলা বিশেষ এক প্রকার প্রতিভার কাজ। আমাদের দেশে সেই প্রতিভা কেবল এক একটি বড়ো বড়ো পরিবারের মধ্যে অখ্যাতভাবে আপনার কাজ করিয়া বিলুপ্ত হইয়া যায়। আমার মনে হয় এমন করিয়া শক্তির বিস্তর অপব্যয় ঘটে—এ যেন জ্যোতিষ্কলোক

হইতে নক্ষত্রকে পাড়িয়া তাহার দ্বারা দেশলাই কাঠির কাজ উদ্ধার করিয়া লওয়া।

ইঁহার কনিষ্ঠ ভাই গুণদাদাকে বেশ মনে পড়ে। তিনিও বাড়িটিকে একেবারে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। আত্মীয় বন্ধু আশ্রিত অনুগত অতিথি অভ্যাগতকে তিনি আপনার বিপুল ঔদার্য্যের দ্বারা বেষ্টন করিয়া ধরিয়াছিলেন। তাঁহার দক্ষিণের বারান্দায়, তাঁহার দক্ষিণের বাগানে, পুকুরের বাঁধা ঘাটে মাছ ধরিবার সভায় তিনি মূর্ত্তিমান দাক্ষিণ্যের মতো বিরাজ করিতেন। সৌন্দর্য্যবোধ ও গুণগ্রাহিতায় তাঁহার নধর শরীর-মনটি যেন ঢলঢল করিতে থাকিত। নাট্য কৌতুক আমোদ উৎসবের নানা সংকল্প তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া নব নব বিকাশলাভের চেষ্টা করিত। শৈশবের অনধিকার বশত তাঁহাদের সে সমস্ত উদ্যোগের মধ্যে আমরা সকল সময়ে প্রবেশ করিতে পাইতাম না—কিন্তু উৎসাহের ঢেউ চারিদিক হইতে আসিয়া আমাদের ঔৎসুক্যের উপরে কেবলি ঘা দিতে থাকিত। বেশ মনে পড়ে বড়দাদা একবার কী একটা কিম্ভূত কৌতুকনাট্য (Burlesque) রচনা করিয়াছিলেন—প্রতিদিন মধ্যাহ্নে গুণদাদার বড়ো বৈঠকখানা ঘরে তাহার রিহার্সাল চলিত। আমরা এ বাড়ির বারান্দায় দাঁড়াইয়া খোলা জানালার ভিতর দিয়া অট্টহাস্যের সহিত মিশ্রিত অদ্ভুত গানের কিছু কিছু পদ শুনিতে পাইতাম এবং অক্ষয় মজুমদার মহাশয়ের উদ্দাম নৃত্যেরও কিছু কিছু দেখা যাইত। গানের এক অংশ এখনো মনে আছে—

ও কথা আর বোলোনা আর বোলোনা
বল্‌চ বঁধু কিসের ঝোঁকে—
এ বড়ো হাসির কথা, হাসির কথা
হাস্‌বে লোকে—
হাঃ হাঃ হাঃ হাস্‌বে লোকে।

এত বড়ো হাসির কথাটা যে কী তাহা আজ পর্য্যন্ত জানিতে পারি নাই—কিন্তু এক সময়ে জানিতে পাইব এই আশাতেই মনটা খুব দোলা খাইত।

একটা নিতান্ত সামান্য ঘটনায় আমার প্রতি গুণদাদার স্নেহকে আমি কিরূপ বিশেষভাবে উদ্বোধিত করিয়াছিলাম সে কথা আমার মনে পড়িতেছে। ইস্কুলে আমি কোনোদিন প্রাইজ পাই নাই, একবার কেবল সচ্চরিত্রের পুরস্কার বলিয়া একখানা "ছন্দোমালা" বই পাইয়াছিলাম। আমাদের তিনজনের মধ্যে সত্যই পড়াশুনায় সেরা ছিল। সে কোনো একবার পরীক্ষায় ভালোরূপ পাস করিয়া একটা প্রাইজ পাইয়াছিল। সেদিন ইস্কুল হইতে ফিরিয়া গাড়ি হইতে নামিয়াই দৌড়িয়া গুণদাদাকে খবর দিতে চলিলাম। তিনি বাগানে বসিয়াছিলেন। আমি দূর হইতেই চীৎকার করিয়া ঘোষণা করিলাম, গুণদাদা, সত্য প্রাইজ পাইয়াছে। তিনি হাসিয়া আমাকে কাছে টানিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি প্রাইজ পাও নাই? আমি কহিলাম, না, আমি পাই নাই, সত্য পাইয়াছে। ইহাতে গুণদাদা ভারি খুসি হইলেন। আমি নিজে প্রাইজ না পাওয়া সত্ত্বেও সত্যের প্রাইজ পাওয়া

লইয়া এতো উৎসাহ করিতেছি ইহা তাঁহার কাছে বিশেষ একটা সদ্‌গুণের পরিচয় বলিয়া মনে হইল। তিনি আমার সাম্‌নেই সে কথাটা অন্য লোকের কাছে বলিলেন। এই ব্যাপারের মধ্যে কিছুমাত্র গৌরবের কথা আছে তাহা আমার মনেও ছিল না—হঠাৎ তাঁহার কাছে প্রশংসা পাইয়া আমি বিস্মিত হইয়া গেলাম। এইরূপে আমি প্রাইজ না পাওয়ার প্রাইজ পাইলাম—কিন্তু সেটা ভালো হইল না। আমার তো মনে হয় ছেলেদের দান করা ভালো কিন্তু পুরস্কার দান করা ভালো নহে—ছেলেরা বাহিরের দিকে তাকাইবে, আপনার দিকে তাকাইবে না ইহাই তাহাদের পক্ষে স্বাস্থ্যকর।

মধ্যাহ্নে আহারের পর গুণদাদা এবাড়িতে কাছারি করিতে আসিতেন। কাছারি তাঁহাদের একটা ক্লাবের মতোই ছিল—কাজের সঙ্গে হাস্যালাপের বড়ো বেশি বিচ্ছেদ ছিল না। গুণদাদা কাছারি ঘরে একটা কৌচে হেলান দিয়া বসিতেন—সেই সুযোগে আমি আস্তে আস্তে তাঁহার কোলের কাছে আসিয়া বসিতাম। তিনি প্রায় আমাকে ভারতবর্ষের ইতিহাসের গল্প বলিতেন। ক্লাইভ ভারতবর্ষে ইংরাজরাজত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়া অবশেষে দেশে ফিরিয়া গলায় ক্ষুর দিয়া আত্মহত্যা করিয়াছিলেন একথা তাঁহার কাছে শুনিয়া আমার ভারি আশ্চর্য্য লাগিয়াছিল। একদিকে ভারতবর্ষের নব ইতিহাস তো গড়িয়া উঠিল কিন্তু আর একদিকে মানুষের হৃদয়ের অন্ধকারের মধ্যে এ কী বেদনার রহস্য প্রচ্ছন্ন ছিল!

বাহিরে যখন এমন সফলতা অন্তরে তখন এতো নিষ্ফলতা কেমন করিয়া থাকে! আমি সেদিন অনেক ভাবিয়াছিলাম। এক একদিন গুণদাদা আমার ভাবগতিক দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারিতেন যে আমার পকেটের মধ্যে একটা খাতা লুকানো আছে। একটুখানি প্রশ্রয় পাইবামাত্র খাতাটি তাহার আবরণ হইতে নির্লজ্জভাবে বাহির হইয়া আসিত। বলা বাহুল্য তিনি খুব কঠোর সমালোচক ছিলেন না; এমন কি, তাঁহার অভিমতগুলি বিজ্ঞাপনে ছাপাইলে কাজে লাগিতে পারিত। তবু বেশ মনে পড়ে এক একদিন কবিত্বের মধ্যে ছেলেমানুষীর মাত্রা এতো অতিশয় বেশি থাকিত যে তিনি হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিতেন। ভারতমাতাসম্বন্ধে কী একটা কবিতা লিখিয়াছিলাম। তাহার কোনো একটি ছত্রের প্রান্তে কথাটা ছিল "নিকটে" ঐ শব্দটাকে দূরে পাঠাইবার সামর্থ্য ছিল না, অথচ কোনো মতেই তাহার সঙ্গত মিল খুঁজিয়া পাইলাম না। অগত্যা পরের ছত্রে "শকটে" শব্দটা যোজনা করিয়াছিলাম। সে জায়গায় সহজে শকট আসিবার একেবারেই রাস্তা ছিল না—কিন্তু মিলের দাবী কোনো কৈফিয়তেই কর্ণপাত করে না; কাজেই বিনা কারণেই সে জায়গায় আমাকে শকট উপস্থিত করিতে হইয়াছিল। গুণদাদার প্রবল হাস্যে, ঘোড়াসুদ্ধ শকট যে দুর্গম পথ দিয়া আসিয়াছিল সেই পথ দিয়াই কোথায় অন্তর্ধান করিল এপর্য্যন্ত তাহার আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায় নাই।

বড়োদাদা তখন দক্ষিণের বারান্দায় বিছানা পাতিয়া

সাম্‌নে একটি ছোটো ডেস্ক লইয়া স্বপ্নপ্রয়াণ লিখিতেছিলেন। গুণদাদাও রোজ সকালে আমাদের সেই দক্ষিণের বারান্দায় আসিয়া বসিতেন। রসভোগে তাঁহার প্রচুর আনন্দ কবিত্ব-বিকাশের পক্ষে বসন্ত-বাতাসের মতো কাজ করিত। বড়োদাদা লিখিতেছেন আর শুনাইতেছেন আর তাঁহার ঘন ঘন উচ্চহাস্যে বারান্দা কাঁপিয়া উঠিতেছে। বসন্তে আমের বোল যেমন অকালে অজস্র ঝরিয়া পড়িয়া গাছের তলা ছাইয়া ফেলে তেমনি স্বপ্নপ্রয়াণের কত পরিত্যক্ত পত্র বাড়িময় ছড়াছড়ি যাইত তাহার ঠিকানা নাই। বড়োদাদার কবি-কল্পনার এতো প্রচুর প্রাণ শক্তি ছিল যে তাঁহার যতটা আবশ্যক তাহার চেয়ে তিনি ফলাইতেন অনেক বেশি। এই জন্য তিনি বিস্তর লেখা ফেলিয়া দিতেন। সেইগুলি কুড়াইয়া রাখিলে বঙ্গ-সাহিত্যে একটি সাজি ভরিয়া তোলা যাইত।

তখনকার এই কাব্যরসের ভোজে আড়াল-আবডাল হইতে আমরাও বঞ্চিত হইতাম না। এত ছড়াছড়ি যাইত যে, আমাদের মতো প্রসাদ আমরাও পাইতাম। বড়োদাদার লেখনীমুখে তখন ছন্দের ভাষায় কল্পনার একেবারে কোটালের জোয়ার—বান ডাকিয়া আসিত, নব নব অশ্রান্ত তরঙ্গের কালোচ্ছাসে কূল-উপকূল মুখরিত হইয়া উঠিত। স্বপ্ন-প্রয়াণের সব কি আমরা বুঝিতাম? কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি লাভ করিবার জন্য পূরাপূরি বুঝিবার প্রয়োজন করে না। সমুদ্রের রত্ন পাইতাম কি না জানি না, পাইলেও তাহার মূল্য বুঝিতাম না, কিন্তু মনের সাধ মিটাইয়া ঢেউ খাইতাম—

তাহারই আনন্দ-আঘাতে শিরাউপশিরায় জীবনস্রোত চঞ্চল হইয়া উঠিত!

তখনকার কথা যতই ভাবি আমার একটি কথা কেবলি মনে হয়, তখনকার দিনে মজ্‌লিস বলিয়া একটা পদার্থ ছিল এখন সেটা নাই। পূর্ব্বকার দিনে যে একটি নিবিড় সামাজিকতা ছিল আমরা যেন বাল্যকালে তাহারই শেষ অস্তচ্ছটা দেখিয়াছি। পরস্পরের মেলামেশাটা তখন খুব ঘনিষ্ঠ ছিল সুতরাং মজলিশ তখনকার কালের একটা অত্যাবশ্যক সামগ্রী। যাঁহারা মজলিশি মানুষ ছিলেন তখন তাঁহাদের বিশেষ আদর ছিল। এখন লোকেরা কাজের জন্য আসে, দেখা-সাক্ষাৎ করিতে আসে, কিন্তু মজলিশ করিতে আসে না। লোকের সময় নাই এবং সে ঘনিষ্ঠতা নাই। তখন বাড়িতে কত আনাগোনা দেখিতাম্—হাসি ও গল্পে বারান্দা এবং বৈঠকখানা মুখরিত হইয়া থাকিত। চারিদিকে সেই নানা লোককে জমাইয়া তোলা, হাসিগল্প জমাইয়া তোলা, এ একটা শক্তি—সেই শক্তিটাই কোথায় অন্তর্ধান করিয়াছে। মানুষ আছে তবু সেই সব বারান্দা সেই সব বৈঠকখানা যেন জনশূন্য। তখনকার সময়ে সমস্ত আসবাব আয়োজন, ক্রিয়া কর্ম্ম, সমস্তই দশজনের জন্য ছিল—এইজন্য তাহার মধ্যে যে জাঁকজমক ছিল তাহা উদ্ধত নহে। এখনকার বড়মানুষের গৃহসজ্জা আগেকার চেয়ে অনেক বেশি কিন্তু তাহা নির্ম্মম, তাহা নির্ব্বিচারে উদারভাবে আহ্বান করিতে জানে না—খোলা গা, ময়লা চাদর এবং হাসিমুখ সেখানে

বিনা হুকুমে প্রবেশ করিয়া আসন জুড়িয়া বসিতে পারে না। আমরা আজকাল যাহাদের নকল করিয়া ঘর তৈরি করি ও ঘর সাজাই, নিজের প্রণালীমতো তাহাদেরও সমাজ আছে এবং তাহাদের সামাজিকতাও বহু-ব্যাপ্ত। আমাদের মুস্কিল এই দেখিতেছি, নিজেদের সামাজিক পদ্ধতি ভাঙিয়াছে, সাহেবী সামাজিক পদ্ধতি গড়িয়া তুলিবার কোনো উপায় নাই—মাঝে হইতে প্রত্যেক ঘর নিরানন্দ হইয়া গিয়াছে। আজকাল কাজের জন্য দেশ-হিতের জন্য দশজনকে লইয়া আমরা সভা করিয়া থাকি—কিন্তু কিছুর জন্য নহে, শুদ্ধমাত্র দশজনের জন্যই দশজনকে লইয়া জমাইয়া বসা—মানুষকে ভালো লাগে বলিয়াই মানুষকে একত্র করিবার নানা উপলক্ষ্য সৃষ্টি করা—এ এখনকার দিনে একেবারেই উঠিয়া গিয়াছে। এতো বড়ো সামাজিক কৃপণতার মতো কুশ্রী জিনিষ কিছু আছে বলিয়া মনে হয় না। এইজন্য তখনকার দিনে যাঁহারা প্রাণখোলা হাসির ধ্বনিতে প্রত্যহ সংসারের ভার হাল্কা করিয়া রাখিয়া-ছিলেন—আজকের দিনে তাঁহাদিগকে আর-কোনো দেশের হইতেছে।

অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী

বাল্যকালে আমার কাব্যালোচনার মস্ত একজন অনুকূল সুহৃদ জুটিয়াছিল। ৺অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী মহাশয় জ্যোতিদাদার সহপাঠী ছিলেন। তিনি ইংরেজি সাহিত্যে এম. এ। সে সাহিত্যে তাঁহার যেমন ব্যুৎপত্তি তেমনি অনুরাগ ছিল। অপর পক্ষে বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণবপদকর্ত্তা, কবিকঙ্কণ, রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র, হরুঠাকুর, রামবসু, নিধু বাবু, শ্রীধর কথক প্রভৃতির প্রতি তাঁহার অনুরাগের সীমা ছিল না। বাংলা কতো উদ্ভট গানই তাঁহার মুখস্থ ছিল। সে গান সুরেবেসুরে যেমন করিয়া পারেন একেবারে মরীয়া হইয়া গাহিয়া যাইতেন। সে সম্বন্ধে শ্রোতারা আপত্তি করিলেও তাঁহার উৎসাহ অক্ষুণ্ণ থাকিত। সঙ্গে সঙ্গে তাল বাজাইবার সম্বন্ধেও অন্তরে বাহিরে তাঁহার কোনোপ্রকার বাধা ছিল না। টেবিল হউক, বই হউক বৈধ অবৈধ যাহা কিছু হাতের কাছে পাইতেন তাহাকে অজস্র টপাটপ্ শব্দে ধ্বনিত করিয়া আসর গরম করিয়া তুলিতেন। আনন্দ উপভোগ করিবার শক্তি ইঁহার অসামান্য উদার ছিল। প্রাণ ভরিয়া রস গ্রহণ করিতে ইঁহার কোনো বাধা ছিল না এবং মন খুলিয়া গুণগান করিবার বেলায় ইনি কার্পণ্য করিতে জানিতেন না। গান এবং খণ্ডকাব্য লিখিতেও ইঁহার ক্ষিপ্রতা অসামান্য ছিল। অথচ

নিজের এইসকল রচনা সম্বন্ধে তাঁহার লেশমাত্র মমত্ব ছিল না। কত ছিন্নপত্রে তাঁহার কত পেন্সিলের লেখা ছড়াছড়ি যাইত সেদিকে খেয়ালও করিতেন না। রচনা সম্বন্ধে তাঁহার ক্ষমতার যেমন প্রাচুর্য্য তেমনি ঔদাসীন্য ছিল। "উদাসিনী" নামে ইঁহার একখানি কাব্য তখনকার বঙ্গদর্শনে যথেষ্ট প্রশংসা লাভ করিয়াছিল। ইঁহার অনেক গান লোককে গাহিতে শুনিয়াছি, কে যে তাহার রচয়িতা তাহা কেহ জানেও না।

সাহিত্যভোগের অকৃত্রিম উৎসাহ সাহিত্যে পাণ্ডিত্যের চেয়ে অনেক বেশি. দুর্লভ। অক্ষয় বাবুর সেই অপর্য্যাপ্ত উৎসাহ আমাদের সাহিত্যবোধশক্তিকে সচেতন করিয়া তুলিত।

সাহিত্যে যেমন তাঁর ঔদার্য্য বন্ধুত্বেও তেমনি। অপরিচিত সভায় তিনি ডাঙায়তোলা মাছের মতো ছিলেন, কিন্তু পরিচিতদের মধ্যে তিনি বয়স বা বিদ্যাবুদ্ধির কোনো বাছ-বিচার করিতেন না। বালকদের দলে তিনি বালক ছিলেন। দাদাদের সভা হইতে যখন অনেক রাত্রে বিদায় লইতেন তখন কতদিন আমি তাঁহাকে গ্রেফ্‌তার করিয়া আমাদের ইস্কুল ঘরে টানিয়া আনিয়াছি। সেখানেও রেঁড়ির তেলের মিটমিটে আলোতে আমাদের পড়িবার টেবিলের উপর বসিয়া সভা জমাইয়া তুলিতে তাঁহার কুণ্ঠা ছিল না। এমনি করিয়া তাঁহার কাছে কত ইংরেজি কাব্যের উচ্ছ্বসিত ব্যাখ্যা শুনিয়াছি, তাঁহাকে লইয়া কত তর্কবিতর্ক আলোচনা সমা-লোচনা করিয়াছি। নিজের লেখা তাঁহাকে কত শুনাইয়াছি

এবং সে লেখার মধ্যে যদি সামান্য কিছু গুণপনা থাকিত তবে তাহা লইয়া তাঁহার কাছে কত অপর্য্যাপ্ত প্রশংসালাভ করিয়াছি।

গীতচর্চ্চা

সাহিত্যের শিক্ষায় ভাবের চর্চ্চায় বাল্যকাল হইতে জ্যোতিদাদা আমার প্রধান সহায় ছিলেন। তিনি নিজে উৎসাহী এবং অন্যকে উৎসাহ দিতে তাঁহার আনন্দ। আমি অবাধে তাঁহার সঙ্গে ভাবের ও জ্ঞানের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতাম—তিনি বালক বলিয়া আমাকে অবজ্ঞা করিতেন না। তিনি আমাকে খুব একটা বড়ো রকমের স্বাধীনতা দিয়াছিলেন; তাঁহার সংস্রবে আমার ভিতরকার সঙ্কোচ ঘুচিয়া গিয়াছিল। এইরূপ স্বাধীনতা আমাকে আর কেহ দিতে সাহস করিতে পারিত না—সে জন্য হয়তো কেহ তাঁহাকে নিন্দাও করিয়াছে। কিন্তু প্রখর গ্রীষ্মের পরে বর্ষার যেমন প্রয়োজন আমার পক্ষে আশৈশব বাধানিষেধের পরে এই স্বাধীনতা তেমনি অত্যাবশ্যক ছিল। সে সময়ে এই বন্ধনমুক্তি না ঘটিলে চিরজীবন একটা পঙ্গুতা থাকিয়া যাইত। প্রবলপক্ষেরা সর্ব্বদাই স্বাধীনতার অপব্যবহার

লইয়া খোঁটা দিয়া স্বাধীনতাকে খর্ব্ব করিতে চেষ্টা করিয়া থাকে কিন্তু স্বাধীনতার অপব্যয় করিবার যদি অধিকার না থাকে তবে তাহাকে স্বাধীনতাই বলা যায় না। অপব্যয়ের দ্বারাই সদ্ব্যয়ের যে শিক্ষা হয় তাহাই খাঁটি শিক্ষা। অন্তত আমি একথা জোর করিয়া বলিতে পারি—স্বাধীনতার দ্বারা যেটুকু উৎপাত ঘটিয়াছে তাহাতে আমাকে উৎপাতনিবারণের পন্থাতেই পৌঁছাইয়া দিয়াছে। শাসনের দ্বারা পীড়নের দ্বারা কান-মলা এবং কানে মন্ত্র দেওয়ার দ্বারা আমাকে যাহা কিছু দেওয়া হইয়াছে তাহা আমি কিছুই গ্রহণ করি নাই। যতক্ষণ আমি আপনার মধ্যে আপনি ছাড়া না পাইয়াছি ততক্ষণ নিষ্ফল বেদনা ছাড়া আর কিছুই আমি লাভ করিতে পারি নাই। জ্যোতিদাদাই সম্পূর্ণ নিঃসঙ্কোচে সমস্ত ভালোমন্দর মধ্য দিয়া আমাকে আমার আত্মোপলব্ধির ক্ষেত্রে ছাড়িয়া দিয়াছেন এবং তখন হইতেই আমার আপন শক্তি নিজের কাঁটা ও নিজের ফুল বিকাশ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে পারিয়াছে। আমার এই অভিজ্ঞতা হইতে আমি যে শিক্ষা-লাভ করিয়াছি তাহাতে মন্দকেও আমি ততো ভয় করি না ভালো করিয়া তুলিবার উপদ্রবকে যতো ডরাই—ধর্ম্মনৈতিক এবং রাষ্ট্রনৈতিক প্যুনিটিভ পুলিসের পায়ে আমি গড় করি—ইহাতে যে দাসত্বের সৃষ্টি করে তাহার মতো বালাই জগতে আর কিছুই নাই।

এক সময় পিয়ানো বাজাইয়া জ্যোতিদাদা নূতন নূতন সুর তৈরি করায় মাতিয়াছিলেন। প্রত্যহই তাঁহার অঙ্গুলি-

নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে সুর বর্ষণ হইতে থাকিত। আমি এবং অক্ষয়বাবু তাঁহার সেই সদ্যোজাত সুরগুলিকে কথা দিয়া বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টায় নিযুক্ত ছিলাম। গান বাঁধিবার শিক্ষানবিশি এইরূপে আমার আরম্ভ হইয়াছিল।

আমাদের পরিবারে শিশুকাল হইতে গানচর্চ্চার মধ্যেই আমরা বাড়িয়া উঠিয়াছি। আমার পক্ষে তাহার একটা সুবিধা এই হইয়াছিল, অতি সহজেই গান আমার সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। তাহার অসুবিধাও ছিল। চেষ্টা করিয়া গান আয়ত্ত করিবার উপযুক্ত অভ্যাস না হওয়াতে শিক্ষা পাকা হয় নাই। সঙ্গীতবিদ্যা বলিতে যাহা বোঝায় তাহার মধ্যে কোনো অধিকার লাভ করিতে পারি নাই।

সাহিত্যের সঙ্গী

হিমালয় হইতে ফিরিয়া আসার পর স্বাধীনতার মাত্রা কেবলি বাড়িয়া চলিল। চাকরদের শাসন গেল, ইস্কুলের বন্ধন নানা চেষ্টায় ছেদন করিলাম, বাড়িতেও শিক্ষকদিগকে আমল দিলাম না। আমাদের পূর্ব্বশিক্ষক জ্ঞানবাবু আমাকে কিছু কুমারসম্ভব, কিছু আর দুই একটা জিনিষ এলোমেলো-ভাবে পড়াইয়া ওকালতি করিতে গেলেন। তাঁহার পর শিক্ষক আসিলেন ব্রজ বাবু। তিনি আমাকে প্রথম দিন

গোল্‌ড্‌স্মিথের ভিকর্‌ ওয়েক্‌ফীল্‌ড হইতে তর্জ্জমা করিতে দিলেন। সেটা আমার মন্দ লাগিল না। তাহার পরে শিক্ষার আয়োজন আরো অনেকটা ব্যাপক দেখিয়া তাঁহার পক্ষে আমি সম্পূর্ণ দুরধিগম্য হইয়া উঠিলাম।

বাড়ির লোকেরা আমার হাল ছাড়িয়া দিলেন। কোনো-দিন আমার কিছু হইবে এমন আশা, না আমার, না আর কাহারো মনে রহিল। কাজেই কোনো কিছুর ভরসা না রাখিয়া আপন মনে কেবল কবিতার খাতা ভরাইতে লাগিলাম। সে লেখাও তেমনি। মনের মধ্যে আর কিছুই নাই, কেবল তপ্ত বাষ্প আছে—সেই বাষ্পভরা বুদ্বুদরাশি, সেই আবেগের ফেনিলতা অলস কল্পনার আবর্ত্তের টানে পাক খাইয়া নিরর্থক ভাবে ঘুরিতে লাগিল। তাহার মধ্যে কোনো রূপের সৃষ্টি নাই কেবল গতির চাঞ্চল্য আছে। কেবল টগ্‌বগ্‌ করিয়া ফুটিয়া ফুটিয়া ওঠা, ফাটিয়া ফাটিয়া পড়া। তাহার মধ্যে বস্তু যাহা কিছু ছিল তাহা আমার নহে, সে অন্য কবিদের অনুকরণ; উহার মধ্যে আমার যেটুকু, সে কেবল একটা অশান্তি, ভিতরকার একটা দুরন্ত আক্ষেপ। যখন শক্তির পরিণতি হয় নাই অথচ বেগ জন্মিয়াছে তখন সে একটা ভারি অন্ধ আন্দোলনের অবস্থা।

সাহিত্যে বৌঠাকুরাণীর প্রবল অনুরাগ ছিল। বাংলা বই তিনি যে পড়িতেন কেবল সময় কাটাইবার জন্য, তাহা নহে—তাহা যথার্থই তিনি সমস্ত মন দিয়া উপভোগ করিতেন। তাঁহার সাহিত্যচর্চ্চায় আমি অংশী ছিলাম।

স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্যের উপরে তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা ও প্রীতি ছিল। আমারও এই কাব্য খুব ভালো লাগিত। বিশেষত আমরা এই কাব্যের রচনা ও আলোচনার হাওয়ার মধ্যেই ছিলাম, তাই ইহার সৌন্দর্য্য সহজেই আমার হৃদয়ের তন্তুতে তন্তুতে জড়িত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু এই কাব্য আমার অনুকরণের অতীত ছিল। কখনো মনেও হয় নাই এই রকমের কিছু একটা আমি লিখিয়া তুলিব।

স্বপ্নপ্রয়াণ যেন একটা রূপকের অপরূপ রাজপ্রাসাদ। তাহার কত রকমের কক্ষ গবাক্ষ চিত্র, মূর্ত্তি ও কারু নৈপুণ্য! তাহার মহলগুলিও বিচিত্র। তাহার চারিদিকের বাগান-বাড়িতে কত ক্রীড়াশৈল কত ফোয়ারা, কত নিকুঞ্জ, কত লতাবিতান। ইহার মধ্যে কেবল ভাবের প্রাচুর্য্য নহে, রচনার বিপুল বিচিত্রতা আছে। সেই যে একটি বড়ো জিনিষকে তাহার নানা কলেবরে সম্পূর্ণ করিয়া গড়িয়া তুলিবার শক্তি, সেটি তো সহজ নহে। ইহা যে আমি চেষ্টা করিলে পারি এমন কথা আমার কল্পনাতেও উদয় হয় নাই।

এই সময়ে বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর সারদামঙ্গল-সঙ্গীত আর্য্যদর্শন পত্রে বাহির হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। বৌঠাকুরাণী এই কাব্যের মাধুর্য্যে অত্যন্ত মুগ্ধ ছিলেন। ইহার অনেকটা অংশই তাঁহার একেবারে কণ্ঠস্থ ছিল। কবিকে প্রায় তিনি মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া খাওয়াইতেন এবং নিজে হাতে রচনা করিয়া তাঁহাকে একখানি আসন দিয়াছিলেন।

এই সূত্রে কবির সঙ্গে আমারও বেশ একটু পরিচয় হইয়া গেল। তিনি আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। দিনে দুপুরে যখন তখন তাঁহার বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইতাম। তাঁহার দেহও যেমন বিপুল তাহার হৃদয়ও তেমনি প্রশস্ত। তাঁহার মনের চারিদিক ঘেরিয়া কবিত্বের একটি রশ্মিমণ্ডল তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই ফিরিত—তাঁহার যেন কবিতাময় একটি সূক্ষ্ম শরীর ছিল—তাহাই তাঁহার যথার্থ স্বরূপ। তাঁহার মধ্যে পরিপূর্ণ একটি কবির আনন্দ ছিল। যখনি তাঁহার কাছে গিয়াছি সেই আনন্দের হাওয়া খাইয়া আসিয়াছি। তাঁহার তেতালার নিভৃত ছোটো ঘরটিতে পঙ্খের কাজ করা মেজের উপর উপুড় হইয়া গুন্ গুন্ আবৃত্তি করিতে করিতে মধ্যাহ্নে তিনি কবিতা লিখিতেছেন এমন অবস্থায় অনেকদিন তাঁহার ঘরে গিয়াছি—আমি বালক হইলেও এমন একটি উদার হৃদ্যতার সঙ্গে তিনি আমাকে আহ্বান করিয়া লইতেন যে, মনে লেশমাত্র সঙ্কোচ থাকিত না। তাহার পরে ভাবে ভোর হইয়া কবিতা শুনাইতেন, গানও গাহিতেন। গলায় যে তাঁহার খুব বেশি সুর ছিল তাহা নহে, একেবারে বেসুরাও তিনি ছিলেন না—যে সুরটা গাহিতেছেন তাহার একটা আন্দাজ পাওয়া যাইত। গম্ভীর গদ্গদ কণ্ঠে চোখ বুজিয়া গান গাহিতেন, সুরে যাহা পৌঁছিত না, ভাবে তাহা ভরিয়া তুলিতেন। তাঁহার কণ্ঠের সেই গানগুলি এখনো মনে পড়ে—"বালা খেলা করে চাঁদের কিরণে" "কেরে বালা কিরণময়ী ব্রহ্মরন্ধ্রে বিহরে।" তাঁহার গানে

সুর বসাইয়া আমিও তাঁহাকে কখনো কখনো শুনাইতে যাইতাম।

কালিদাস ও বাল্মীকির কবিত্বে তিনি মুগ্ধ ছিলেন।

মনে আছে একদিন তিনি আমার কাছে কুমারসম্ভবের প্রথম শ্লোকটি খুব গলা ছাড়িয়া আবৃত্তি করিয়া বলিয়াছিলেন, ইহাতে পরে পরে যে এতগুলি দীর্ঘ আ স্বরের প্রয়োগ হইয়াছে তাহা আকস্মিক নহে—হিমালয়ের উদার মহিমাকে এই আ স্বরের দ্বারা বিস্ফারিত করিয়া দেখাইবার জন্যই "দেবতাত্মা" হইতে আরম্ভ করিয়া "নগাধিরাজ" পর্য্যন্ত কবি এতগুলি আকারের সমাবেশ করিয়াছেন।

বিহারীবাবুর মতো কাব্য লিখিব, আমার মনের আকাঙ্ক্ষাটা তখন ঐ পর্য্যন্ত দৌড়িত। হয় তো কোনো-দিন বা মনে করিয়া বসিতে পারিতাম যে, তাঁহার মতোই কাব্য লিখিতেছি—কিন্তু এই গর্ব্ব উপভোগের প্রধান ব্যাঘাত ছিলেন বিহারী কবির ভক্ত পাঠিকাটি। তিনি সর্ব্বদাই আমাকে একথাটি স্মরণ করাইয়া রাখিতেন যে "মন্দ কবিযশঃ-প্রার্থী" আমি "গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্।" আমার অহঙ্কারকে প্রশ্রয় দিলে তাহাকে দমন করা দুরূহ হইবে এ কথা তিনি নিশ্চয় বুঝিতেন—তাই কেবল কবিতা সম্বন্ধে নহে আমার গানের কণ্ঠ সম্বন্ধেও তিনি আমাকে কোনো মতে প্রশংসা করিতে চাহিতেন না, আর দুই একজনের সঙ্গে তুলনা করিয়া বলিতেন তাহাদের গলা কেমন মিষ্ট। আমারো মনে ধারণা বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল যে আমার গলায় যথোচিত মিষ্টতা

নাই। কবিত্বশক্তি সম্বন্ধেও আমার মনটা যথেষ্ট দমিয়া গিয়াছিল বটে কিন্তু আত্মসম্মান লাভের পক্ষে আমার এই একটি মাত্র ক্ষেত্র অবশিষ্ট ছিল, কাজেই কাহারো কথায় আশা ছাড়িয়া দেওয়া চলে না—তা ছাড়া ভিতরে ভারি একটা দুরন্ত তাগিদ ছিল তাহাকে থামাইয়া রাখা কাহারও সাধ্যায়ত্ত ছিল না।)

রচনাপ্রকাশ

এ পর্য্যন্ত যাহা কিছু লিখিতেছিলাম তাহার প্রচার আপনা আপনির মধ্যেই বদ্ধ ছিল। এমন সময় জ্ঞানাঙ্কুর নামে এক কাগজ বাহির হইল। কাগজের নামের উপযুক্ত একটি অঙ্কুরোদ্গত কবিও কাগজের কর্ত্তৃপক্ষেরা সংগ্রহ করিলেন। আমার সমস্ত পদ্যপ্রলাপ নির্ব্বিচারে তাঁহারা বাহির করিতে সুরু করিয়াছিলেন। কালের দরবারে আমার সুকৃতি দুষ্কৃতি বিচারের সময় কোন্ দিন তাহাদের তলব পড়িবে, এবং কোন্ উৎসাহী পেয়াদা তাহাদিগকে বিস্মৃত কাগজের অন্দরমহল হইতে নির্লজ্জভাবে লোকসমাজে টানিয়া বাহির করিয়া আনিবে, জেনানার দোহাই মানিবে না, এ ভয় আমার মনের মধ্যে আছে।

প্রথম যে গদ্য প্রবন্ধ লিখি তাহাও এই জ্ঞানাঙ্কুরেই বাহির হয়। তাহা গ্রন্থসমালোচনা। তাহার একটু ইতিহাস আছে। তখন ভুবনমোহিনীপ্রতিভা নামে একটি কবিতার বই বাহির হইয়াছিল। বইখানি ভুবনমোহিনী নামধারিণী কোনো মহিলার লেখা বলিয়া সাধারণের ধারণা জন্মিয়া গিয়াছিল। "সাধারণী" কাগজে অক্ষয় সরকার মহাশয় এবং এডুকেশন গেজেটে ভূদেববাবু এই কবির অভ্যুদয়কে প্রবল জয়বাদ্যের সহিত ঘোষণা করিতেছিলেন।

তখনকার কালের আমার একটি বন্ধু আছেন—তাঁহার বয়স আমার চেয়ে বড়ো। তিনি আমাকে মাঝে মাঝে "ভুবনমোহিনী" সই-করা চিঠি আনিয়া দেখাইতেন। "ভুবনমোহিনী" কবিতায় ইনি মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং "ভুবনমোহিনী" ঠিকানায় প্রায় তিনি কাপড়টা, বইটা ভক্তিউপহাররূপে পাঠাইয়া দিতেন।

এই কবিতাগুলির স্থানে স্থানে ভাবে ও ভাষায় এমন অসংযম ছিল যে, এগুলিকে স্ত্রীলোকের লেখা বলিয়া মনে করিতে আমার ভালো লাগিত না। চিঠিগুলি দেখিয়াও পত্রলেখককে স্ত্রীজাতীয় বলিয়া মনে করা অসম্ভব হইল। কিন্তু আমার সংশয়ে বন্ধুর নিষ্ঠা টলিল না, তাঁহার প্রতিমা-পূজা চলিতে লাগিল।

আমি তখন "ভুবনমোহিনী প্রতিভা" "দুঃখসঙ্গিনী" ও "অবসরসরোজিনী" বই তিন খানি অবলম্বন করিয়া জ্ঞানাঙ্কুরে এক সমালোচনা লিখিলাম।

খুব ঘটা করিয়া লিখিয়াছিলাম। খণ্ডকাব্যেরই বা লক্ষণ কী, গীতিকাব্যেরই বা লক্ষণ কী, তাহা অপূর্ব্ব বিচক্ষণতার সহিত আলোচনা করিয়াছিলাম। সুবিধার কথা এই ছিল ছাপার অক্ষর সবগুলিই সমান নির্ব্বিকার, তাহার মুখ দেখিয়া কিছু-মাত্র চিনিবার জো নাই, লেখকটি কেমন, তাহার বিদ্যাবুদ্ধির দৌড় কত। আমার বন্ধু অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া আসিয়া কহিলেন একজন বি, এ, তোমার এই লেখার জবাব লিখিতে-ছেন! বি, এ, শুনিয়া আমার আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। বি, এ,! শিশুকালে সত্য যেদিন বারান্দা হইতে পুলিস-ম্যানকে ডাকিয়াছিল সে দিন আমার যে দশা, আজও আমার সেইরূপ। আমি চোখের সাম্‌নে স্পষ্ট দেখিতে লাগিলাম খণ্ডকাব্য গীতিকাব্য সম্বন্ধে আমি যে কীর্ত্তিস্তম্ভ খাড়া করিয়া তুলিয়াছি বড়ো বড়ো কোটেশনের নির্ম্মম আঘাতে তাহা সমস্ত ধূলিসাৎ হইয়াছে এবং পাঠকসমাজে আমার মুখ দেখাইবার পথ একেবারে বন্ধ। "কুক্ষণে জনম তোর রে সমালোচনা!" উদ্বেগে দিনের পর দিন কাটিতে লাগিল। কিন্তু বি, এ, সমালোচক বাল্যকালের পুলিসম্যানটির মতোই দেখা দিলেন না।

ভানুসিংহের কবিতা

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও সারদাচরণ মিত্র মহাশয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ আমি বিশেষ আগ্রহের সহিত পড়িতাম। তাহার মৈথিলীমিশ্রিত ভাষা আমার পক্ষে দুর্ব্বোধ ছিল। কিন্তু সেইজন্যই এতো অধ্য-বসায়ের সঙ্গে আমি তাহার মধ্যে প্রবেশচেষ্টা করিয়াছিলাম। গাছের বীজের মধ্যে যে অঙ্কুর প্রচ্ছন্ন ও মাটির নীচে যে রহস্য অনাবিষ্কৃত তাহার প্রতি যেমন একটি একান্ত কৌতূহল বোধ করিতাম প্রাচীন পদকর্ত্তাদের রচনাসম্বন্ধেও আমার ঠিক সেই ভাবটা ছিল। আবরণ মোচন করিতে করিতে একটি অপরিচিত ভাণ্ডার হইতে একটি আধটি কাব্যরত্ন চোখে পড়িতে থাকিবে এই আশাতেই আমাকে উৎসাহিত করিয়া তুলিয়াছিল। এই রহস্যের মধ্যে তলাইয়া দুর্গম অন্ধকার হইতে রত্ন তুলিয়া আনিবার চেষ্টায় যখন আছি তখন নিজেকেও একবার এইরূপ রহস্যআবরণে আবৃত করিয়া প্রকাশ করিবার একটা ইচ্ছা আমাকে পাইয়া বসিয়াছিল।

ইতিপূর্ব্বে অক্ষয়বাবুর কাছে ইংরাজ বালককবি চ্যাটার্টনের বিবরণ শুনিয়াছিলাম। তাঁহার কাব্য যে কিরূপ তাহা জানিতাম না—বোধ করি অক্ষয়বাবুও বিশেষ কিছু জানিতেন

না, এবং জানিলে বোধ হয় রসভঙ্গ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু তাঁহার গল্পটার মধ্যে যে একটা নাটকিয়ানা ছিল সে আমার কল্পনাকে খুব সরগরম করিয়া তুলিয়াছিল। চ্যাটার্টন প্রাচীন কবিদের এমন নকল করিয়া কবিতা লিখিয়াছিলেন যে অনেকেই তাহা ধরিতে পারে নাই। অবশেষে ষোল বছর বয়সে এই হতভাগ্য বালককবি আত্ম-হত্যা করিয়া মরিয়াছিলেন। আপাতত ঐ আত্মহত্যার অনাবশ্যক অংশটুকু হাতে রাখিয়া কোমর বাঁধিয়া দ্বিতীয় চ্যাটার্টন হইবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলাম।

একদিন মধ্যাহ্নে খুব মেঘ করিয়াছে। সেই মেঘলা-দিনের ছায়াঘন অবকাশের আনন্দে বাড়ির ভিতরের এক ঘরে খাটের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া একটা শ্লেট লইয়া লিখিলাম "গহন কুসুমকুঞ্জ মাঝে।" লিখিয়া ভারি খুসি হইলাম—তখনি এমন লোককে পড়িয়া শুনাইলাম, বুঝিতে পারিবার আশঙ্কামাত্র যাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। সুতরাং সে গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া কহিল "বেশতো, এ তো বেশ হইয়াছে।"

পূর্ব্বলিখিত আমার বন্ধুটিকে একদিন বলিলাম—সমাজের লাইব্রেরি খুঁজিতে খুঁজিতে বহুকালের একটি জীর্ণ পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে ভানুসিংহ নামক কোনো প্রাচীন কবির পদ কাপি করিয়া আনিয়াছি। এই বলিয়া তাঁহাকে কবিতাগুলি শুনাইলাম। শুনিয়া তিনি বিষম বিচলিত হইয়া উঠিলেন। কহিলেন, "এ পুঁথি আমার

নিতান্তই চাই। এমন কবিতা বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের হাত দিয়াও বাহির হইতে পারিত না। আমি প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ ছাপিবার জন্য ইহা অক্ষয়বাবুকে দিব।"

তখন আমার খাতা দেখাইয়া স্পষ্ট প্রমাণ করিয়া দিলাম এ লেখা বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের হাত দিয়া নিশ্চয় বাহির হইতে পারে না, কারণ, এ আমার লেখা। বন্ধু গম্ভীর হইয়া কহিলেন, "নিতান্ত মন্দ হয় নাই।"

ভানুসিংহ যখন ভারতীতে বাহির হইতেছিল ডাক্তার নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তখন জর্ম্মনিতে ছিলেন। তিনি য়ুরোপীয় সাহিত্যের সহিত তুলনা করিয়া আমাদের দেশের গীতিকাব্যসম্বন্ধে একখানি চটিবই লিখিয়াছিলেন। তাহাতে ভানুসিংহকে তিনি প্রাচীন পদকর্ত্তারূপে যে প্রচুর সম্মান দিয়াছিলেন কোনো আধুনিক কবির ভাগ্যে তাহা সহজে জোটে না। এই গ্রন্থখানি লিখিয়া তিনি ডাক্তার উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।

ভানুসিংহ যিনিই হৌন্ তাঁহার লেখা যদি বর্ত্তমান আমার হাতে পড়িত তবে আমি নিশ্চয়ই ঠকিতাম না এ কথা আমি জোর করিয়া বলিতে পারি। উহার ভাষা প্রাচীন পদকর্ত্তার বলিয়া চালাইয়া দেওয়া অসম্ভব ছিল না। কারণ, এ ভাষা তাঁহাদের মাতৃভাষা নহে, ইহা একটা কৃত্রিম ভাষা; ভিন্ন ভিন্ন কবির হাতে ইহার কিছু না কিছু ভিন্নতা ঘটিয়াছে। কিন্তু তাঁহাদের ভাবের মধ্যে কৃত্রিমতা ছিল না। ভানুসিংহের কবিতা একটু বাজাইয়া বা কসিয়া দেখিলেই তাহার মেকি

বাহির হইয়া পড়ে। তাহাতে আমাদের দিশি নহবতের প্রাণগলানো ঢালা সুর নাই, তাহা আজকালকার সস্তা আগিনের বিলাতী টুংটাংমাত্র।

স্বাদেশিকতা

বাহির হইতে দেখিলে আমাদের পরিবারে অনেক বিদেশী প্রথার চলন ছিল কিন্তু আমাদের পরিবারের হৃদয়ের মধ্যে একটা স্বদেশাভিমান স্থির দীপ্তিতে জাগিতেছিল। স্বদেশের প্রতি পিতৃদেবের যে একটি আন্তরিক শ্রদ্ধা তাঁহার জীবনের সকল প্রকার বিপ্লবের মধ্যেও অক্ষুণ্ণ ছিল তাহাই আমাদের পরিবারস্থ সকলের মধ্যে একটি প্রবল স্বদেশপ্রেম সঞ্চার করিয়া রাখিয়াছিল। বস্তুত সে সময়টা স্বদেশপ্রেমের সময় নয়। তখন শিক্ষিতলোকে দেশের ভাষা এবং দেশের ভাব উভয়কেই দূরে ঠেকাইয়া রাখিয়াছিলেন। আমাদের বাড়িতে দাদারা চিরকাল মাতৃভাষার চর্চ্চা করিয়া আসিয়াছেন। আমার পিতাকে তাঁহার কোনো নূতন আত্মীয় ইংরাজিতে পত্র লিখিয়াছিলেন, সে পত্র লেখকের নিকটে তখনি ফিরিয়া আসিয়াছিল।

আমাদের বাড়ির সাহায্যে হিন্দুমেলা বলিয়া একটি মেলা সৃষ্টি হইয়াছিল। নবগোপাল মিত্র মহাশয় এই মেলার

কর্ম্মকর্ত্তারূপে নিয়োজিত ছিলেন। (ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিয়া ভক্তির সহিত উপলব্ধির চেষ্টা সেই প্রথম হয়। মেজদাদা সেই সময়ে বিখ্যাত জাতীয় সঙ্গীত "মিলে সবে ভারতসন্তান" রচনা করিয়াছিলেন। এই মেলায় দেশের স্তবগান গীত, দেশানুরাগের কবিতা পঠিত, দেশী শিল্পব্যায়াম প্রভৃতি প্রদর্শিত ও দেশী গুণীলোক পুরস্কৃত হইত।

লর্ড কর্জ্জনের সময় দিল্লিদরবারসম্বন্ধে একটা গদ্য প্রবন্ধ লিখিয়াছি—লর্ড লিটনের সময় লিখিয়াছিলাম পদ্যে। তখনকার ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট রুশিয়াকেই ভয় করিত, কিন্তু চোদ্দ পনের বছর বয়সের বালক কবির লেখনীকে ভয় করিত না। এই জন্য সেই কাব্যে বয়সোচিত উত্তেজনা প্রভূতপরিমাণে থাকাসত্ত্বেও তখনকার প্রধান সেনাপতি হইতে আরম্ভ করিয়া পুলিসের কর্ত্তৃপক্ষ পর্য্যন্ত কেহ কিছুমাত্র বিচলিত হইবার লক্ষণ প্রকাশ করেন নাই। টাইমস্ পত্রেও কোনো পত্রলেখক এই বালকের ধৃষ্টতার প্রতি শাসনকর্ত্তাদের ঔদাসীন্যের উল্লেখ করিয়া ব্রিটিশ রাজত্বের স্থায়িত্বসম্বন্ধে গভীর নৈরাশ্য প্রকাশ করিয়া অত্যুষ্ণ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করেন নাই। সেটা পড়িয়াছিলাম হিন্দুমেলায় গাছের তলায় দাঁড়াইয়া। শ্রোতাদের মধ্যে নবীন সেন মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। আমার বড়ো বয়সে তিনি একদিন একথা আমাকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন।

জ্যোতিদাদার উদ্যোগে আমাদের একটি সভা হইয়াছিল, বৃদ্ধ রাজনারায়ণ বাবু ছিলেন তাহার সভাপতি। ইহা

স্বাদেশিকের সভা। কলিকাতার এক গলির মধ্যে এক পোড়ো বাড়িতে সেই সভা বসিত। সেই সভার সমস্ত অনুষ্ঠান রহস্যে আবৃত ছিল। বস্তুত তাহার মধ্যে ঐ গোপনীয়তাটাই একমাত্র ভয়ঙ্কর ছিল। আমাদের ব্যবহারে রাজার বা প্রজার ভয়ের বিষয় কিছুই ছিল না। আমরা মধ্যাহ্নে কোথায় কী করিতে যাইতেছি তাহা আমাদের আত্মীয়রাও জানিতেন না। দ্বার আমাদের রুদ্ধ, ঘর আমাদের অন্ধকার, দীক্ষা আমাদের ঋক্‌মন্ত্রে, কথা আমাদের চুপিচুপি—ইহাতেই সকলের রোমহর্ষণ হইত, আর বেশি কিছুই প্রয়োজন ছিল না। আমার মতো অর্ব্বাচীনও এই সভার সভ্য ছিল। সেই সভায় আমরা এমন একটি ক্ষ্যাপামির তপ্ত হাওয়ার মধ্যে ছিলাম যে অহরহ উৎসাহে যেন আমরা উড়িয়া চলিতাম। লজ্জা ভয় সঙ্কোচ আমাদের কিছুই ছিল না। এই সভায় আমাদের প্রধান কাজ উত্তেজনার আগুন পোহানো। বীরত্ব জিনিষটা কোথাও বা অসুবিধাকর হইতেও পারে, কিন্তু ওটার প্রতি মানুষের একটা গভীর শ্রদ্ধা আছে। সেই শ্রদ্ধাকে জাগাইয়া রাখিবার জন্য সকল দেশের সাহিত্যেই প্রচুর আয়োজন দেখিতে পাই। কাজেই যে অবস্থাতেই মানুষ থাক্‌না, মনের মধ্যে ইহার ধাক্কা না লাগিয়া তো নিষ্কৃতি নাই। আমরা সভা করিয়া, কল্পনা করিয়া, বাক্যালাপ করিয়া, গান গাহিয়া, সেই ধাক্কাটা সাম্‌লাইবার চেষ্টা করিয়াছি। মানুষের যাহা প্রকৃতিগত এবং মানুষের কাছে যাহা চিরদিন আদরণীয় তাহার সকল

প্রকার রাস্তা মারিয়া তাহার সকল প্রকার ছিদ্র বন্ধ করিয়া দিলে একটা যে বিষম বিকারের সৃষ্টি করা হয় সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহই থাকিতে পারে না। একটা বৃহৎ রাজ্য-ব্যবস্থার মধ্যে কেবল কেরাণীগিরির রাস্তা খোলা রাখিলে মানবচরিত্রের বিচিত্র শক্তিকে তাহার স্বাভাবিক স্বাস্থ্যকর চালনার ক্ষেত্র দেওয়া হয় না। রাজ্যের মধ্যে বীরধর্ম্মেরও পথ রাখা চাই, নহিলে মানবধর্ম্মকে পীড়া দেওয়া হয়। তাহার অভাবে কেবলি গুপ্ত উত্তেজনা অন্তঃশীলা হইয়া বহিতে থাকে—সেখানে তাহার গতি অত্যন্ত অদ্ভুত এবং পরিণাম অভাবনীয়। আমার বিশ্বাস সেকালে যদি গবর্মেণ্টের সন্দিগ্ধতা অত্যন্ত ভীষণ হইয়া উঠিত তবে তখন আমাদের সেই সভার বালকেরা যে বীরত্বের প্রহসনমাত্র অভিনয় করিতেছিল তাহা কঠোর ট্রাজেডিতে পরিণত হইতে পারিত। অভিনয় সাঙ্গ হইয়া গিয়াছে, ফোর্ট উইলিয়মের একটি ইষ্টকও খসে নাই এবং সেই পূর্ব্বস্মৃতির আলোচনা করিয়া আজ আমরা হাসিতেছি।

ভারতবর্ষের একটা সর্ব্বজনীন পরিচ্ছদ কী হইতে পারে এই সভায় জ্যোতিদাদা তাহার নানাপ্রকারের নমুনা উপস্থিত করিতে আরম্ভ করিলেন। ধুতিটা কর্ম্মক্ষেত্রের উপযোগী নহে অথচ পায়জামাটা বিজাতীয়, এই জন্য তিনি এমন একটা আপোষ করিবার চেষ্টা করিলেন যেটাতে ধুতিও ক্ষুণ্ণ হইল, পায়জামাও প্রসন্ন হইল না। অর্থাৎ তিনি পায়জামার উপর একখণ্ড কাপড় পাট করিয়া একটা স্বতন্ত্র কৃত্রিম মালকোঁচা

জুড়িয়া দিলেন। সোলার টুপির সঙ্গে পাগড়ির সঙ্গে মিশাল করিয়া এমন একটা পদার্থ তৈরি হইল যেটাকে অত্যন্ত উৎসাহী লোকেও শিরোভূষণ বলিয়া গণ্য করিতে পারে না। এইরূপ সর্ব্বজনীন পোষাকের নমুনা সর্ব্বজনে গ্রহণ করিবার পূর্ব্বেই একলা নিজে ব্যবহার করিতে পারা যে-সে লোকের সাধ্য নহে। জ্যোতিদাদা অম্লানবদনে এই কাপড় পরিয়া মধ্যাহ্নের প্রখর আলোকে গাড়িতে গিয়া উঠিতেন—আত্মীয় এবং বান্ধব, দ্বারী এবং সারথি সকলেই অবাক্ হইয়া তাকাইত, তিনি ভ্রূক্ষেপমাত্র করিতেন না। দেশের জন্য অকাতরে প্রাণ দিতে পারে এমন বীরপুরুষ অনেক থাকিতে পারে কিন্তু দেশের মঙ্গলের জন্য সর্ব্বজনীন পোষাক পরিয়া গাড়ি করিয়া কলিকাতার রাস্তা দিয়া যাইতে পারে এমন লোক নিশ্চয়ই বিরল। রবিবারে রবিবারে জ্যোতিদাদা দলবল লইয়া শিকার করিতে বাহির হইতেন। রবাহূত অনাহূত যাহারা আমাদের দলে আসিয়া জুটিত তাহাদের অধিকাংশকেই আমরা চিনিতাম না। তাহাদের মধ্যে ছুতার কামার প্রভৃতি সকল শ্রেণীরই লোক ছিল। এই শিকারে রক্তপাতটাই সব চেয়ে নগণ্য ছিল, অন্তত সেরূপ ঘটনা আমার তো মনে পড়ে না। শিকারের অন্য সমস্ত অনুষ্ঠানই বেশ ভরপূরমাত্রায় ছিল—আমরা হত আহত পশু পক্ষীর অতিতুচ্ছ অভাব কিছুমাত্র অনুভব করিতাম না। প্রাতঃকালেই বাহির হইতাম। বৌঠাকুরাণী রাশীকৃত লুচি তরকারী প্রস্তুত করিয়া আমাদের সঙ্গে দিতেন। ঐ

জিনিষটাকে শিকার করিয়া সংগ্রহ করিতে হইত না বলিয়াই একদিনও আমাদিগকে উপবাস করিতে হয় নাই।

মাণিকতলায় পোড়োবাগানের অভাব নাই। আমরা যে-কোনো একটা বাগানে ঢুকিয়া পড়িতাম। পুকুরের বাঁধানো ঘাটে বসিয়া উচ্চনীচনির্ব্বিচারে সকলে একত্র মিলিয়া লুচির উপরে পড়িয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে কেবল পাত্রটাকে মাত্র বাকি রাখিতাম।

ব্রজবাবুও আমাদের অহিংস্রক শিকারীদের মধ্যে একজন প্রধান উৎসাহী। ইনি মেট্রোপলিটান কলেজের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট এবং কিছুকাল আমাদের ঘরের শিক্ষক ছিলেন। ইনি একদিন শিকার হইতে ফিরিবার পথে একটা বাগানে ঢুকিয়াই মালিকে ডাকিয়া কহিলেন—"ওরে ইতিমধ্যে মামা কি বাগানে আসিয়াছিলেন?" মালি তাঁহাকে শশব্যস্ত হইয়া প্রণাম করিয়া কহিল "আজ্ঞা না, বাবু তো আসে নাই।" ব্রজবাবু কহিলেন "আচ্ছা ডাব পাড়িয়া আন্।" সে দিন লুচির অন্তে পানীয়ের অভাব হয় নাই।

আমাদের দলের মধ্যে একটি মধ্যবিত্ত জমিদার ছিলেন। তিনি নিষ্ঠাবান হিন্দু। তাঁহার গঙ্গার ধারে একটি বাগান ছিল। সেখানে গিয়া আমরা সকল সভ্য একদিন জাতিবর্ণ-নির্ব্বিচারে আহার করিলাম। অপরাহ্ণে বিষম ঝড়। সেই ঝড়ে আমরা গঙ্গার ঘাটে দাঁড়াইয়া চীৎকার শব্দে গান জুড়িয়া দিলাম। রাজনারায়ণবাবুর কণ্ঠে সাতটা সুর যে বেশ বিশুদ্ধভাবে খেলিত তাহা নহে কিন্তু তিনিও গলা

ছাড়িয়া দিলেন, এবং সূত্রের চেয়ে ভাষ্য যেমন অনেক বেশি হয় তেমনি তাঁহার উৎসাহের তুমুল হাতনাড়া তাঁহার ক্ষীণ-কণ্ঠকে বহুদূরে ছাড়াইয়া গেল; তালের ঝোঁকে মাথা নাড়িতে লাগিলেন এবং তাঁহার পাকা দাড়ির মধ্যে ঝড়ের হাওয়া মাতামাতি করিতে লাগিল। অনেক রাত্রে গাড়ি করিয়া বাড়ি ফিরিলাম। তখন ঝড় বাদল থামিয়া তারা ফুটিয়াছে। অন্ধকার নিবিড়, আকাশ নিস্তব্ধ, পাড়াগাঁয়ের পথ নির্জ্জন, কেবল দুইধারের বনশ্রেণীর মধ্যে দলে দলে জোনাকি যেন নিঃশব্দে মুঠা মুঠা আগুনের হরিরলুঠ ছড়াইতেছে।

স্বদেশে দিয়াশালাই প্রভৃতির কারখানা স্থাপন করা আমাদের সভার উদ্দেশ্যের মধ্যে একটি ছিল। এজন্য সভ্যেরা তাঁহাদের আয়ের দশমাংশ এই সভায় দান করিতেন। দেশালাই তৈরি করিতে হইবে, তাহার কাঠি পাওয়া শক্ত। সকলেই জানেন আমাদের দেশে উপযুক্ত হাতে খেংরা কাঠির মধ্য দিয়া সস্তায় প্রচুরপরিমাণে তেজ প্রকাশ পায় কিন্তু সে তেজে যাহা জ্বলে তাহা দেশালাই নহে। অনেক পরীক্ষার পর বাক্সকয়েক দেশালাই তৈরি হইল। ভারতসন্তানদের উৎসাহের নিদর্শন বলিয়াই যে তাহারা মূল্যবান তাহা নহে—আমাদের এক বাক্সে যে খরচ পড়িতে লাগিল তাহাতে একটা পল্লীর সম্বৎসরের চুলোধরানো চলিত। আরো একটু সামান্য অসুবিধা এই হইয়াছিল যে, নিকটে অগ্নিশিখা না থাকিলে তাহাদিগকে জ্বালাইয়া তোলা

সহজ ছিল না। দেশের প্রতি জ্বলন্ত অনুরাগ যদি তাহাদের জ্বলনশীলতা বাড়াইতে পারিত তবে আজ পর্য্যন্ত তাহারা বাজারে চলিত।

খবর পাওয়া গেল একটি কোনো অল্পবয়স্ক ছাত্র কাপড়ের কল তৈরি করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত; গেলাম তাহার কল দেখিতে। সেটা কোনো কাজের জিনিষ হইতেছে কিনা তাহা কিছুমাত্র বুঝিবার শক্তি আমাদের কাহারো ছিল না—কিন্তু বিশ্বাস করিবার ও আশা করিবার শক্তিতে আমরা কাহারো চেয়ে খাটো ছিলাম না। যন্ত্র তৈরি করিতে কিছু দেনা হইয়াছিল, আমরা তাহা শোধ করিয়া দিলাম। অবশেষে একদিন দেখি ব্রজবাবু মাথায় একখানা গামছা বাঁধিয়া জোড়াসাঁকোর বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত। কহিলেন, আমাদের কলে এই গামছার টুক্‌রা তৈরি হইয়াছে। বলিয়া দুই হাত তুলিয়া তাণ্ডব নৃত্য!—তখন ব্রজবাবুর মাথার চুলে পাক ধরিয়াছে।

অবশেষে দুটি একটি সুবুদ্ধি লোক আসিয়া আমাদের দলে ভিড়িলেন, আমাদিগকে জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাওয়াইলেন এবং এই স্বর্গলোক ভাঙিয়া গেল।

ছেলেবেলায় রাজনারায়ণ বাবুর সঙ্গে যখন আমাদের পরিচয় ছিল তখন সকল দিক হইতে তাঁহাকে বুঝিবার শক্তি আমাদের ছিল না। তাঁহার মধ্যে নানা বৈপরীত্যের সমাবেশ ঘটিয়াছিল। তখনই তাঁহার চুল দাড়ি প্রায় সম্পূর্ণ পাকিয়াছে কিন্তু আমাদের দলের মধ্যে বয়সে সকলের চেয়ে

যে ব্যক্তি ছোটো তাহার সঙ্গেও তাঁহার বয়সের কোনো অনৈক্য ছিল না। তাঁহার বাহিরের প্রবীণতা শুভ্র মোড়কটির মতো হইয়া তাঁহার অন্তরের নবীনতাকে চিরদিন তাজা করিয়া রাখিয়া দিয়াছিল। এমন কি, প্রচুর পাণ্ডিত্যেও তাঁহার কোনো ক্ষতি করিতে পারে নাই, তিনি একেবারেই সহজ মানুষটির মতোই ছিলেন। জীবনের শেষ পর্য্যন্ত অজস্র হাস্যোচ্ছ্বাস কোনো বাধাই মানিল না—না বয়সের গাম্ভীর্য্য, না অস্বাস্থ্য, না সংস্কারের দুঃখ কষ্ট, ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন, কিছুতেই তাঁহার হাসির বেগকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারে নাই। একদিকে তিনি আপনার জীবন এবং সংসারটিকে ঈশ্বরের কাছে সম্পূর্ণ নিবেদিত করিয়া দিয়াছিলেন, আর একদিকে দেশের উন্নতিসাধন করিবার জন্য তিনি সর্ব্বদাই কতরকম সাধ্য ও অসাধ্য প্ল্যান্ করিতেন তাহার আর অন্ত নাই। রিচার্ড্সনের তিনি প্রিয় ছাত্র, ইংরাজি বিদ্যাতেই বাল্যকাল হইতে তিনি মানুষ কিন্তু তবু অনভ্যাসের সমস্ত বাধা ঠেলিয়া ফেলিয়া বাংলাভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে পূর্ণ উৎসাহ ও শ্রদ্ধার বেগে তিনি প্রবেশ করিয়াছিলেন। এদিকে তিনি মাটির মানুষ কিন্তু তেজে একেবারে পরিপূর্ণ ছিলেন। দেশের প্রতি তাঁহার যে প্রবল অনুরাগ, সে তাঁহার সেই তেজের জিনিষ। দেশের সমস্ত খর্ব্বতা দীনতা অপমানকে তিনি দগ্ধ করিয়া ফেলিতে চাহিতেন। তাঁহার দুই চক্ষু জ্বলিতে থাকিত, তাঁহার হৃদয় দীপ্ত হইয়া উঠিত, উৎসাহের সঙ্গে হাত নাড়িয়া আমাদের

সঙ্গে মিলিয়া তিনি ধরিতেন—গলায় সুর লাগুক্ আর না লাগুক্ সে তিনি খেয়ালই করিতেন না,—

একসূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন,
এক কার্য্যে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন।

এই ভগবদ্ভক্ত চিরবালকটির তেজঃপ্রদীপ্ত হাস্যমধুর জীবন, রোগে শোকে অপরিম্লান তাঁহার পবিত্র নবীনতা আমাদের দেশের স্মৃতিভাণ্ডারে সমাদরের সহিত রক্ষা করিবার সামগ্রী তাহাতে সন্দেহ নাই।

ভারতী

মোটের উপর এই সময়টা আমার পক্ষে একটা উন্মত্ততার সময় ছিল। কতদিন ইচ্ছা করিয়াই না ঘুমাইয়া রাত কাটাইয়াছি। তাহার যে কোনো প্রয়োজন ছিল তাহা নহে কিন্তু বোধকরি রাত্রে ঘুমানোটাই সহজ ব্যাপার বলিয়াই সেটা উল্টাইয়া দিবার প্রবৃত্তি হইত। আমাদের ইস্কুলঘরের ক্ষীণ আলোতে নির্জ্জন ঘরে বই পড়িতাম; দূরে গির্জ্জার ঘড়িতে পনেরো মিনিট অন্তর ঢং ঢং করিয়া ঘণ্টা বাজিত—প্রহরগুলা যেন একে একে নিলাম হইয়া যাইতেছে; চিৎপুর রোডে নিমতলা ঘাটের যাত্রীদের কণ্ঠ হইতে ক্ষণে ক্ষণে

"হরিবোল" ধ্বনিত হইয়া উঠিত। কত গ্রীষ্মের গভীর রাত্রে, তেতলায় ছাদে সারিসারি টবের বড়ো বড়ো গাছগুলির ছায়াপাতের দ্বারা বিচিত্র চাঁদের আলোতে একলা প্রেতের মতো বিনা-কারণে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি।

কেহ যদি মনে করেন এ সমস্তই কেবল কবিয়ানা, তাহা হইলে ভুল করিবেন। (পৃথিবীর একটা বয়স ছিল যখন তাহার ঘন ঘন ভূমিকম্প ও অগ্নিউচ্ছ্বাসের সময়। এখনকার প্রবীণ পৃথিবীতেও মাঝে মাঝে সেরূপ চাপল্যের লক্ষণ দেখা দেয়, তখন লোকে আশ্চর্য্য হইয়া যায়; কিন্তু প্রথম বয়সে যখন তাহার আবরণ এতো কঠিন ছিল না এবং ভিতরকার বাষ্প ছিল অনেক বেশি তখন সদাসর্ব্বদাই অভাবনীয় উৎপাতের তাণ্ডব চলিত। তরুণ বয়সের আরম্ভে এও সেই-রকমের একটা কাণ্ড। যে সব উপকরণে জীবন গড়া হয়, যতক্ষণ গড়াটা বেশ পাকা না হয় ততক্ষণ সেই উপকরণগুলাই হাঙ্গামা করিতে থাকে।)

এই সময়টাতেই বড়দাদাকে সম্পাদক করিয়া জ্যোতিদাদা ভারতী পত্রিকা বাহির করিবার সঙ্কল্প করিলেন। এই আর একটা আমাদের পরম উত্তেজনার বিষয় হইল। আমার বয়স তখন ঠিক ষোলো। কিন্তু আমি ভারতীর সম্পাদকচক্রের বাহিরে ছিলাম না। ইতিপূর্ব্বেই আমি অল্প বয়সের স্পর্দ্ধার বেগে মেঘনাদবধের একটি তীব্র সমালোচনা লিখিয়াছিলাম। কাঁচা আমের রসটা অম্লরস—কাঁচা সমালোচনাও গালি-গালাজ। অন্য ক্ষমতা যখন কম থাকে তখন খোঁচা দিবার

ক্ষমতাটা খুব তীক্ষ্ণ হইয়া উঠে। আমিও এই অমর কাব্যের উপর নখরাঘাত করিয়া নিজেকে অমর করিয়া তুলিবার সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ উপায় অন্বেষণ করিতেছিলাম। এই দাম্ভিক সমালোচনাটা দিয়া আমি ভারতীতে প্রথম লেখা আরম্ভ করিলাম।

এই প্রথম বৎসরের ভারতীতেই "কবিকাহিনী" নামক একটি কাব্য বাহির করিয়াছিলাম। যে বয়সে লেখক জগতের আর সমস্তকে তেমন করিয়া দেখে নাই কেবল নিজের অপরিস্ফুটতার ছায়ামূর্ত্তিটাকেই খুব বড়ো করিয়া দেখিতেছে ইহা সেই বয়সের লেখা! সেইজন্য ইহার নায়ক কবি। সে কবি যে লেখকের সত্তা তাহা নহে, লেখক আপনাকে যাহা বলিয়া মনে করিতে ও ঘোষণা করিতে ইচ্ছা করে ইহা তাহাই। ঠিক ইচ্ছা করে বলিলে যাহা বুঝায় তাহাও নহে—যাহা ইচ্ছা করা উচিত অর্থাৎ যেরূপটি হইলে অন্য দশজনে মাথা নাড়িয়া বলিবে, হাঁ কবি বটে, ইহা সেই জিনিষটি। ইহার মধ্যে বিশ্বপ্রেমের ঘটা খুব আছে—তরুণ কবির পক্ষে এইটি বড়ো উপাদেয়, কারণ, ইহা শুনিতে খুব বড়ো এবং বলিতে খুব সহজ। নিজের মনের মধ্যে সত্য যখন জাগ্রত হয় নাই, পরের মুখের কথাই যখন প্রধান সম্বল তখন রচনার মধ্যে সরলতা ও সংযম রক্ষা করা সম্ভব নহে। তখন, যাহা স্বতই বৃহৎ তাহাকে বাহিরের দিক হইতে বৃহৎ করিয়া তুলিবার দুশ্চেষ্টায় তাহাকে বিকৃত ও হাস্যকর করিয়া তোলা অনিবার্য্য। এই বাল্যরচনাগুলি পাঠ করিবার সময়

যখন সঙ্কোচ অনুভব করি তখন মনে আশঙ্কা হয় যে, বড়ো বয়সের লেখার মধ্যেও নিশ্চয় এইরূপ অতিপ্রয়াসের বিকৃতি ও অসত্যতা অপেক্ষাকৃত প্রচ্ছন্নভাবে অনেক রহিয়া গেছে! বড়ো কথাকে খুব বড়ো গলায় বলিতে গিয়া নিঃসন্দেহই অনেক সময়ে তাহার শান্তি ও গাম্ভীর্য্য নষ্ট করিয়াছি। নিশ্চয়ই অনেক সময়ে বলিবার বিষয়টাকে ছাপাইয়া নিজের কণ্ঠটাই সমুচ্চতর হইয়া উঠিয়াছে এবং সেই ফাঁকিটা কালের নিকটে একদিন ধরা পড়িবেই।

এই কবিকাহিনী কাব্যই আমার রচনাবলীর মধ্যে প্রথম গ্রন্থআকারে বাহির হয়। আমি যখন মেজদাদার নিকট আমেদাবাদে ছিলাম তখন আমার কোনো উৎসাহী বন্ধু এই বইখানা ছাপাইয়া আমার নিকট পাঠাইয়া দিয়া আমাকে বিস্মিত করিয়া দেন। তিনি যে কাজটা ভালো করিয়াছিলেন তাহা আমি মনে করিনা কিন্তু তখন আমার মনে যে ভাবোদয় হইয়াছিল, শাস্তি দিবার প্রবল ইচ্ছা তাহাকে কোনোমতেই বলা যায় না। দণ্ড তিনি পাইয়াছিলেন, কিন্তু সে বইলেখকের কাছে নহে, বই কিনিবার মালেক যাহারা তাহাদের কাছ হইতে। শুনা যায় সেই বইয়ের বোঝা সুদীর্ঘকাল দোকানের শেল্‌ফ এবং তাঁহার চিত্তকে ভারাতুর করিয়া অক্ষয় হইয়া বিরাজ করিতেছিল।

যে বয়সে ভারতীতে লিখিতে সুরু করিয়াছিলাম সে বয়সের লেখা প্রকাশযোগ্য হইতেই পারে না। বালককালে লেখা ছাপাইবার বালাই অনেক—বয়ঃপ্রাপ্ত অবস্থার জন্য

অনুতাপ সঞ্চয় করিবার এমন উপায় আর নাই। কিন্তু তাহার একটা সুবিধা আছে; ছাপার অক্ষরে নিজের লেখা দেখিবার প্রবল মোহ অল্প বয়সের উপর দিয়াই কাটিয়া যায়। আমার লেখা কে পড়িল, কে কী বলিল, ইহা লইয়া অস্থির হইয়া উঠা—লেখার কোন্‌খানটাতে দুটো ছাপার ভুল হইয়াছে ইহাই লইয়া কণ্টকবিদ্ধ হইতে থাকা—এই সমস্ত লেখা-প্রকাশের ব্যাধিগুলা বাল্যবয়সে সারিয়া দিয়া অপেক্ষাকৃত সুস্থচিত্তে লিখিবার অবকাশ পাওয়া যায়। নিজের ছাপা লেখাটাকে সকলের কাছে নাচাইয়া বেড়াইবার মুগ্ধ অবস্থা হইতে যতশীঘ্র নিষ্কৃতি পাওয়া যায় ততই মঙ্গল।

তরুণ বাংলা সাহিত্যের এমন একটা বিস্তার ও প্রভাব হয় নাই যাহাতে সেই সাহিত্যের অন্তর্নিহিত রচনাবিধি লেখকদিগকে শাসনে রাখিতে পারে। লিখিতে লিখিতে ক্রমশ নিজের ভিতর হইতেই এই সংযমটিকে উদ্ভাবিত করিয়া লইতে হয়। এইজন্য দীর্ঘকাল বহুতর আবর্জ্জনাকে জন্ম দেওয়া অনিবার্য্য। কাঁচা বয়সে অল্পসম্বলে অদ্ভুত কীর্ত্তি করিতে না পারিলে মনস্থির হয় না, কাজেই ভঙ্গিমার আতিশয্য, এবং প্রতিপদেই নিজের স্বাভাবিক শক্তিকে ও সেই সঙ্গে সত্যকে সৌন্দর্য্যকে বহুদূরে লঙ্ঘন করিয়া যাইবার প্রয়াস রচনার মধ্যে প্রকাশ হইয়া পড়ে। এই অবস্থা হইতে প্রকৃতিস্থ হওয়া, নিজের যতটুকু ক্ষমতা ততটুকুর প্রতি আস্থালাভ করা কালক্রমেই ঘটিয়া থাকে।

(যাহাই হোক্ ভারতীর পত্রে পত্রে আমার বাল্যলীলার

অনেক লজ্জা ছাপার কালির কালিমায় অঙ্কিত হইয়া আছে। কেবলমাত্র কাঁচা লেখার জন্য লজ্জা নহে—উদ্ধত অবিনয়, অদ্ভুত আতিশয্য ও সাড়ম্বর কৃত্রিমতার জন্য লজ্জা।

(যাহা লিখিয়াছিলাম তাহার অধিকাংশের জন্য লজ্জা বোধ হয় বটে কিন্তু তখন মনের মধ্যে যে একটা উৎসাহের বিস্ফার সঞ্চারিত হইয়াছিল নিশ্চয়ই তাহার মূল্য সামান্য নহে। সে কালটা তো ভুল করিবারই কাল বটে কিন্তু বিশ্বাস করিবার, আশা করিবার, উল্লাস করিবারও সময় সেই বাল্যকাল। সেই ভুলগুলিকে ইন্ধন করিয়া যদি উৎসাহের আগুন জ্বলিয়া থাকে তবে যাহা ছাই হইবার তাহা ছাই হইয়া যাইবে কিন্তু সেই অগ্নির যা কাজ তাহা ইহজীবনে কখনই ব্যর্থ হইবে না।)

আমেদাবাদ

ভারতী যখন দ্বিতীয় বৎসরে পড়িল মেজদাদা প্রস্তাব করিলেন আমাকে তিনি বিলাতে লইয়া যাইবেন। পিতৃদেব যখন সম্মতি দিলেন তখন আমার ভাগ্যবিধাতার এই আরেকটি অযাচিত বদান্যতায় আমি বিস্মিত হইয়া উঠিলাম।

বিলাতযাত্রার পূর্ব্বে মেজদাদা আমাকে প্রথমে আমেদাবাদে লইয়া গেলেন। তিনি সেখানে জজ্ ছিলেন। আমার বৌঠাকরুণ এবং ছেলেরা তখন ইংলণ্ডে—সুতরাং বাড়ি একপ্রকার জনশূন্য ছিল।

শাহিবাগে জজের বাসা। ইহা বাদ্‌শাহি আমলের প্রাসাদ, বাদশাহের জন্যই নির্ম্মিত। এই প্রাসাদের প্রাকার-পাদমূলে গ্রীষ্মকালের ক্ষীণস্বচ্ছস্রোতা সাবরমতী নদী তাহার বালুশয্যার একপ্রান্ত দিয়া প্রবাহিত হইতেছিল। সেই নদীতীরের দিকে প্রাসাদের সম্মুখভাগে একটি প্রকাণ্ড খোলা ছাদ। মেজদাদা আদালতে চলিয়া যাইতেন। প্রকাণ্ড বাড়িতে আমি ছাড়া আর কেহ থাকিত না—শব্দের মধ্যে কেবল পায়রাগুলির মধ্যাহ্নকূজন শোনা যাইত। তখন আমি যেন একটা অকারণ কৌতূহলে শূন্য ঘরে ঘরে ঘুরিয়া বেড়াইতাম। একটি বড়ো ঘরের দেয়ালের খোপে খোপে মেজদাদার বইগুলি সাজানো ছিল। তাহার মধ্যে, বড়ো বড়ো অক্ষরে ছাপা, অনেকছবিওয়ালা একখানি টেনিসনের কাব্যগ্রন্থ ছিল। সেই গ্রন্থটিও তখন আমার পক্ষে এই রাজপ্রাসাদেরই মতো নীরব ছিল। আমি কেবল তাহার ছবিগুলির মধ্যে বারবার করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতাম। বাক্যগুলি যে একেবারেই বুঝিতাম না, তাহা নহে—কিন্তু তাহা বাক্যের অপেক্ষা, আমার পক্ষে অনেকটা কূজনের মতোই ছিল। লাইব্রেরিতে আর একখানি বই ছিল সেটি ডাক্তার হেবর্লিন কর্ত্তৃক সঙ্কলিত শ্রীরামপুরের ছাপা পুরাতন

সংস্কৃত কাব্যসংগ্রহগ্রন্থ। এই সংস্কৃত কবিতাগুলি বুঝিতে পারা আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল। কিন্তু সংস্কৃত বাক্যের ধ্বনি এবং ছন্দের গতি আমাকে কতদিন মধ্যাহ্নে অমরু-শতকের মৃদঙ্গঘাত-গম্ভীর শ্লোকগুলির মধ্যে ঘুরাইয়া ফিরিয়াছে।

এই শাহিবাগপ্রাসাদের চূড়ার উপরকার একটি ছোটো ঘরে আমার আশ্রম ছিল। কেবল একটি চাকভরা বোল্‌তার দল আমার এই ঘরের অংশী। রাত্রে আমি সেই নির্জ্জন ঘরে শুইতাম—এক একদিন অন্ধকারে দুই একটা বোল্‌তা চাক হইতে আমার বিছানার উপর আসিয়া পড়িত—যখন পাশ ফিরিতাম তখন তাহারাও প্রীত হইত না এবং আমার পক্ষেও তাহা তীক্ষ্ণভাবে অপ্রীতিকর হইত। শুক্লপক্ষের গভীর রাত্রে সেই নদীরদিকের প্রকাণ্ড ছাদ্‌টাতে একলা ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ানো আমার আর-একটা উপসর্গ ছিল। এই ছাদের উপর নিশাচর্য্য করিবার সময়ই আমার নিজের সুর দেওয়া সর্ব্বপ্রথম গানগুলি রচনা করিয়াছিলাম। তাহার মধ্যে "বলি ও আমার গোলাপবালা" গানটি এখনো আমার কাব্যগ্রন্থের মধ্যে আসন রাখিয়াছে।

ইংরাজিতে নিতান্তই কাঁচা ছিলাম বলিয়া সমস্তদিন ডিক্‌সনারি লইয়া নানা ইংরেজি বই পড়িতে আরম্ভ করিয়া দিলাম। বাল্যকাল হইতে আমার একটা অভ্যাস, ছিল, সম্পূর্ণ বুঝিতে না পারিলেও তাহাতে আমার পড়ার বাধা ঘটিত না। অল্পস্বল্প যাহা বুঝিতাম তাহা লইয়া আপনার

মনে একটা কিছু খাড়া করিয়া আমার বেশ একরকম চলিয়া যাইত। এই অভ্যাসের ভালো মন্দ দুইপ্রকার ফলই আমি আজপর্য্যন্ত ভোগ করিয়া আসিতেছি।

বিলাত

এইরূপে আমেদাবাদে ও বোম্বাইয়ে মাসছয়েক কাটাইয়া আমরা বিলাতে যাত্রা করিলাম! অশুভক্ষণে বিলাতযাত্রার পত্র প্রথমে আত্মীয়দিগকে ও পরে ভারতীতে পাঠাইতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। এখন আর এগুলিকে বিলুপ্ত করা আমার সাধ্যের মধ্যে নাই। এই চিঠিগুলির অধিকাংশই বাল্যবয়সের বাহাদুরী। অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া, তর্ক করিয়া, রচনার আতসবাজি করিবার এই প্রয়াস। শ্রদ্ধা করিবার, গ্রহণ করিবার, প্রবেশ লাভ করিবার শক্তিই যে সকলের চেয়ে মহৎ শক্তি, এবং বিনয়ের দ্বারাই যে সকলের চেয়ে বড়ো করিয়া অধিকার বিস্তার করা যায় কাঁচাবয়সে একথা মন বুঝিতে চায় না। ভালোলাগা, প্রশংসাকরা যেন একটা পরাভব, সে যেন দুর্ব্বলতা—এইজন্য কেবলি খোঁচা দিয়া আপনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিবার এই চেষ্টা আমার কাছে আজ হাস্যকর হইতে পারিত যদি ইহার ঔদ্ধত্য ও অসরলতা আমার কাছে কষ্টকর না হইত।

ছেলেবেলা হইতে বাহিরের পৃথিবীর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ছিল না বলিলেই হয়। এমন সময়ে হঠাৎ সতেরো বছর বয়সে বিলাতের জনসমুদ্রের মধ্যে ভাসিয়া পড়িলে খুব একচোট হাবুডুবু খাইবার আশঙ্কা ছিল। কিন্তু আমার মেজবৌ-ঠাকরুণ তখন ছেলেদের লইয়া ব্রাইটনে বাস করিতেছিলেন—তাঁহার আশ্রয়ে গিয়া বিদেশের প্রথম ধাক্কাটা আর গায়ে লাগিল না।

তখন শীত আসিয়া পড়িয়াছে। একদিন ঘরে বসিয়া আগুনের ধারে গল্প করিতেছি, ছেলেরা উত্তেজিত হইয়া আসিয়া কহিল বরফ পড়িতেছে। বাহিরে গিয়া দেখিলাম, কনকনে শীত, আকাশে শুভ্র জ্যোৎস্না এবং পৃথিবী শাদা বরফে ঢাকিয়া গিয়াছে। চিরদিন পৃথিবীর যে মূর্ত্তি দেখিয়াছি এ সে মূর্ত্তিই নয়—এ যেন একটা স্বপ্ন, যেন আর কিছু—সমস্ত কাছের জিনিষ যেন দূরে গিয়া পড়িয়াছে—শুভ্রকায় নিশ্চল তপস্বী যেন গভীর ধ্যানের আবরণে আবৃত। অকস্মাৎ ঘরের বাহির হইয়াই এমন আশ্চর্য্য বিরাট সৌন্দর্য্য আর কখনো দেখি নাই।

বৌঠাকুরাণীর যত্নে এবং ছেলেদের বিচিত্র উৎপাত উপদ্রবের আনন্দে দিন বেশ কাটিতে লাগিল। ছেলেরা আমার অদ্ভুত ইংরেজি উচ্চারণে ভারি আমোদ বোধ করিল। তাহাদের আর সকল রকম খেলায় আমার কোনো বাধা ছিল না, কেবল তাহাদের এই আমোদটাতে আমি সম্পূর্ণ মনে যোগ দিতে পারিতাম না। “warm” শব্দে a-র

উচ্চারণ o-র মতো এবং "worm" শব্দে o-র উচ্চারণ a-র মতো—এটা যে কোনোমতেই সহজজ্ঞানে জানিবার বিষয় নহে সেটা আমি শিশুদিগকে বুঝাইব কী করিয়া? মন্দ-ভাগ্য আমি, তাহাদের হাসিটা আমার উপর দিয়াই গেল, কিন্তু হাসিটা সম্পূর্ণ পাওনা ছিল ইংরাজি উচ্চারণ বিধির। এই দুটি ছোটো ছেলের মন ভোলাইবার, তাহাদিগকে হাসাইবার, আমোদ দিবার নানাপ্রকার উপায় আমি প্রতিদিন উদ্ভাবন করিতাম। ছেলে ভোলাইবার সেই উদ্ভাবনী শক্তি খাটাইবার প্রয়োজন তাহার পরে আরো অনেকবার ঘটিয়াছে—এখনো সে প্রয়োজন যায় নাই। কিন্তু সে শক্তির আর সে অজস্র প্রাচুর্য্য অনুভব করি না। শিশুদের কাছে হৃদয়কে দান করিবার অবকাশ সেই আমার জীবনে প্রথম ঘটিয়াছিল—দানের আয়োজন তাই এমন বিচিত্রভাবে পূর্ণ হইয়া প্রকাশ পাইয়াছিল।

কিন্তু সমুদ্রের এপারের ঘর হইতে বাহির হইয়া সমুদ্রের ওপারের ঘরে প্রবেশ করিবার জন্য তো আমি যাত্রা করি নাই। কথা ছিল পড়াশুনা করিব, ব্যারিষ্টর হইয়া দেশে ফিরিব। তাই একদিন ব্রাইটনে একটি পাব্লিক স্কুলে আমি ভর্ত্তি হইলাম। বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ প্রথমেই আমার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিয়া উঠিলেন, বাহবা, তোমার মাথাটা তো চমৎকার! (What a splendid head you have!) এই ছোটো কথাটা যে আমার মনে আছে তাহার কারণ এই যে, বাড়িতে আমার দর্পহরণ করিবার জন্য যাঁহার প্রবল

অধ্যবসায় ছিল—তিনি বিশেষ করিয়া আমাকে এই কথাটি বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে আমার ললাট এবং মুখশ্রী পৃথিবীর অন্য অনেকের সহিত তুলনায় কোনোমতে মধ্যমশ্রেণীর বলিয়া গণ্য হইতে পারে। আশা করি এটাকে পাঠকেরা আমার গুণ বলিয়াই ধরিবেন যে আমি তাঁহার কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়াছিলাম এবং আমার সম্বন্ধে সৃষ্টিকর্ত্তার নানা-প্রকার কার্পণ্যে দুঃখ অনুভব করিয়া নীরব হইয়া থাকিতাম। এইরূপে ক্রমে ক্রমে তাঁহার মতের সঙ্গে বিলাতবাসীর মতের দুটো একটা বিষয়ে পার্থক্য দেখিতে পাইয়া অনেকবার গম্ভীর হইয়া ভাবিয়াছি হয় তো উভয় দেশের বিচারের প্রণালী ও আদর্শ সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

ব্রাইটনের এই স্কুলের একটা জিনিষ লক্ষ্য করিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছিলাম—ছাত্রেরা আমার সঙ্গে কিছুমাত্র রূঢ় ব্যবহার করে নাই। অনেক সময়ে তাহারা আমার পকেটের মধ্যে কমলালেবু আপেল প্রভৃতি ফল গুঁজিয়া দিয়া পলাইয়া গিয়াছে। আমি বিদেশী বলিয়াই আমার প্রতি তাহাদের এইরূপ আচরণ ইহাই আমার বিশ্বাস।

এইস্কুলেও আমার বেশি দিন পড়া চলিল না—সেটা ইস্কুলের দোষ নয়। তখন তারক পালিত মহাশয় ইংলণ্ডে ছিলেন। তিনি বুঝিলেন এমন করিয়া আমার কিছু হইবে না। তিনি মেজদাদাকে বলিয়া আমাকে লণ্ডনে আনিয়া প্রথমে একটা বাসায় একলা ছাড়িয়া দিলেন। সে বাসাটা ছিল রিজেণ্ট উদ্যানের সম্মুখেই। তখন ঘোরতর শীত।

সম্মুখের বাগানের গাছগুলায় একটিও পাতা নাই—বরফে ঢাকা আঁকাবাঁকা রোগা ডালগুলা লইয়া তাহারা সারিসারি আকাশের দিকে তাকাইয়া খাড়া দাঁড়াইয়া আছে—দেখিয়া আমার হাড়গুলার মধ্যে পর্য্যন্ত যেন শীত করিতে থাকিত। নবাগত প্রবাসীর পক্ষে শীতের লণ্ডনের মতো এমন নির্ম্মম স্থান আর কোথাও নাই। কাছাকাছির মধ্যে পরিচিত কেহ নাই, রাস্তাঘাট ভালো করিয়া চিনি না। একলা ঘরে চুপ করিয়া বসিয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া থাকিবার দিন আবার আমার জীবনে ফিরিয়া আসিল। কিন্তু বাহির তখন মনোরম নহে, তাহার ললাটে ভ্রূকুটি; আকাশের রং ঘোলা, আলোক মৃতব্যক্তির চক্ষুতারার মতো দীপ্তিহীন, দশদিক আপনাকে সঙ্কুচিত করিয়া আনিয়াছে, জগতের মধ্যে উদার আহ্বান নাই। ঘরের মধ্যে আসবাব প্রায় কিছুই ছিল না—দৈবক্রমে কী কারণে একটা হার্ম্মোনিয়ম ছিল। দিন যখন সকালসকাল অন্ধকার হইয়া আসিত তখন সেই যন্ত্রটা আপন মনে বাজাইতাম। কখনো কখনো ভারতবর্ষীয় কেহ কেহ আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিতেন। তাঁহাদের সঙ্গে আমার পরিচয় অতি অল্পই ছিল। কিন্তু যখন বিদায় লইয়া তাঁহারা উঠিয়া চলিয়া যাইতেন আমার ইচ্ছা করিত কোট ধরিয়া তাঁহাদিগকে টানিয়া আবার ঘরে আনিয়া বসাই।

এই বাসায় থাকিবার সময় একজন আমাকে লাটিন শিখাইতে আসিতেন। লোকটি অত্যন্ত রোগা—গায়ের কাপড় জীর্ণপ্রায়—শীতকালের নগ্ন গাছগুলার মতোই তিনি

যেন আপনাকে শীতের হাত হইতে বাঁচাইতে পারিতেন না। তাঁহার বয়স কত ঠিক জানি না কিন্তু তিনি যে আপন বয়সের চেয়ে বুড়া হইয়া গিয়াছেন তাহা তাঁহাকে দেখিলেই বুঝা যায়। একএকদিন আমাকে পড়াইবার সময় তিনি যেন কথা খুঁজিয়া পাইতেন না, লজ্জিত হইয়া পড়িতেন। তাঁহার পরিবারের সকল লোকে তাঁহাকে বাতিকগ্রস্ত বলিয়া জানিত। একটা মত তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছিল। তিনি বলিতেন পৃথিবীতে একএকটা যুগে একই সময়ে ভিন্নভিন্ন দেশের মানবসমাজে একই ভাবের আবির্ভাব হইয়া থাকে; অবশ্য সভ্যতার তারতম্য অনুসারে সেই ভাবের রূপান্তর ঘটিয়া থাকে কিন্তু হাওয়াটা একই। পরস্পরের দেখাদেখি যে একই ভাব ছড়াইয়া পড়ে তাহা নহে যেখানে দেখাদেখি নাই সেখানেও অন্যথা হয় না। এই মতটিকে প্রমাণ করিবার জন্য তিনি কেবলি তথ্যসংগ্রহ করিতেছেন ও লিখিতেছেন। এদিকে ঘরে অন্ন নাই, গায়ে বস্ত্র নাই তাঁহার মেয়েরা তাঁহার মতের প্রতি শ্রদ্ধা মাত্র করে না এবং সম্ভবত এই পাগলামির জন্য তাঁহাকে ভৎসনা করিয়া থাকে। একএকদিন তাঁহার মুখ দেখিয়া বুঝা যাইত—ভালো কোনো একটা প্রমাণ পাইয়াছেন, লেখা অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। আমি সেদিন সেই বিষয়ে কথা উত্থাপন করিয়া তাঁহার উৎসাহে আরো উৎসাহসঞ্চার করিতাম, আবার এক একদিন তিনি বড়ো বিমর্ষ হইয়া আসিতেন—যেন, যে ভার তিনি গ্রহণ করিয়াছেন তাহা আর বহন করিতে পারিতেছেন না। সেদিন পড়ানোর পদে পদে

বাধা ঘটিত, চোখ দুটো কোন্ শূন্যের দিকে তাকাইয়া থাকিত, মনটাকে কোনোমতেই প্রথমপাঠ্য লাটিন ব্যাকরণের মধ্যে টানিয়া আনিতে পারিতেন না। এই ভাবের ভারে ও লেখার দায়ে অবনত অনশনক্লিষ্ট লোকটিকে দেখিলে আমার বড়োই বেদনা বোধ হইত। যদিও বেশ বুঝিতেছিলাম ইঁহার দ্বারা আমার পড়ার সাহায্য প্রায় কিছুই হইবে না—তবুও কোনো-মতেই ইঁহাকে বিদায় করিতে আমার মন সরিল না। যে কয়দিন সে বাসায় ছিলাম এমনি করিয়া লাটিন পড়িবার ছল করিয়াই কাটিল। বিদায় লইবার সময় যখন তাঁহার বেতন চুকাইতে গেলাম তিনি করুণস্বরে আমাকে কহিলেন—আমি কেবল তোমার সময় নষ্ট করিয়াছি, আমি তো কোনো কাজই করি নাই, আমি তোমার কাছ হইতে বেতন লইতে পারিব না। আমি তাঁহাকে অনেক কষ্টে বেতন লইতে রাজি করিয়া-ছিলাম। 'আমার সেই লাটিনশিক্ষক যদিচ তাঁহার মতকে আমার সমক্ষে প্রমাণসহ উপস্থিত করেন নাই তবু তাঁহার সে কথা আমি এ পর্য্যন্ত অবিশ্বাস করি না। (এখনো আমার এই বিশ্বাস যে সমস্ত মানুষের মনের সঙ্গে মনের একটি অখণ্ড গভীর যোগ আছে ; তাহার এক জায়গায় যে-শক্তির ক্রিয়া ঘটে অন্যত্র গূঢ়ভাবে তাহা সংক্রামিত হইয়া থাকে।)

এখান হইতে পালিত মহাশয় আমাকে বার্কার নামক একজন শিক্ষকের বাসায় লইয়া গেলেন। ইনি বাড়িতে ছাত্রদিগকে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করিয়া দিতেন। ইঁহার ঘরে ইঁহার ভালোমানুষ স্ত্রীটি ছাড়া অত্যল্পমাত্রও রম্য জিনিষ

কিছুই ছিল না। এমন শিক্ষকের ছাত্র যে কেন জোটে তাহা বুঝিতে পারি, কারণ ছাত্রবেচারাদের নিজের পছন্দ প্রয়োগ করিবার সুযোগ ঘটেনা—কিন্তু এমন মানুষেরও স্ত্রী মেলে কেমন করিয়া সে কথা ভাবিলে মন ব্যথিত হইয়া উঠে। বার্কারজায়ার সান্ত্বনার সামগ্রী ছিল একটি কুকুর—কিন্তু স্ত্রীকে যখন বার্কার দণ্ড দিতে ইচ্ছা করিতেন তখন পীড়া দিতেন সেই কুকুরকে। সুতরাং এই কুকুরকে অবলম্বন করিয়া মিসেস্ বার্কার আপনার বেদনার ক্ষেত্রকে আরো খানিকটা বিস্তৃত করিয়া তুলিয়াছিলেন।

এমন সময় বৌঠাকুরাণী যখন ডেভনশিয়রে টর্কিনগর হইতে ডাক দিলেন তখন আনন্দে সেখানে দৌড় দিলাম। সেখানে পাহাড়ে, সমুদ্রে, ফুলবিছানো প্রান্তরে, পাইনবনের ছায়ায় আমার দুইটি লীলাচঞ্চল শিশু সঙ্গীকে লইয়া কী সুখে কাটিয়াছিল বলিতে পারি না। দুই চক্ষু যখন মুগ্ধ, মন আনন্দে অভিষিক্ত, এবং অবকাশে পূর্ণ দিনগুলি নিষ্কণ্টক সুখের বোঝা লইয়া প্রত্যহ অনন্তের নিস্তব্ধ নীলাকাশসমুদ্রে পাড়ি দিতেছে তখনো কেন যে মনের মধ্যে কবিতা লেখার তাগিদ আসিতেছে না এই কথা চিন্তা করিয়া এক-একদিন মনে আঘাত পাইয়াছি। তাই একদিন খাতা হাতে ছাতা-মাথায় নীল সাগরের শৈলবেলায় কবির কর্ত্তব্য পালন করিতে গেলাম। জায়গাটি সুন্দর বাছিয়াছিলাম—কারণ, সেটা তো ছন্দও নহে ভাবও নহে। একটি সমুচ্চ শিলাতট চিরব্যগ্রতার মতো সমুদ্রের অভিমুখে শূন্যে ঝুঁকিয়া রহিয়াছে;—সম্মুখের

ফেনরেখাঙ্কিত তরল নীলিমার দোলার উপর দিনের আকাশ দোল খাইয়া তরঙ্গের কলগানে হাসিমুখে ঘুমাইতেছে— পশ্চাতে সারিবাঁধা পাইনের সুগন্ধি ছায়াখানি বনলক্ষ্মীর আলস্যস্খলিত আঁচলটির মতো ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সেই শিলাসনে বসিয়া "মগ্নতরী" নামে একটি কবিতা লিখিয়াছিলাম। সেইখানেই সমুদ্রের জলে সেটাকে মগ্ন করিয়া দিয়া আসিলে আজ হয়তো বসিয়া বসিয়া ভাবিতে পারিতাম যে, সে জিনিষটা বেশ ভালোই হইয়াছিল। কিন্তু সে রাস্তা বন্ধ হইয়া গেছে। দুর্ভাগ্যক্রমে এখনো সে সশরীরে সাক্ষ্য দিবার জন্য বর্ত্তমান। গ্রন্থাবলী হইতে যদিও সে নির্ব্বাসিত তবু সপিনাজারি করিলে তাহার ঠিকানা পাওয়া দুঃসাধ্য হইবে না।

কিন্তু কর্ত্তব্যের পেয়াদা নিশ্চিন্ত হইয়া নাই! আবার তাগিদ আসিল—আবার লণ্ডনে ফিরিয়া গেলাম। এবারে ডাক্তার স্কট্ নামে একজন ভদ্র গৃহস্থের ঘরে আমার আশ্রয় জুটিল। একদিন সন্ধ্যার সময় বাক্স তোরঙ্গ লইয়া তাঁহাদের ঘরে প্রবেশ করিলাম। বাড়িতে কেবল পক্ককেশ ডাক্তার, তাঁহার গৃহিণী ও তাঁহাদের বড়ো মেয়েটি আছেন। ছোট দুই জন মেয়ে ভারতবর্ষীয় অতিথির আগমন-আশঙ্কায় অভিভূত হইয়া কোনো আত্মীয়ের বাড়ি পলায়ন করিয়াছেন। বোধ করি যখন তাঁহারা সংবাদ পাইলেন আমার দ্বারা কোনো সাংঘাতিক বিপদের আশু সম্ভাবনা নাই তখন তাঁহারা ফিরিয়া আসিলেন।

অতি অল্পদিনের মধ্যেই আমি ইহাদের ঘরের লোকের মতো হইয়া গেলাম। মিসেস্ স্কট্ আমাকে আপন ছেলের মতোই স্নেহ করিতেন। তাঁহার মেয়েরা আমাকে যেরূপ মনের সঙ্গে যত্ন করিতেন তাহা আত্মীয়দের কাছ হইতেও পাওয়া দুর্লভ।

এই পরিবারে বাস করিয়া একটি জিনিষ আমি লক্ষ্য করিয়াছি—মানুষের প্রকৃতি সব জায়গাতেই সমান। আমরা বলিয়া থাকি এবং আমিও তাহা বিশ্বাস করিতাম যে আমাদের দেশে পতিভক্তির একটি বিশিষ্টতা আছে, য়ুরোপে তাহা নাই। কিন্তু আমাদের দেশের সাধ্বী গৃহিণীর সঙ্গে মিসেস্ স্কটের আমি তো বিশেষ পার্থক্য দেখি নাই। স্বামীর সেবায় তাঁহার সমস্ত মন ব্যাপৃত ছিল। মধ্যবিত্ত গৃহস্থঘরে চাকরবাকরদের উপসর্গ নাই, প্রায় সব কাজই নিজের হাতে করিতে হয়, এইজন্য স্বামীর প্রত্যেক ছোটোখাটো কাজটিও মিসেস্ স্কট নিজের হাতে করিতেন। সন্ধ্যার সময় স্বামী কাজ করিয়া ঘরে ফিরিবেন, তাহার পূর্ব্বে আগুনের ধারে তিনি স্বামীর আরামকেদারা ও তাঁহার পশমের জুতোজোড়াটি স্বহস্তে গুছাইয়া রাখিতেন। ডাক্তার স্কটের কী ভালো লাগে, আর না লাগে, কোন্ ব্যবহার তাঁহার কাছে প্রিয় বা অপ্রিয় সে কথা মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার স্ত্রী ভুলিতেন না। প্রাতঃকালে একজনমাত্র দাসীকে লইয়া নিজে উপরের তলা হইতে নীচের রান্নাঘর, সিঁড়ি এবং দরজার গায়ের পিতলের কাজগুলিকে পর্য্যন্ত ধুইয়া মাজিয়া তক্‌তকে ঝক্‌ঝকে করিয়া রাখিয়া

দিতেন। ইহার পরে লোকলৌকিকতার নানা কর্ত্তব্য তো আছেই। গৃহস্থালীর সমস্ত কাজ সারিয়া সন্ধ্যার সময় আমাদের পড়াশুনা গান বাজনায় তিনি সম্পূর্ণ যোগ দিতেন; অবকাশের কালে আমোদ প্রমোদকে জমাইয়া তোলা, সেটাও গৃহিণীর কর্ত্তব্যেরই অঙ্গ।

মেয়েদের লইয়া এক একদিন সন্ধ্যাবেলায় সেখানে টেবিল-চালা হইত। আমরা কয়েকজনে মিলিয়া একটা টিপাইয়ে হাত লাগাইয়া থাকিতাম, আর টিপাইটা ঘরময় উন্মত্তের মতো দাপাদাপি করিয়া বেড়াইত। ক্রমে এমন হইল আমরা যাহাতে হাত দিই তাহাই নড়িতে থাকে। মিসেস্ স্কটের এটা যে খুব ভালো লাগিত তাহা নহে। তিনি মুখ গম্ভীর করিয়া এক একবার মাথা নাড়িয়া বলিতেন, আমার মনে হয় এটা ঠিক বৈধ হইতেছে না। কিন্তু তবু তিনি আমাদের এই ছেলেমানুষিকাণ্ডে জোর করিয়া বাধা দিতেন না, এই অনাচার সহ্য করিয়া যাইতেন। একদিন ডাক্তার স্কটের লম্বা টুপি লইয়া সেটার উপর হাত রাখিয়া যখন চালিতে গেলাম তিনি ব্যাকুল হইয়া তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন না, না, ও টুপি চালাইতে পারিবে না। তাঁহার স্বামীর মাথায় টুপিতে মুহূর্ত্তের জন্য সয়তানের সংস্রব ঘটে ইহা তিনি সহিতে পারিলেন না।

এই সমস্তের মধ্যে একটি জিনিষ দেখিতে পাইতাম সেটি স্বামীর প্রতি তাঁহার ভক্তি। তাঁহার সেই আত্মবিসর্জ্জনপর মধুর নম্রতা স্মরণ করিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারি স্ত্রীলোকের

প্রেমের স্বাভাবিক চরম পরিণাম ভক্তি। যেখানে তাহাদের প্রেম আপন বিকাশে কোনো বাধা পায় নাই সেখানে তাহা আপনিই পূজায় আসিয়া ঠেকে। যেখানে ভোগবিলাসের আয়োজন প্রচুর যেখানে আমোদপ্রমোদেই দিনরাত্রিকে আবিল করিয়া রাখে সেখানে এই প্রেমের বিকৃতি ঘটে; সেখানে স্ত্রী প্রকৃতি আপনার পূর্ণ আনন্দ পায় না।

কয়েক মাস এখানে কাটিয়া গেল। মেজদাদাদের দেশে ফিরিবার সময় উপস্থিত হইল। পিতা লিখিয়া পাঠাইলেন আমাকেও তাঁহাদের সঙ্গে ফিরিতে হইবে। সে প্রস্তাবে আমি খুসি হইয়া উঠিলাম। দেশের আলোক দেশের আকাশ আমাকে ভিতরে ভিতরে ডাক দিতেছিল। বিদায়-গ্রহণকালে মিসেস্ স্কট আমার দুই হাত ধরিয়া কাঁদিয়া কহিলেন, এমন করিয়াই যদি চলিয়া যাইবে তবে এত অল্প-দিনের জন্য তুমি কেন এখানে আসিলে?—লণ্ডনে এই গৃহটি এখন আর নাই—এই ডাক্তার-পরিবারের কেহ বা পরলোকে কেহ বা ইহলোকে কে কোথায় চলিয়া গিয়াছেন তাহার কোনো সংবাদই জানি না কিন্তু সেই গৃহটি আমার মনের মধ্যে চিরপ্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে।

একবার শীতের সময় আমি টন্‌ব্রিজ্ ওয়েল্‌স্ সহরের রাস্তা দিয়া যাইবার সময় দেখিলাম একজন লোক রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়া আছে; তাহার ছেঁড়া জুতার ভিতর দিয়া পা দেখা যাইতেছে পায়ে মোজা নাই বুকের খানিকটা খোলা। ভিক্ষা করা নিষিদ্ধ বলিয়া সে আমাকে কোনো কথা বলিল

না, কেবল মুহূর্ত্তকালের জন্য আমার মুখের দিকে তাকাইল। আমি তাহাকে যে মুদ্রা দিলাম তাহা তাহার পক্ষে প্রত্যাশার অতীত ছিল। আমি কিছু দূর চলিয়া আসিলে সে তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া কহিল, "মহাশয় আপনি আমাকে ভ্রমক্রমে একটি স্বর্ণমুদ্রা দিয়াছেন," বলিয়া সেই মুদ্রাটি আমাকে ফিরাইয়া দিতে উদ্যত হইল। এই ঘটনাটি হয় তো আমার মনে থাকিত না কিন্তু ইহার অনুরূপ আর একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল। বোধ করি টর্কি ষ্টেসনে প্রথম যখন পৌঁছিলাম একজন মুটে আমার মোট লইয়া ঠিকাগাড়িতে তুলিয়া দিল। টাকার থলি খুলিয়া পেনিজাতীয় কিছু পাইলাম না, একটি অর্দ্ধক্রাঁউন ছিল সেইটিই তাহার হাতে দিয়া গাড়ি ছাড়িয়া দিলাম। কিছুক্ষণ পরে দেখি সেই মুটে গাড়ির পিছনে ছুটিতে ছুটিতে গাড়োয়ানকে গাড়ি থামাইতে বলিতেছে। আমি মনে ভাবিলাম, সে আমাকে নির্ব্বোধ বিদেশী ঠাহরাইয়া আরো কিছু দাবী করিতে আসিতেছে। গাড়ি থামিলে সে আমাকে বলিল. আপনি বোধ করি, পেনি মনে করিয়া আমাকে অর্দ্ধক্রাউন দিয়াছেন।

যত দিন ইংলণ্ডে ছিলাম কেহ আমাকে বঞ্চনা করে নাই তাহা বলিতে পারি না—কিন্তু তাহা মনে করিয়া রাখিবার বিষয় নহে এবং তাহাকে বড়ো করিয়া দেখিলে অবিচার করা হইবে। আমার মনে এই কথাটা খুব লাগিয়াছে যে যাহারা নিজে বিশ্বাস নষ্ট করে না তাহারাই অন্যকে বিশ্বাস করে। আমরা সম্পূর্ণ বিদেশী অপরিচিত, যখন খুসি ফাঁকি দিয়া

দৌড় মারিতে পারি—তবু সেখানে দোকানে বাজারে কেহ আমাদিগকে কিছু সন্দেহ করে নাই।

যতদিন বিলাতে ছিলাম সুরু হইতে শেষ পর্য্যন্ত একটি প্রহসন আমার প্রবাসবাসের সঙ্গে জড়িত হইয়াছিল। ভারতবর্ষের একজন উচ্চ ইংরেজ কর্ম্মচারীর বিধবা স্ত্রীর সহিত আমার আলাপ হইয়াছিল। তিনি স্নেহ করিয়া আমাকে রুবি বলিয়া ডাকিতেন। তাঁহার স্বামীর মৃত্যুউপলক্ষে তাঁহার ভারতবর্ষীয় এক বন্ধু ইংরেজিতে একটি বিলাপগান রচনা করিয়াছিলেন। তাহার ভাষানৈপুণ্য ও কবিত্বশক্তিসম্বন্ধে অধিক বাক্যব্যয় করিতে ইচ্ছা করি না। আমার দুর্ভাগ্যক্রমে, সেই কবিতাটি বেহাগরাগিণীতে গাহিতে হইবে এমন একটা উল্লেখ ছিল। আমাকে একদিন তিনি ধরিলেন এই গানটা তুমি বেহাগরাগিণীতে গাহিয়া আমাকে শুনাও। আমি নিতান্ত ভালোমানুষী করিয়া তাঁহার কথাটা রক্ষা করিয়াছিলাম। সেই অদ্ভুত কবিতার সঙ্গে বেহাগ সুরের সম্মিলনটা যে কিরূপ হাস্যকর হইয়াছিল তাহা আমি ছাড়া বুঝিবার দ্বিতীয় কোনো লোক সেখানে উপস্থিত ছিল না। মহিলাটি ভারতবর্ষীয় সুরে তাঁহার স্বামীর শোকগাথা শুনিয়া খুব খুসি হইলেন। আমি মনে করিলাম এইখানেই পালা শেষ হইল—কিন্তু হইল না।

সেই বিধবা রমণীর সঙ্গে নিমন্ত্রণসভায় প্রায়ই আমার দেখা হইত। আহারান্তে বৈঠকখানাঘরে যখন নিমন্ত্রিত স্ত্রীপুরুষ সকলে একত্রে সমবেত হইতেন তখন তিনি আমাকে

সেই বেহাগ গান করিবার জন্ম অনুরোধ করিতেন। অন্য সকলে ভাবিতেন ভারতবর্ষীয় সঙ্গীতের একটা বুঝি আশ্চর্য্য নমুনা শুনিতে পাইবেন—তাঁহারা সকলে মিলিয়া সানুনয় অনুরোধে যোগ দিতেন, মহিলাটির পকেট হইতে সেই ছাপানো কাগজখানি বাহির হইত—আমার কর্ণমূল রক্তিম আভা ধারণ করিত। নতশিরে লজ্জিতকণ্ঠে গান ধরিতাম—স্পষ্টই বুঝিতে পারিতাম এই শোকগাথার ফল আমার পক্ষে ছাড়া আর কাহারো পক্ষে যথেষ্ট শোচনীয় হইত না। গানের শেষে চাপা হাসির মধ্য হইতে শুনিতে পাইতাম Thank you very much. How interesting!" তখন শীতের মধ্যেও আমার শরীর ঘর্ম্মাক্ত হইবার উপক্রম করিত। এই ভদ্রলোকের মৃত্যু আমার পক্ষে যে এতবড়ো একটা দুর্ঘটনা হইয়া উঠিবে তাহা আমার জন্মকালে বা তাঁহার মৃত্যুকালে কে মনে করিতে পারিত।

তাহার পরে আমি যখন ডাক্তার স্কটের বাড়িতে থাকিয়া লণ্ডন য়ুনিভর্সিটিতে পড়া আরম্ভ করিলাম তখন কিছুদিন সেই মহিলাটির সঙ্গে আমার দেখাসাক্ষাৎ বন্ধ ছিল। লণ্ডনের বাহিরে কিছু দূরে তাঁহার বাড়ি ছিল। সেই বাড়িতে যাইবার জন্য, তিনি প্রায় আমাকে অনুরোধ করিয়া চিঠি লিখিতেন। আমি শোকগাথার ভয়ে কোনোমতেই রাজি হইতাম না। অবশেষে একদিন তাঁহার সানুনয় একটি টেলিগ্রাফ পাইলাম। টেলিগ্রাফ যখন পাইলাম তখন কলেজে যাইতেছি। এদিকে তখন কলিকাতায় ফিরিবার

সময়ও আসন্ন হইয়াছে। মনে করিলাম এখান হইতে চলিয়া যাইবার পূর্ব্বে বিধবার অনুরোধটা পালন করিয়া যাইব।

কলেজ হইতে বাড়ি না গিয়া একেবারে ষ্টেসনে গেলাম। সেদিন বড়ো দুর্য্যোগ। খুব শীত, বরফ পড়িতেছে, কুয়াশায় আচ্ছন্ন। যেখানে যাইতে হইবে সেই ষ্টেসনেই এ লাইনের শেষ গম্যস্থান—তাই নিশ্চিন্ত হইয়া বসিলাম। কখন গাড়ি হইতে নামিতে হইবে তাহা সন্ধান লইবার প্রয়োজন বোধ করিলাম না।

দেখিলাম ষ্টেসনগুলি সব ডানদিকে আসিতেছে। তাই ডানদিকের জানলা ঘেঁসিয়া বসিয়া গাড়ির দীপালোকে একটা বই পড়িতে লাগিলাম। সকালসকাল সন্ধ্যা হইয়া অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে—বাহিরে কিছুই দেখা যায় না। লণ্ডন হইতে যে কয়জন যাত্রী আসিয়াছিল তাহারা নিজ নিজ গম্যস্থানে একে একে নামিয়া গেল।

গন্তব্য ষ্টেশনের পূর্ব্বষ্টেশন ছাড়িয়া গাড়ি চলিল। এক জায়গায় একবার গাড়ি থামিল। জানলা হইতে মুখ বাড়াইয়া দেখিলাম সমস্ত অন্ধকার। লোকজন নাই, আলো নাই, প্লাটফর্ম্ম নাই, কিছুই নাই। ভিতরে যাহারা থাকে তাহারাই প্রকৃত তত্ত্বজানা হইতে বঞ্চিত—রেলগাড়ি কেন যে অস্থানে অসময়ে থামিয়া বসিয়া থাকে রেলের আরোহীদের তাহা বুঝিবার উপায় নাই অতএব পুনরায় পড়ায় মন দিলাম। কিছুক্ষণ বাদে গাড়ি পিছু হটিতে লাগিল—মনে ঠিক করিলাম রেলগাড়ির চরিত্র বুঝিবার চেষ্টা করা মিথ্যা।

কিন্তু যখন দেখিলাম যে-ষ্টেশনটি ছাড়িয়া গিয়াছিলাম সেই ষ্টেশনে আসিয়া গাড়ি থামিল তখন উদাসীন থাকা আমার পক্ষে কঠিন হইল। ষ্টেশনের লোককে জিজ্ঞাসা করিলাম অমুক ষ্টেশন কখন পাওয়া যাইবে? সে কহিল সেইখান হইতেই তো এগাড়ি এইমাত্র আসিয়াছে। ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম কোথায় যাইতেছে? সে কহিল লণ্ডনে। বুঝিলাম এ গাড়ি খেয়াগাড়ি, পারাপার করে। ব্যতিব্যস্ত হইয়া হঠাৎ সেইখানে নামিয়া পড়িলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, উত্তরের গাড়ি কখন পাওয়া যাইবে? সে কহিল আজ রাত্রে নয়। জিজ্ঞাসা করিলাম কাছাকাছির মধ্যে সরাই কোথাও আছে? সে বলিল, পাঁচ মাইলের মধ্যে না।

প্রাতে দশটার সময় আহার করিয়া বাহির হইয়াছি ইতিমধ্যে জলস্পর্শ করি নাই। কিন্তু বৈরাগ্য ছাড়া যখন দ্বিতীয় কোনো পথ খোলা না থাকে তখন নিবৃত্তিই সব চেয়ে সোজা। মোটা ওভারকোটের বোতাম গলা পর্য্যন্ত আঁটিয়া ষ্টেশনের দীপস্তম্ভের নীচে বেঞ্চের উপর বসিয়া বই পড়িতে লাগিলাম। বইটা ছিল স্পেন্সরের Data of Ethics সেটি তখন সবেমাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। গত্যন্তর যখন নাই তখন এই জাতীয় বই মনোযোগ দিয়া পড়িবার এমন পরিপূর্ণ অবকাশ আর জুটিবে না এই বলিয়া মনকে প্রবোধ দিলাম।

কিছুকাল পরে পোর্টার আসিয়া কহিল, আজ একটি স্পেশাল আছে—আধঘণ্টার মধ্যে আসিয়া পৌঁছিবে। শুনিয়া মনে এতো স্ফূর্ত্তির সঞ্চার হইল যে তাহার পর হইতে

Data of Ethics-এ মনোযোগ করা আমার পক্ষে অসাধ্য হইয়া উঠিল।

সাতটার সময় যেখানে পৌঁছিবার কথা সেখানে পৌঁছিতে সাড়ে নয়টা হইল। গৃহকর্ত্রী কহিলেন, একি রুবি, ব্যাপার-খানা কী? আমি আমার আশ্চর্য্য ভ্রমণবৃত্তান্তটি খুব যে সগর্ব্বে বলিলাম তাহা নয়।

তখন সেখানকার নিমন্ত্রিতগণ ডিনার শেষ করিয়াছেন। আমার মনে ধারণা ছিল যে, আমার অপরাধ যখন স্বেচ্ছাকৃত নহে তখন গুরুতর দণ্ডভোগ করিতে হইবে না—বিশেষতঃ রমণী যখন বিধানকর্ত্রী। কিন্তু উচ্চপদস্থ ভারতকর্ম্মচারীর বিধবা স্ত্রী আমাকে বলিলেন—এস রুবি, এক পেয়ালা চা খাইবে।

আমি কোনো দিন চা খাই না কিন্তু জঠরানল নির্ব্বাপনের পক্ষে পেয়ালা যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য করিতে পারে মনে করিয়া গোটাদুয়েক চক্রাকার বিস্কুটের সঙ্গে সেই কড়া চা গিলিয়া ফেলিলাম। বৈঠকখানা ঘরে আসিয়া দেখিলাম অনেকগুলি প্রাচীনা নারীর সমাগম হইয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে একজন সুন্দরী যুবতী ছিলেন তিনি আমেরিকান এবং তিনি গৃহস্বামীর যুবক ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত বিবাহের পূর্ব্বে পূর্ব্বরাগের পালা উদ্‌যাপন করিতেছেন। ঘরের গৃহিণী বলিলেন এবার তবে নৃত্য সুরু করা যাক্। আমার নৃত্যের কোনো প্রয়োজন ছিল না, এবং শরীরমনের অবস্থাও নৃত্যের অনুকূল ছিল না। কিন্তু অত্যন্ত ভালো-মানুষ যাহারা জগতে

তাহারা অসাধ্যসাধন করে। সেই কারণে যদিচ এই নৃত্য-সভাটি সেই যুবকযুবতীর জন্যই আহূত তাথাপি দশঘণ্টা উপবাসের পর দুইখণ্ড বিস্কুট খাইয়া তিনকালউত্তীর্ণ প্রাচীন রমণীদের সঙ্গে নৃত্য করিলাম।

এইখানেই দুঃখের অবধি হইল না। নিমন্ত্রণকর্ত্রী আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, রুবি আজ তুমি রাত্রিযাপন করিবে কোথায়? এ প্রশ্নের জন্য আমি একেবারেই প্রস্তুত ছিলাম না। আমি হতবুদ্ধি হইয়া যখন তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলাম তিনি কহিলেন রাত্রি দ্বিপ্রহরে এখানকার সরাই বন্ধ হইয়া যায় অতএব আর বিলম্ব না করিয়া এখনি তোমার সেখানে যাওয়া কর্ত্তব্য। সৌজন্যের একেবারে অভাব ছিল না—সরাই আমাকে নিজে খুঁজিয়া লইতে হয় নাই। লণ্ঠন ধরিয়া একজন ভৃত্য আমাকে সরাইয়ে পৌঁছাইয়া দিল।

মনে করিলাম, হয়তো শাপে বর হইল—হয়তো এখানে আহারের ব্যবস্থা আছে। জিজ্ঞাসা করিলাম আমিষ হউক, নিরামিষ হউক, তাজা হউক, বাসি হউক কিছু খাইতে পাইব কি? তাহারা কহিল মদ্য যত চাও পাইবে খাদ্য নয়। তখন ভাবিলাম নিদ্রাদেবীর হৃদয় কোমল তিনি আহার না দিন্ বিস্মৃতি দিবেন। কিন্তু তাঁহার জগৎজোড়া অঙ্কেও তিনি সে রাত্রে আমাকে স্থান দিলেন না। বেলেপাথরের মেজেওয়ালা ঘর ঠাণ্ডা কন্‌কন্ করিতেছে; একটি পুরাতন খাট ও একটি জীর্ণ মুখ ধুইবার টেবিল ঘরের আসবাব।

সকাল বেলায় ইঙ্গভারতী বিধবাটি প্রাতরাশ খাইবার জন্য ডাকিয়া পাঠাইলেন। ইংরেজি দস্তুরে যাহাকে ঠাণ্ডা খাবার বলে তাহারই আয়োজন। অর্থাৎ গতরাত্রির ভোজের অবশেষ আজ ঠাণ্ডা অবস্থায় খাওয়া গেল। ইহারই অতি যৎসামান্য কিছু অংশ যদি উষ্ণ বা কবোষ্ণ আকারে কাল পাওয়া যাইত তাহা হইলে পৃথিবীতে কাহারো কোনো গুরুতর ক্ষতি হইত না—অথচ আমার নৃত্যটা ডাঙায়তোলা কইমাছের নৃত্যের মতো এমন শোকাবহ হইতে পারিত না।

আহারান্তে নিমন্ত্রণকর্ত্রী কহিলেন, যাঁহাকে গান শুনাইবার জন্য তোমাকে ডাকিয়াছি তিনি অসুস্থ শয্যাগত: তাঁহার শয়নগৃহের বাহিরে দাঁড়াইয়া তোমাকে গাহিতে হইবে। সিঁড়ির উপর আমাকে দাঁড় করাইয়া দেওয়া হইল। রুদ্ধদ্বারের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া গৃহিণী কহিলেন, ঐ ঘরে তিনি আছেন। আমি সেই অদৃশ্য রহস্যের অভিমুখে দাঁড়াইয়া শোকের গান বেহাগরাগিণীতে গাহিলাম, তাহার পর রোগিণীর অবস্থা কী হইল সে সংবাদ লোকমুখে বা সংবাদপত্রে জানিতে পাই নাই।

লণ্ডনে ফিরিয়া আসিয়া দুই তিন দিন বিছানায় পড়িয়া নিরঙ্কুশ ভালোমানুষীর প্রায়শ্চিত্ত করিলাম। ডাক্তারের মেয়েরা কহিলেন, দোহাই তোমার, এই নিমন্ত্রণব্যাপারকে আমাদের দেশের আতিথ্যের নমুনা বলিয়া গ্রহণ করিয়ো না। এ তোমাদের ভারতবর্ষের নিমকের গুণ।

লোকেন পালিত

বিলাতে যখন আমি য়ুনিভারসিটি কলেজে ইংরাজি-সাহিত্য-ক্লাসে তখন সেখানে লোকেন পালিত ছিল আমার সহাধ্যায়ী বন্ধু। বয়সে সে আমার চেয়ে প্রায় বছর চারেকের ছোটো। যে-বয়সে জীবনস্মৃতি লিখিতেছি সে বয়সে চার বছরের তারতম্য চোখে পড়িবার মতো নহে; কিন্তু সতেরোর সঙ্গে তেরোর প্রভেদ এতো বেশি যে সেটা ডিঙাইয়া বন্ধুত্ব করা কঠিন। বয়সের গৌরব নাই বলিয়াই বয়স সম্বন্ধে বালক আপনার মর্য্যাদা বাঁচাইয়া চলিতে চায়। কিন্তু এই বালকটিসম্বন্ধে সে বাধা আমার মনে একেবারেই ছিল না। তাহার একমাত্র কারণ বুদ্ধিশক্তিতে আমি লোকেনকে কিছুমাত্র ছোটো বলিয়া মনে করিতে পারিতাম না!

য়ুনিভারসিটি কলেজের লাইব্রেরিতে ছাত্র ও ছাত্রীরা বসিয়া পড়াশুনা করে; আমাদের দুইজনের সেখানে গল্প করিবার আড্ডা ছিল। সে কাজটা চুপি চুপি সারিলে কাহারো আপত্তির কোনো কারণ থাকিত না—কিন্তু হাসির প্রভূত বাষ্পে আমার বন্ধুর তরুণ মন একেবারে সর্ব্বদা পরিস্ফীত হইয়াছিল, সামান্য একটু নাড়া পাইলে তাহা সশব্দে

উচ্ছ্বসিত হইতে থাকিত। সকল দেশেই ছাত্রীদের পাঠ-নিষ্ঠায় অন্যায় পরিমাণ আতিশয্য দেখা যায়। আমাদের কত পাঠরত প্রতিবেশিনী ছাত্রীর নীল চক্ষুর নীরব ভৎর্সনা-কটাক্ষ আমাদের সরব হাস্যালাপের উপর নিষ্ফলে বর্ষিত হইয়াছে তাহা স্মরণ করিলে আজ আমার মনে অনুতাপ উদয় হয়। কিন্তু তখনকার দিনে পাঠাভ্যাসের ব্যাঘাত-পীড়াসম্বন্ধে আমার চিত্তে সহানুভূতির লেশমাত্র ছিল না। কোনোদিন আমার মাথা ধরে নাই এবং বিধাতার প্রসাদে বিদ্যালয়ের পড়ার বিঘ্নে আমাকে একটু কষ্ট দেয় নাই।

এই লাইব্রেরি-মন্দিরে আমাদের নিরবচ্ছিন্ন হাস্যালাপ চলিত বলিলে অত্যুক্তি হয়। সাহিত্য-আলোচনাও করিতাম। সে আলোচনায় বালক বন্ধুকে অর্ব্বাচীন বলিয়া মনে করিতে পারিতাম না। যদিও বাংলা বই সে আমার চেয়ে অনেক কম পড়িয়াছিল কিন্তু চিন্তাশক্তিতে সেই কমিটুকু সে অনায়াসেই পোষাইয়া লইতে পারিত।

আমাদের অন্যান্য আলোচনার মধ্যে বাংলা শব্দতত্ত্বের একটা আলোচনা ছিল। তাহার উৎপত্তির কারণটা এই। ডাক্তার স্কটের একটি কন্যা আমার কাছে বাংলা শিখিবার জন্য উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে বাংলা বর্ণমালা শিখাইবার সময় গর্ব্ব করিয়া বলিয়াছিলাম যে আমাদের ভাষায় বানানের মধ্যে একটা ধর্ম্মজ্ঞান আছে—পদে পদে নিয়ম লঙ্ঘন করাই তাহার নিয়ম নহে। তাঁহাকে জানাইয়াছিলাম ইংরেজি বানানরীতির অসংযম নিতান্তই হাস্যকর,

কেবল তাহা মুখস্থ করিয়া আমাদিগকে পরীক্ষা দিতে হয় বলিয়াই সেটা এমন শোকাবহ। কিন্তু আমার গর্ব্ব টিঁকিল না। দেখিলাম বাংলা বানানও বাঁধন মানে না; তাহা যে ক্ষণে ক্ষণে নিয়ম ডিঙাইয়া চলে অভ্যাসবশত এতদিন তাহা লক্ষ্য করি নাই। তখন এই নিয়মব্যতিক্রমের একটা নিয়ম খুঁজিতে প্রবৃত্ত হইলাম। য়ুনিভার্সিটি কলেজের লাইব্রেরিতে বসিয়া এই কাজ করিতাম। লোকেন এই বিষয়ে আমাকে যে সাহায্য করিত তাহাতে আমার বিস্ময় বোধ হইত।

তাহার পর কয়েক বৎসর পরে সিভিল সার্ভিসে প্রবেশ করিয়া লোকেন যখন ভারতবর্ষে ফিরিল তখন, সেই কলেজের লাইব্রেরিঘরে, হাস্যোচ্ছ্বাসতরঙ্গিত যে আলোচনা সুরু হইয়াছিল তাহা ক্রমশ প্রশস্ত হইয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল। সাহিত্যে লোকেনের প্রবল আনন্দ আমার রচনার বেগকে পালের হাওয়ার মতো অগ্রসর করিয়াছে। আমার পূর্ণ-যৌবনের দিনে সাধনার সম্পাদক হইয়া অবিশ্রামগতিতে যখন গদ্যপদ্যর জুড়ি হাঁকাইয়া চলিয়াছি তখন লোকেনের অজস্র উৎসাহ আমার উদ্যমকে একটুও ক্লান্ত হইতে দেয় নাই। তখনকার কত পঞ্চভূতের ডায়ারি এবং কত কবিতা মফস্বলে তাহারই বাংলাঘরে বসিয়া লেখা। আমাদের কাব্যালোচনা ও সঙ্গীতের সভা কতদিন সন্ধ্যাতারার আমলে সুরু হইয়া শুকতারার আমলে ভোরের হাওয়ার মধ্যে রাত্রের দীপশিখার সঙ্গে সঙ্গেই অবসান হইয়াছে। সরস্বতীর পদ্মবনে বন্ধুত্বের

পদ্মটির পরেই দেবীর বিলাস বুঝি সকলের চেয়ে বেশি। এই বনে স্বর্ণরেণুর পরিচয় বড়ো বেশি পাওয়া যায় নাই কিন্তু প্রণয়ের সুগন্ধি মধুসম্বন্ধে নালিশ করিবার কারণ আমার ঘটে নাই।

ভগ্নহৃদয়

বিলাতে আর একটি কাব্যের পত্তন হইয়াছিল। কতকটা ফিরিবার পথে কতকটা দেশে ফিরিয়া আসিয়া ইহা সমাধা করি। "ভগ্নহৃদয়" নামে ইহা ছাপান হইয়াছিল। তখন মনে হইয়াছিল লেখাটা খুব ভালো হইয়াছে। লেখকের পক্ষে এরূপ মনে হওয়া অসামান্য নহে। কিন্তু তখনকার পাঠকদের কাছেও এ লেখাটা সম্পূর্ণ অনাদৃত হয় নাই। মনে আছে এই লেখা বাহির হইবার কিছুকাল পরে কলিকাতায় ত্রিপুরার স্বর্গীয় মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যের মন্ত্রী আমার সহিত দেখা করিতে আসেন। কাব্যটি মহারাজের ভালো লাগিয়াছে, এবং কবির সাহিত্যসাধনার সফলতাসম্বন্ধে তিনি উচ্চ আশা পোষণ করেন, কেবল এই কথাটি জানাইবার জন্যই তিনি তাঁহার অমাত্যকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

আমার এই আঠারো বছর বয়সের কবিতাসম্বন্ধে আমার

ত্রিশ বছর বয়সের একটি পত্রে যাহা লিখিয়াছিলাম এইখানে উদ্ধৃত করিঃ—"ভগ্নহৃদয় যখন লিখতে আরম্ভ করেছিলেম তখন আমার বয়স আঠারো। বাল্যও নয় যৌবনও নয়। বয়সটা এমন একটা সন্ধিস্থলে যেখান থেকে সত্যের আলোক স্পষ্ট পাবার সুবিধা নেই। একটু একটু আভাস পাওয়া যায় এবং খানিকটা-খানিকটা ছায়া। এই সময়ে সন্ধ্যাবেলাকার ছায়ার মতো কল্পনাটা অত্যন্ত দীর্ঘ এবং অপরিস্ফুট হ'য়ে থাকে। সত্যকার পৃথিবী একটা আজগবি পৃথিবী হ'য়ে উঠে। মজা এই, তখন আমারই বয়স আঠারো ছিল তা নয়—আমার আশপাশের সকলের বয়স যেন আঠারো ছিল। আমরা সকলে মিলেই একটা বস্তুহীন ভিত্তিহীন কল্পনালোকে বাস করতেম। সেই কল্পনালোকের খুব তীব্র সুখদুঃখও স্বপ্নের সুখদুঃখের মতো। অর্থাৎ তার পরিমাণ ওজন করবার কোনো সত্য পদার্থ ছিল না কেবল নিজের মনটাই ছিল ;—তাই আপন মনে তিল তাল হ'য়ে উঠত।"

আমার পনেরো ষোলো হইতে আরম্ভ করিয়া বাইশ তেইশ বছর পর্য্যন্ত এই যে একটা সময় গিয়াছে ইহা একটা অত্যন্ত অব্যবস্থার কাল ছিল। যে যুগে পৃথিবীতে জলস্থলের বিভাগ ভালো করিয়া হইয়া যায় নাই, তখনকার সেই প্রথম পঙ্কস্তরের উপরে বৃহদায়তন অদ্ভুতাকার উভচর জন্তুসকল আদিকালের শাখাসম্পদ্‌হীন অরণ্যের মধ্যে সঞ্চরণ করিয়া ফিরিত। অপরিণত মনের প্রদোষালোকে আবেগগুলা সেই-রূপ পরিমাণ-বহির্ভূত অদ্ভুতমূর্ত্তি ধারণ করিয়া একটা নামহীন

পথহীন অন্তহীন অরণ্যের ছায়ায় ঘুরিয়া বেড়াইত। তাহারা আপনাকেও জানেনা, বাহিরে আপনার লক্ষ্যকেও জানেনা। তাহারা নিজেকে কিছুই জানেনা বলিয়া পদে পদে আরএকটা-কিছুকে নকল করিতে থাকে। অসত্য, সত্যের অভাবকে অসংযমের দ্বারা পূরণ করিতে চেষ্টা করে। জীবনের সেই একটা অকৃতার্থ অবস্থায় যখন অন্তর্নিহিত শক্তিগুলা বাহির হইবার জন্য ঠেলাঠেলি করিতেছে, যখন সত্য তাহাদের লক্ষ্যগোচর ও আয়ত্তগম্য হয় নাই, তখন আতিশয্যের দ্বারাই সে আপনাকে ঘোষণা করিবার চেষ্টা করিয়াছিল।

শিশুদের দাঁত যখন উঠিবার চেষ্টা করিতেছে, তখন সেই অনুদ্গত দাঁতগুলি শরীরের মধ্যে জ্বরের দাহ আনয়ন করে। সেই উত্তেজনার সার্থকতা ততক্ষণ কিছুই নাই যতক্ষণ পর্য্যন্ত দাঁতগুলা বাহির হইয়া বাহিরের খাদ্য পদার্থকে অন্তরস্থ করিবার সাহয়তা না করে। মনের আবেগগুলারও সেই দশা। যতক্ষণ পর্য্যন্ত বাহিরের সঙ্গে তাহারা আপন সত্যসম্বন্ধ স্থাপন না করে ততক্ষণ তাহারা ব্যাধির মতো মনকে পীড়া দেয়।

তখনকার অভিজ্ঞতা হইতে যে শিক্ষাটা লাভ করিয়াছি সেটা সকল নীতিশাস্ত্রেই লেখে—কিন্তু তাই বলিয়াই সেটা অবজ্ঞার যোগ্য নহে। আমাদের প্রবৃত্তিগুলাকে যাহা কিছুই নিজের মধ্যে ঠেলিয়া রাখে, সম্পূর্ণ বাহির হইতে দেয় না তাহাই জীবনকে বিষাক্ত করিয়া তোলে। স্বার্থ আমাদের প্রবৃত্তিগুলিকে শেষ পরিণাম পর্য্যন্ত যাইতে দেয় না—তাহাকে পূরাপূরি ছাড়িয়া দিতে চায় না—এইজন্য সকল প্রকার

আঘাত আতিশয্য অসত্য স্বার্থসাধনের সাথের সাথী। মঙ্গল-কর্ম্মে যখন তাহারা একেবারে মুক্তি লাভ করে তখনি তাহা-দের বিকার ঘুচিয়া যায়—তখনি তাহারা স্বাভাবিক হইয়া উঠে। আমাদের প্রবৃত্তির সত্য পরিণাম সেইখানে—আনন্দেরও পথ সেই দিকে।

নিজের মনের এই যে অপরিণতির কথা বলিলাম ইহার সঙ্গে তখনকার কালের শিক্ষা ও দৃষ্টান্ত যোগ দিয়াছিল। সেই কালটার বেগ এখনই যে চলিয়া গিয়াছে তাহাও নিশ্চয় বলিতে পারি না। যে সময়টার কথা বলিতেছি তখনকার দিকে তাকাইলে মনে পড়ে ইংরেজি সাহিত্য হইতে আমরা যে পরিমাণে মাদক পাইয়াছি সে পরিমাণে খাদ্য পাই নাই। তখনকার দিনে আমাদের সাহিত্যদেবতা ছিলেন শেক্সাপিয়র, মিল্টন ও বায়রন। ইঁহাদের লেখার ভিতরকার যে জিনিষটা আমাদিগকে খুব করিয়া নাড়া দিয়াছে সেটা হৃদয়াবেগের প্রবলতা। এই হৃদয়াবেগের প্রবলতাটা ইংরেজের লোক-ব্যবহারে চাপা থাকে কিন্তু তাহার সাহিত্যে ইহার আধিপত্য যেন সেই পরিমাণেই বেশি। হৃদয়াবেগকে একান্ত আতি-শয্যে লইয়া গিয়া তাহাকে একটা বিষম অগ্নিকাণ্ডে শেষ করা এই সাহিত্যের একটা বিশেষ স্বভাব। অন্তত সেই দুর্দ্দাম উদ্দীপনাকেই আমরা ইংরেজি সাহিত্যের সার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলাম। আমাদের বাল্যবয়সের সাহিত্য-দীক্ষাদাতা অক্ষয় চৌধুরী মহাশয় যখন বিভোর হইয়া ইংরেজি কাব্য আওড়াইতেন তখন সেই আবৃত্তির মধ্যে একটা তীব্র নেশার

ভাব ছিল। রোমিও জুলিয়েটের প্রেমোন্মাদ, লিয়রের অক্ষম পরিতাপের বিক্ষোভ, ওথেলোর ঈর্ষ্যানলের প্রলয়দাবদাহ, এই সমস্তেরই মধ্যে যে একটা প্রবল অতিশয়তা আছে তাহাই তাঁহাদের মনের মধ্যে উত্তেজনার সঞ্চার করিত।

(আমাদের সমাজ, আমাদের ছোটো ছোটো কর্ম্মক্ষেত্র এমন সকল নিতান্ত একঘেয়ে বেড়ার মধ্যে ঘেরা যে সেখানে হৃদয়ের ঝড়ঝাপট প্রবেশ করিতেই পায় না—সমস্তই যতদূর সম্ভব ঠাণ্ডা এবং চুপচাপ; এই জন্যই ইংরাজি সাহিত্যে হৃদয়াবেগের এই বেগ এবং রুদ্রতা আমাদিগকে এমন একটি প্রাণের আঘাত দিয়াছিল যাহা আমাদের হৃদয় স্বভাবতই প্রার্থনা করে। সাহিত্যকলার সৌন্দর্য্য আমাদিগকে যে সুখ দেয় ইহা সে সুখ নহে, ইহা অত্যন্ত স্থিরত্বের মধ্যে খুব একটা আন্দোলন আনিবারই সুখ। তাহাতে যদি তলার সমস্ত পাঁক উঠিয়া পড়ে তবে সেও স্বীকার।)

য়ুরোপে যখন একদিন মানুষের হৃদয়প্রবৃত্তিকে অত্যন্ত সংযত ও পীড়িত করিবার দিন ঘুচিয়া গিয়া তাহার প্রবল প্রতিক্রিয়াস্বরূপে রেনেসাঁশের যুগ আসিয়াছিল। শেক্স্‌পিয়রের সমসাময়িক কালের নাট্যসাহিত্য সেই বিপ্লবের দিনেরই নৃত্যলীলা। এ সাহিত্যে ভালোমন্দ সুন্দর অসুন্দরের বিচারই মুখ্য ছিল না—মানুষ আপনার হৃদয়-প্রকৃতিকে তাহার অন্তঃপুরের সমস্ত বাধা মুক্ত করিয়া দিয়া তাহারই উদ্দাম শক্তির যেন চরম মূর্ত্তি দেখিতে চাহিয়াছিল। এই জন্যই এই সাহিত্যে, প্রকাশের অত্যন্ত তীব্রতা,

প্রাচুর্য্য ও অসংযম দেখিতে পাওয়া যায়। য়ুরোপীয় সমাজের সেই হোলিখেলার মাতামাতির সুর আমাদের এই অত্যন্ত শিষ্ট সমাজে প্রবেশ করিয়া হঠাৎ আমাদিগকে ঘুম ভাঙাইয়া চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল। হৃদয় যেখানে কেবলি আচারের ঢাকার মধ্যে চাপা থাকিয়া আপনার পূর্ণ পরিচয় দিবার অবকাশ পায় না, সেখানে স্বাধীন ও সজীব হৃদয়ের অবাধ-লীলার দীপকরাগিণীতে আমাদের চমক লাগিয়া গিয়াছিল।

ইংরেজি সাহিত্যে আর একদিন যখন পোপের কালের ঢিমাতেতালা বন্ধ হইয়া ফরাসিবিপ্লবনৃত্যের ঝাঁপতালের পালা আরম্ভ হইল বায়রন সেই সময়কার কবি। তাঁহার কাব্যেও সেই হৃদয়াবেগের উদ্দামতা আমাদের এই ভালোমানুষ সমাজের ঘোমটাপরা হৃদয়টিকে, এই কনে বউকে উতলা করিয়া তুলিয়াছিল।

তাই, ইংরেজি সাহিত্যালোচনার সেই চঞ্চলতাটা আমাদের দেশের শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে বিশেষভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল। সেই চঞ্চলতার ঢেউটাই বাল্যকালে আমা-দিগকে চারিদিক হইতে আঘাত করিয়াছে। সেই প্রথম জাগরণের দিন সংযমের দিন নহে, তাহা উত্তেজনারই দিন।

অথচ য়ুরোপের সঙ্গে আমাদের অবস্থার খুব একটা প্রভেদ ছিল। য়ুরোপীয় চিত্তের এই চাঞ্চল্য, এই নিয়ম-বন্ধনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সেখানকার ইতিহাস হইতেই সাহিত্যে প্রতিফলিত হইয়াছিল। তাহার অন্তরে বাহিরে একটা মিল ছিল। সেখানে সত্যই ঝড় উঠিয়াছিল বলিয়াই

ঝড়ের গর্জ্জন শুনা গিয়াছিল। আমাদের সমাজে যে অল্প একটু হাওয়া দিয়াছিল তাহার সত্যসুরটি মর্ম্মর ধ্বনির উপরে চড়িতে চায় না—কিন্তু সেটুকুতে তো আমাদের মন তৃপ্তি মানিতেছিল না, এই জন্যই আমরা ঝড়ের ডাকের নকল করিতে গিয়া নিজের প্রতি জবরদস্তি করিয়া অতিশয়োক্তির দিকে যাইতেছিলাম। এখনো সেই ঝোঁকটা কাটিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। সহজে কাটিবে না। তাহার প্রধান কারণ, ইংরেজি সাহিত্যে সাহিত্যকলার সংযম এখনো আসে নাই; এখনো সেখানে বেশি করিয়া বলা ও তীব্র করিয়া প্রকাশ করার প্রাদুর্ভাব সর্ব্বত্রই। হৃদয়াবেগ সাহিত্যের একটা উপকরণ মাত্র, তাহা যে লক্ষ্য নহে, সাহিত্যের লক্ষ্যই পরিপূর্ণতার সৌন্দর্য্য, সুতরাং সংযম ও সরলতা, এ কথাটা এখনও ইংরেজিসাহিত্যে সম্পূর্ণরূপে স্বীকৃত হয় নাই।

আমাদের মন শিশুকাল হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত কেবলমাত্র এই ইংরেজি সাহিত্যেই গড়িয়া উঠিতেছে। য়ুরোপের যে-সকল প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যে সাহিত্যকলার মর্য্যাদা সংযমের সাধনায় পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে সে সাহিত্যগুলি আমাদের শিক্ষার অঙ্গ নহে, এইজন্যই সাহিত্যরচনার রীতি ও লক্ষ্যটি এখনো আমরা ভালো করিয়া ধরিতে পারিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

তখনকার কালের ইংরেজিসাহিত্যশিক্ষার তীব্র উত্তেজনাকে যিনি আমাদের কাছে মূর্ত্তিমান করিয়া তুলিয়াছিলেন তিনি হৃদয়েরই উপাসক ছিলেন। সত্যকে যে সমগ্রভাবে

উপলব্ধি করিতে হইবে তাহা নহে, তাহাকে হৃদয় দিয়া অনুভব করিলেই যেন সার্থকতা হইল এইরূপ তাঁহার মনের ভাব ছিল। জ্ঞানের দিক দিয়া ধর্ম্মে তাঁহার কোনো আস্থাই ছিল না, অথচ শ্যামাবিষয়ক গান করিতে তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া জল পড়িত। এ স্থলে কোনো সত্য বস্তু তাঁহার পক্ষে আবশ্যক ছিল না, যে-কোনো কল্পনায় হৃদয়াবেগকে উত্তেজিত করিতে পারে তাহাকেই তিনি সত্যের মতো ব্যবহার করিতে চাহিতেন। সত্যউপলব্ধির প্রয়োজন অপেক্ষা হৃদয়ানুভূতির প্রয়োজন প্রবল হওয়াতেই যাহাতে সেই প্রয়োজন মেটে তাহা স্থূল হইলেও তাহাকে গ্রহণ করিতে তাঁহার বাধা ছিল না।

তখনকার কালের য়ুরোপীয় সাহিত্যে নাস্তিকতার প্রভাবই প্রবল। তখন বেস্থাম, মিল ও কোঁতের আধিপত্য, তাঁহাদেরই যুক্তি লইয়া আমাদের যুবকেরা তখন তর্ক করিতে-ছিলেন। য়ুরোপে এই মিলের যুগ ইতিহাসের একটি স্বাভাবিক পর্য্যায়। মানুষের চিত্তের আবর্জ্জনা দূর করিয়া দিবার জন্য স্বভাবের চেষ্টারূপেই এই ভাঙিবার ও সরাইবার প্রলয়শক্তি কিছু দিনের জন্য উদ্যত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু আমাদের দেশে ইহা আমাদের পড়িয়া-পাওয়া জিনিষ। ইহাকে আমরা সত্যরূপে খাটাইবার জন্য ব্যবহার করি নাই। ইহাকে আমরা শুদ্ধমাত্র একটা মানসিক বিদ্রোহের উত্তেজনা-রূপেই ব্যবহার করিয়াছি। নাস্তিকতা আমাদের একটা নেশা ছিল। এইজন্য তখন আমরা দুই দল মানুষ দেখিয়াছি।

একদল ঈশ্বরের অস্তিত্ববিশ্বাসকে যুক্তি-অস্ত্রে ছিন্নভিন্ন করিবার জন্য সর্ব্বদাই গায়ে পড়িয়া তর্ক করিতেন। পাখীশিকারে শিকারীর যেমন আমোদ, গাছের উপরে বা তলায় একটা সজীব প্রাণী দেখিলেই তখনই তাহাকে নিকাশ করিয়া ফেলিবার জন্য শিকারীর হাত যেমন নিশ্‌পিশ্‌ করিতে থাকে, তেমনি যেখানে তাঁহারা দেখিতেন কোনো নিরীহ বিশ্বাস কোথাও কোনো বিপদের আশঙ্কা না করিয়া আরামে বসিয়া আছে তখনি তাহাকে পাড়িয়া ফেলিবার জন্য তাঁহাদের উত্তেজনা জন্মিত। অল্পকালের জন্য আমাদের একজন মাষ্টার ছিলেন, তাঁহার এই আমোদ ছিল। আমি তখন নিতান্ত বালক ছিলাম, কিন্তু আমাকেও ছাড়িতেন না। অথচ তাঁহার বিদ্যা সামান্যই ছিল—তিনি যে সত্যানুসন্ধানের উৎসাহে সকল মতামত আলোচনা করিয়া একটা পন্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাও নহে; তিনি আর একজন ব্যক্তির মুখ হইতে তর্কগুলি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। আমি প্রাণপণে তাহার সঙ্গে লড়াই করিতাম, কিন্তু আমি তাঁহার নিতান্ত অসমকক্ষ প্রতিপক্ষ ছিলাম বলিয়া আমাকে প্রায়ই বড়ো দুঃখ পাইতে হইত। এক একদিন এত রাগ হইত যে কাঁদিতে ইচ্ছা করিত।

আর একদল ছিলেন তাঁহারা ধর্ম্মকে বিশ্বাস করিতেন না, সম্ভোগ করিতেন। এইজন্য ধর্ম্মকে উপলক্ষ্য করিয়া যত কলাকৌশল, যতপ্রকার শব্দগন্ধরূপরসের আয়োজন আছে, তাহাকে ভোগীর মতো আশ্রয় করিয়া তাঁহারা আবিষ্ট হইয়া থাকিতে ভালোবাসিতেন; ভক্তিই তাঁহাদের বিলাস।

এই উভয়দলেই সংশয়বাদ ও নাস্তিকতা সত্য সন্ধানের তপস্যাজাত ছিল না; তাহা প্রধানত আবেগের উত্তেজনা ছিল।

যদিও এই ধর্ম্মবিদ্রোহ আমাকে পীড়া দিত, তথাপি ইহা যে আমাকে একেবারে অধিকার করে নাই তাহা নহে। যৌবনের প্রারম্ভে বুদ্ধির ঔদ্ধত্যের সঙ্গে এই বিদ্রোহিতা আমার মনেও যোগ দিয়াছিল। আমাদের পরিবারে যে ধর্ম্মসাধনা ছিল আমার সঙ্গে তাহার কোনো সংস্রব ছিল না—আমি তাহাকে গ্রহণ করি নাই। আমি কেবল আমার হৃদয়াবেগের চুলাতে হাপর করিয়া মস্ত একটা আগুন জ্বালিতেছিলাম। সে কেবলি অগ্নিপূজা; সে কেবলি আহুতি দিয়া শিখাকেই বাড়াইয়া তোলা; তাহার আর কোনো লক্ষ্য ছিল না। ইহার কোনো লক্ষ্য নাই বলিয়াই ইহার কোনো পরিমাণ নাই; ইহাকে যতো বাড়ানো যায় ততো বাড়ানোই চলে।

যেমন ধর্ম্মসম্বন্ধে তেমনি নিজের হৃদয়াবেগসম্বন্ধেও কোনো সত্য থাকিবার কোনো প্রয়োজন ছিল না, উত্তেজনা থাকিলেই যথেষ্ট। তখনকার কবির একটি শ্লোক মনে পড়ে:—

আমার হৃদয় আমারি হৃদয়
বেচিনি তো তাহা কাহারো কাছে,
ভাঙাচোরা হোক্, যা হোক্ তা'হোক্
আমার হৃদয় আমারি আছে।

সত্যের দিক দিয়া হৃদয়ের কোনো বালাই নাই, তাহার পক্ষে ভাঙিয়া যাওয়া বা অন্য কোনো প্রকার দুর্ঘটনার নিতান্তই অনাবশ্যক ;—দুঃখবৈরাগ্যের সত্যটা স্পৃহনীয় নয়, কিন্তু শুদ্ধমাত্র তাহার ঝাঁঝটুকু উপভোগের সামগ্রী,—এইজন্য কাব্যে সেই জিনিষটার কারবার জমিয়া উঠিয়াছিল—ইহাই দেবতাকে বাদ দিয়া দেবোপসনার রসটুকু ছাঁকিয়া লওয়া। আজও আমাদের দেশে এ বালাই ঘুচে নাই। সেইজন্যই আজও আমরা ধর্ম্মকে যেখানে সত্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারি সেখানে ভাবুকতা দিয়া আর্টের শ্রেণীভুক্ত করিয়া তাহার সমর্থন করি! সেইজন্যই বহুল পরিমাণে আমাদের দেশহিতৈষিতা দেশের যথার্থ সেবা নহে, কিন্তু দেশসম্বন্ধে হৃদয়ের মধ্যে একটা ভাব অনুভব করার আয়োজন করা।

বিলাতী সঙ্গীত

ব্রাইটনে থাকিতে সেখানকার সঙ্গীতশালায় একবার একজন বিখ্যাত গায়িকার গান শুনিতে গিয়াছিলাম। তাঁহার নাম ভুলিতেছি,—মাডাম্ নীলসন্ অথবা মাডাম্ আল্‌বানী হইবেন। কণ্ঠস্বরের এমন আশ্চর্য্যশক্তি পূর্ব্বে কখনো দেখি নাই। আমাদের দেশে ওস্তাদ গায়কেরাও গান গাহিবার

প্রয়াসটাকে ঢাকিতে পারেন না—যে সকল খাদস্থর বা চড়া-স্থর সহজে তাঁহাদের গলায় আসেনা, যেমন তেমন করিয়া সেটাকে প্রকাশ করিতে তাঁহাদের কোনো লজ্জা নাই। কারণ আমাদের দেশে, শ্রোতাদের মধ্যে যাঁহারা রসজ্ঞ তাঁহারা নিজের মনের মধ্যে নিজের বোধশক্তির জোরেই গানটাকে খাড়া করিয়া তুলিয়া খুসি হইয়া থাকেন; এই কারণে, তাঁহারা সুকণ্ঠ গায়কের সুললিত গানের ভঙ্গীকে অবজ্ঞা করিয়া থাকেন: বাহিরের কর্কশতা এবং কিয়ৎ পরিমাণে অসম্পূর্ণতাতেই আসল জিনিষটার যথার্থ স্বরূপটা যেন বিনা আবরণে প্রকাশ পায়। এ যেন মহেশ্বরের বাহ্য দারিদ্র্যের মতো—তাহাতে তাঁহার ঐশ্বর্য্য নগ্ন হইয়া দেখা দেয়। য়ুরোপে এ ভাবটা একেবারেই নাই। সেখানে বাহিরের আয়োজন একেবারে নিখুঁৎ হওয়া চাই—সেখানে অনুষ্ঠানে ত্রুটি হইলে মানুষের কাছে মুখ দেখাইবার জো থাকে না। আমরা আসরে বসিয়া আধঘণ্টা ধরিয়া তানপুরার কান মলিতে ও তবলাটাকে ঠকাঠক্ শব্দে হাতুড়িপেটা করিতে কিছুই মনে করি না। কিন্তু য়ুরোপে এই সকল উদ্যোগকে নেপথ্যে লুকাইয়া রাখা হয়—সেখানে বাহিরে যাহা কিছু প্রকাশিত হয় তাহা একেবারেই সম্পূর্ণ। এইজন্য সেখানে গায়কের কণ্ঠস্বরে কোথাও লেশমাত্র দুর্ব্বলতা থাকিলে চলে না। আমাদের দেশে গান সাধাটাই মুখ্য সেই গানেই আমাদের যতকিছু দুরূহতা;—য়ুরোপে সাধাটাই মুখ্য সেই গলার স্বরে তাহারা অসাধ্য সাধন করে। আমাদের দেশে যাহারা

প্রকৃত শ্রোতা তাহারা গানটাকে শুনিলেই সন্তুষ্ট থাকে, য়ুরোপের শ্রোতারা গান-গাওয়াটাকে শোনে। সেদিন ব্রাইটনে তাই দেখিলাম—সেই গায়িকাটির গান গাওয়া অদ্ভুত আশ্চর্য্য। আমার মনে হইল যেন কণ্ঠস্বরে সার্কাসের ঘোড়া হাঁকাইতেছে। কণ্ঠনলীর মধ্যে সুরের লীলা কোথাও কিছুমাত্র বাধা পাইতেছে না। মনে যতই বিস্ময় অনুভব করি না কেন সেদিন গানটা আমার একেবারেই ভালো লাগিল না। বিশেষত তাহার মধ্যে স্থানে স্থানে পাখীর ডাকের নকল ছিল, সে আমার কাছে অত্যন্ত হাস্যজনক মনে হইয়াছিল। মোটের উপর আমার কেবলি মনে হইতে লাগিল মনুষ্যকণ্ঠের প্রকৃতিকে যেন অতিক্রম করা হইতেছে। তাহার পরে পুরুষ গায়কদের গান শুনিয়া আমার আরাম বোধ হইতে লাগিল—বিশেষত "টেনর" গলা যাহাকে বলে—সেটা নিতান্ত একটা পথহারা ঝোড়ো হাওয়ার অশরীরী বিলাপের মতো নয়—তাহার মধ্যে নরকণ্ঠের রক্তমাংসের পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার পরে গান শুনিতে শুনিতে ও শিখিতে শিখিতে য়ুরোপীয় সঙ্গীতের রস পাইতে লাগিলাম। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত আমার এই কথা মনে হয় যে য়ুরোপের গান এবং আমাদের গানের মহল যেন ভিন্ন ;—ঠিক এক দরজা দিয়া হৃদয়ের একই মহলে যেন তাহারা প্রবেশ করে না। য়ুরোপের সঙ্গীত যেন মানুষের বাস্তব জীবনের সঙ্গে বিচিত্র-ভাবে জড়িত। তাই দেখিতে পাই, সকল রকমেরই ঘটনা ও বর্ণনা আশ্রয় করিয়া য়ুরোপে গানের সুর খাটানো চলে,

আমাদের দিশী সুরে যদি সেরূপ করিতে যাই তবে অদ্ভুত হইয়া পড়ে, তাহাতে রস থাকে না। (আমাদের গান যেন জীবনের প্রতিদিনের বেষ্টন অতিক্রম করিয়া যায়, এই জন্য তাহার মধ্যে এতো করুণা এবং বৈরাগ্য,—সে যেন বিশ্ব-প্রকৃতি ও মানবহৃদয়ের একটি অন্তরতর ও অনির্ব্বচনীয় রহস্যের রূপটিকে দেখাইয়া দিবার জন্য নিযুক্ত;—সেই রহস্যলোক বড়ো নিভৃত নির্জ্জন গভীর—সেখানে ভোগীর আরামকুঞ্জ, ও ভক্তের তপোবন রচিত আছে—কিন্তু সেখানে কর্ম্মনিরত সংসারীর জন্য কোনো প্রকার সুব্যবস্থা নাই।)

য়ুরোপীয় সঙ্গীতের মর্ম্মস্থানে আমি প্রবেশ করিতে পারিয়াছি এ কথা বলা আমাকে সাজে না। কিন্তু বাহির হইতে যতটুকু আমার অধিকার হইয়াছিল তাহাতে য়ুরোপের গান আমার হৃদয়কে একদিক দিয়া খুবই আকর্ষণ করিত। আমার মনে হইত এ সঙ্গীত রোমান্টিক। রোমান্টিক বলিলে যে ঠিকটি কী বুঝায় তাহা বিশ্লেষণ করিয়া বলা শক্ত। কিন্তু মোটামুটি বলিতে রোমান্টিকের দিকটা বিচিত্রতার দিক, প্রাচুর্য্যের দিক, তাহা জীবনসমুদ্রের তরঙ্গলীলার দিক, তাহা অবিরাম গতিচাঞ্চল্যের উপর আলোকছায়ার দ্বন্দ্বসম্পাতের দিক;—আর একটা দিক আছে যাহা বিস্তার, যাহা আকাশ-নীলিমার নির্নিমেষতা, যাহা সুদূর দিগন্তরেখায় অসীমতার নিস্তব্ধ আভাস। যাহাই হউক্, কথাটা পরিষ্কার না হইতে পারে কিন্তু আমি যখনই য়ুরোপীয় সঙ্গীতের রসভোগ করিয়াছি তখনই বারম্বার মনের মধ্যে বলিয়াছি ইহা

রোমান্টিক। ইহা মানবজীবনের বিচিত্রতাকে গানের সুরে অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিতেছে। আমাদের সঙ্গীতে কোথাও কোথাও সে চেষ্টা নাই যে তাহা নহে, কিন্তু সে চেষ্টা প্রবল ও সফল হইতে পারে নাই। আমাদের গান ভারতবর্ষের নক্ষত্রখচিত নিশীথিনীকে ও নবোন্মেষিত অরুণ-রাগকে ভাষা দিতেছে; আমাদের গান ঘনবর্ষার বিশ্বব্যাপী বিরহবেদনা ও নব বসন্তের বনান্তপ্রসারিত গভীর উন্মাদনার বাক্যবিস্মৃত বিহ্বলতা।

বাল্মীকি-প্রতিভা

আমাদের বাড়িতে পাতায় পাতায় চিত্রবিচিত্র করা কবি ম্যুরের রচিত একখানি আইরিশ মেলডীজ্ ছিল। অক্ষয় বাবুর কাছে সেই কবিতাগুলির মুগ্ধ আবৃত্তি অনেকবার শুনিয়াছি। ছবির সঙ্গে বিজড়িত সেই কবিতাগুলি আমার মনে আয়র্লণ্ডের একটি পুরাতন মায়ালোক সৃজন করিয়াছিল। তখন এই কবিতার সুরগুলি শুনি নাই—তাহা আমার কল্পনার মধ্যেই ছিল। ছবিতে বীণা আঁকা ছিল, সেই বীণার সুর আমার মনের মধ্যে বাজিত। এই আইরিশ মেলডীজ আমি সুরে শুনিব, শিখিব, এবং শিখিয়া আসিয়া

অক্ষয় বাবুকে শুনাইব ইহাই আমার বড়ো ইচ্ছা ছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে জীবনের কোনো কোনো ইচ্ছা পূর্ণ হয় এবং পূর্ণ হইয়াই আত্মহত্যা সাধন করে। আইরিশ মেলডীজ্ বিলাতে গিয়া কতকগুলি শুনিলাম ও শিখিলাম কিন্তু আগাগোড়া সব গানগুলি সম্পূর্ণ করিবার ইচ্ছা আর রহিল না। অনেক-গুলি সুর মিষ্ট এবং করুণ এবং সরল, কিন্তু তবু তাহাতে আয়র্লণ্ডের প্রাচীন কবিসভার নীরব বীণা তেমন করিয়া যোগ দিল না।

দেশে ফিরিয়া আসিয়া এই সকল এবং অন্যান্য বিলাতী গান স্বজনসমাজে গাহিয়া শুনাইলাম। সকলেই বলিলেন, রবির গলা এমন বদল হইল কেন, কেমন যেন বিদেশী রকমের হইয়াছে। এমন কি, তাঁহারা বলিতেন আমার কথা কহিবার গলারও একটু কেমন বদল হইয়া গিয়াছে।

এই দেশী ও বিলাতী সুরের চর্চ্চার মধ্যে বাল্মীকি-প্রতিভার জন্ম হইল। ইহার সুরগুলির অধিকাংশই দিশী, কিন্তু এই গীতিনাট্যে তাহাকে তাহার বৈঠকি মর্য্যাদা হইতে অন্যক্ষেত্রে বাহির করিয়া আনা হইয়াছে; উড়িয়া চলা যাহার ব্যবসায় তাহাকে মাটিতে দৌড় করাইবার কাজে লাগানো গিয়াছে। যাঁহারা এই গীতিনাট্যের অভিনয় দেখিয়াছেন তাঁহারা আশা করি এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, সঙ্গীতকে এইরূপ নাট্যকার্য্যে নিযুক্ত করাটা অসঙ্গত বা নিষ্ফল হয় নাই। বাল্মীকি-প্রতিভা গীতিনাট্যের ইহাই বিশেষত্ব। সঙ্গীতের এইরূপ বন্ধনমোচন ও তাহাকে

নিঃসঙ্কোচে সকল প্রকার ব্যবহারে লাগাইবার আনন্দ আমার মনকে বিশেষভাবে অধিকার করিয়াছিল। বাল্মীকি-প্রতিভার অনেকগুলি গান বৈঠকি গান ভাঙা—অনেকগুলি জ্যোতিদাদার রচিত গতের সুরে বসানো—এবং গুটিতিনেক গান বিলাতী সুর হইতে লওয়া। আমাদের বৈঠকি গানের তেলেনা অঙ্গের সুরগুলিকে সহজেই এইরূপ নাটকের প্রয়োজনে ব্যবহার করা যাইতে পারে—এই নাট্যে অনেক-স্থলে তাহা করা হইয়াছে। বিলাতী সুরের মধ্যে দুইটিকে 'ডাকাতদের মত্ততার' গানে লাগানো হইয়াছে এবং একটি আইরিশ সুর বনদেবীর বিলাপগানে বসাইয়াছি। বস্তুত বাল্মীকি-প্রতিভা পাঠযোগ্য কাব্যগ্রন্থ নহে—উহা সঙ্গীতের একটি নূতন পরীক্ষা—অভিনয়ের সঙ্গে কানে না শুনিলে ইহার কোনো স্বাদগ্রহণ সম্ভবপর নহে। 'য়ুরোপীয় ভাষায় যাহাকে অপেরা বলে বাল্মীকি-প্রতিভা তাহা নহে—ইহা সুরে নাটিকা; অর্থাৎ সঙ্গীতই ইহার মধ্যে প্রাধান্য লাভ করে নাই, ইহার নাট্যবিষয়টাকে সুর করিয়া অভিনয় করা হয় মাত্র—স্বতন্ত্র সঙ্গীতের মাধুর্য্য ইহার অতি অল্পস্থলেই আছে।

আমার বিলাত যাইবার আগে হইতে আমাদের বাড়িতে মাঝে মাঝে বিদ্বজ্জনসমাগম নামে সাহিত্যিকদের সম্মিলন হইত। সেই সম্মিলনের গীতবাদ্য কবিতা-আবৃত্তি ও আহারের আয়োজন থাকিত। আমি বিলাত হইতে ফিরিয়া আসার পর একবার এই সম্মিলনী আহূত হইয়াছিল—ইহাই

শেষবার। এই সম্মিলনী উপলক্ষ্যেই বাল্মীকি-প্রতিভা রচিত হয়। আমি বাল্মীকি সাজিয়াছিলাম এবং আমার ভ্রাতুষ্পুত্রী প্রতিভা সরস্বতী সাজিয়াছিলেন—বাল্মীকি-প্রতিভা নামের মধ্যে সেই ইতিহাসটুকু রহিয়া গিয়াছে।

হর্বট্ স্পেন্সেরের একটা লেখার মধ্যে পড়িয়াছিলাম যে সচরাচর কথার মধ্যে যেখানে একটু হৃদয়াবেগের সঞ্চার হয় সেখানে আপনিই কিছু না কিছু সুর লাগিয়া যায়। বস্তুত রাগ দুঃখ আনন্দ বিস্ময় আমরা কেবলমাত্র কথা দিয়া প্রকাশ করি না—কথার সঙ্গে সুর থাকে এই কথাবার্তার আনুষঙ্গিক সুরটাই উৎকর্ষ সাধন করিয়া মানুষ সঙ্গীত পাইয়াছে। স্পেন্সরের এই কথাটা মনে লাগিয়াছিল। ভাবিয়াছিলাম এই মত অনুসারে আগাগোড়া সুর করিয়া নানা ভাবকে গানের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিয়া অভিনয় করিয়া গেলে চলিবে না কেন? আমাদের দেশে কথকতায় কতকটা এই চেষ্টা আছে; তাহাতে বাক্য মাঝে মাঝে সুরকে আশ্রয় করে, অথচ তাহা তালমান-সঙ্গত রীতিমত সঙ্গীত নহে। ছন্দ হিসাবে অমিত্রাক্ষর ছন্দ যেমন, গান হিসাবে এও সেইরূপ—ইহাতে তালের কড়াক্কড় বাঁধন নাই —একটা লয়ের মাত্রা আছে,—ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য কথার ভিতরকার ভাবাবেগকে পরিস্ফুট করিয়া তোলা—কোনো বিশেষ রাগিণী বা তালকে বিশুদ্ধ করিয়া প্রকাশ করা নহে। বাল্মীকি-প্রতিভায় গানের বাঁধন সম্পূর্ণ ছিন্ন করা হয় নাই, তবু ভাবের অনুগমন করিতে গিয়া তালটাকে খাটো করিতে

হইয়াছে। অভিনয়টাই মুখ্য হওয়াতে এই তালের ব্যতিক্রম শ্রোতাদিগকে দুঃখ দেয় না।

বাল্মীকি-প্রতিভার গানসম্বন্ধে এই নূতন পন্থায় উৎসাহ বোধ করিয়া এই শ্রেণীর আরো একটা গীতিনাট্য লিখিয়াছিলাম। তাহার নাম কালমৃগয়া। দশরথকর্ত্তৃক অন্ধমুনির পুত্রবধ তাহার নাট্যবিষয়। তেতলার ছাদে ষ্টেজ খাটাইয়া ইহার অভিনয় হইয়াছিল—ইহার করুণরসে শ্রোতারা অত্যন্ত বিচলিত হইয়াছিলেন। পরে, এই গীতিনাট্যের অনেকটা অংশ বাল্মীকি-প্রতিভার সঙ্গে মিশাইয়া দিয়াছিলাম বলিয়া ইহা গ্রন্থাবলীর মধ্যে প্রকাশিত হয় নাই।

ইহার অনেককাল পরে "মায়ার খেলা" বলিয়া আর একটা গীতিনাট্য লিখিয়াছিলাম কিন্তু সেটা ভিন্ন জাতের জিনিষ। তাহাতে নাট্য মুখ্য নহে, গীতই মুখ্য। বাল্মীকি-প্রতিভা ও কালমৃগয়া যেমন গানের সূত্রে নাট্যের মালা, মায়ারখেলা তেমনি নাট্যের সূত্রে গানের মালা। ঘটনা-স্রোতের পরে তাহার নির্ভর নহে, হৃদয়াবেগই তাহার প্রধান উপকরণ। বস্তুত "মায়ার খেলা" যখন লিখিয়াছিলাম তখন গানের রসেই সমস্ত মন অভিষিক্ত হইয়াছিল।

বাল্মীকি-প্রতিভা ও কালমৃগয়া যে উৎসাহে লিখিয়াছিলাম সে উৎসাহে আর কিছু রচনা করি নাই। ঐ দুটি গ্রন্থে আমাদের সেই সময়কার একটা সঙ্গীতের উত্তেজনা প্রকাশ পাইয়াছে। জ্যোতিদাদা তখন প্রত্যহই প্রায় সমস্তদিন ওস্তাদি গানগুলাকে পিয়ানো যন্ত্রের মধ্যে ফেলিয়া তাহা-

দিগকে যথেচ্ছা মন্থন করিতে প্রবৃত্ত ছিলেন। তাহাতে ক্ষণে ক্ষণে রাগিণীগুলির একএকটি অপূর্ব্বমূর্ত্তি ও ভাবব্যঞ্জনা প্রকাশ পাইত। যে সকল সুর বাঁধা নিয়মের মধ্যে মন্দগতিতে দস্তুর রাখিয়া চলে তাহাদিগকে প্রথাবিরুদ্ধ বিপর্য্যস্তভাবে দৌড় করাইবামাত্র সেই বিপ্লবে তাহাদের প্রকৃতিতে নূতন নূতন অভাবনীয় শক্তি দেখা দিত এবং তাহাতে আমাদের চিত্তকে সর্ব্বদা বিচলিত করিয়া তুলিত। সুরগুলা যেন নানা প্রকার কথা কহিতেছে এইরূপ আমরা স্পষ্ট শুনিতে পাইতাম। আমি ও অক্ষয়বাবু অনেক সময়ে জ্যোতিদ্দাদার সেই বাজনার সঙ্গে সঙ্গে সুরে কথা যোজনার চেষ্টা করিতাম। কথাগুলি যে সুপাঠ্য হইত তাহা নহে, তাহারা সেই সুরগুলির বাহনের কাজ করিত।

এইরূপ একটা দস্তুরভাঙা গীতবিপ্লবের প্রলয়ানন্দে এই দুটি নাট্য লেখা। এই জন্য উহাদের মধ্যে তালবেতালের নৃত্য আছে এবং ইংরেজি বাংলার বাছবিচার নাই। আমার অনেক মতে ও রচনারীতিতে আমি বাংলা দেশের পাঠক-সমাজকে বারম্বার উত্যক্ত করিয়া তুলিয়াছি কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সঙ্গীতসম্বন্ধে উক্ত দুই গীতনাট্যে যে দুঃসাহসিকতা প্রকাশ পাইয়াছে তাহাতে কেহই কোনো ক্ষোভ প্রকাশ করেন নাই এবং সকলেই খুসি হইয়া ঘরে ফিরিয়াছেন। বাল্মীকি-প্রতিভায় অক্ষয়বাবুর কয়েকটি গান আছে এবং ইহার দুইটি গানে বিহারী চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সারদামঙ্গল সঙ্গীতের দুই একস্থানের ভাষা ব্যবহার করা হইয়াছে।

এই দুই গীতিনাট্যের অভিনয়ে আমিই প্রধান পদ গ্রহণ করিয়াছিলাম। বাল্যকাল হইতেই আমার মনের মধ্যে নাট্যাভিনয়ের সখ ছিল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল এ কার্য্যে আমার স্বাভাবিক নিপুণতা আছে। আমার এই বিশ্বাস অমূলক ছিল না তাহার প্রমাণ হইয়াছে। নাট্যমঞ্চে সাধারণের সমক্ষে প্রকাশ হইবার পূর্ব্বে জ্যোতিদাদার "এমন কর্ম্ম আর ক'রব না" প্রহসনে আমি অলীকবাবু সাজিয়াছিলাম। সেই আমার প্রথম অভিনয়। তখন আমার অল্প বয়স, গান গাহিতে আমার কণ্ঠের ক্লান্তি বা বাধামাত্র ছিল না;—তখন বাড়িতে দিনের পর দিন, প্রহরের পর প্রহর সঙ্গীতের অবিরলবিগলিত ঝরণা ঝরিয়া তাহার শীকরবর্ষণে মনের মধ্যে সুরের রামধনুকের রঙ ছড়াইয়া দিতেছে; তখন নবযৌবনে নবনব উদ্যম নূতন নূতন কৌতূহলের পথ ধরিয়া ধাবিত হইতেছে; তখন সকল জিনিষই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে চাই, কিছু যে পারিব না এমন মনেই হয় না; তখন লিখিতেছি, গাহিতেছি, অভিনয় করিতেছি, নিজেকে সকল দিকেই প্রচুরভাবে ঢালিয়া দিতেছি—আমার সেই কুড়িবছরের বয়সটাতে এমনি করিয়াই পদক্ষেপ করিয়াছি। সেদিন এই যে আমার সমস্ত শক্তিকে এমন দুর্দ্দাম উৎসাহে দৌড় করিয়াছিলেন তাহার সারথী ছিলেন জ্যোতিদাদা। তাঁহার কোনো ভয় ছিল না। যখন নিতান্তই বালক ছিলাম তখন তিনি আমাকে ঘোড়ায় চড়াইয়া তাঁহার সঙ্গে ছুট করাইয়াছেন, আনাড়ি সওয়ার পড়িয়া যাইব বলিয়া কিছুমাত্র

উদ্বেগ প্রকাশ করেন নাই। সেই আমার বাল্যবয়সে একদিন শিলাইদহে যখন খবর আসিল যে গ্রামের বনে একটা বাঘ আসিয়াছে—তখন আমাকে তিনি শিকারে লইয়া গেলেন,—হাতে আমার অস্ত্র নাই, থাকিলেও তাহাতে বাঘের চেয়ে আমারই বিপদের ভয় বেশি, বনের বাহিরে জুতা খুলিয়া একটা বাঁশ গাছের আধকাটা কঞ্চির উপর চড়িয়া জ্যোতি-দাদার পিছনে কোনোমতে বসিয়া রহিলাম,—অসভ্য জন্তুটা গায়ে হাত তুলিলে তাহাকে যে দুই একঘা জুতা কষাইয়া অপমান করিতে পারিব সে পথও ছিল না। এমনি করিয়া ভিতরে বাহিরে সকল দিকেই সমস্ত বিপদের সম্ভাবনার মধ্যেও তিনি আমাকে মুক্তি দিয়াছেন;—কোনো বিধি-বিধানকে তিনি ভ্রূক্ষেপ করেন নাই এবং আমার সমস্ত চিত্ত-বৃত্তিকে তিনি সঙ্কোচমুক্ত করিয়া দিয়াছেন।

সন্ধ্যাসঙ্গীত

নিজের মধ্যে অবরুদ্ধ যে অবস্থার কথা পূর্ব্বে লিখিয়াছি, মোহিতবাবু কর্ত্তৃক সম্পাদিত আমার গ্রন্থাবলীতে সেই অবস্থার কবিতাগুলি "হৃদয়-অরণ্য" নামের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। প্রভাতসঙ্গীতে "পুনর্মিলন" নামক কবিতায় আছে—

"হৃদয় নামেতে এক বিশাল অরণ্য আছে
দিশে দিশে নাহিক কিনারা,
তারি মাঝে হনু পথহারা।
সে বন আঁধারে ঢাকা, গাছের জটিল শাখা
সহস্র স্নেহের বাহু দিয়ে
আঁধার পালিছে বুকে নিয়ে।"

"হৃদয়-অরণ্য" নাম এই কবিতা হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে।

এইরূপে বাহিরের সঙ্গে যখন জীবনটার যোগ ছিল না, যখন নিজের হৃদয়েরই মধ্যে আবিষ্ট অবস্থায় ছিলাম, যখন কারণহীন আবেগ ও লক্ষ্যহীন আকাঙ্ক্ষার মধ্যে আমার কল্পনা নানা ছদ্মবেশে ভ্রমণ করিতেছিল তখনকার অনেক কবিতা নূতন গ্রন্থাবলী হইতে বর্জ্জন করা হইয়াছে—কেবল "সন্ধ্যাসঙ্গীত"-এ প্রকাশিত কয়েকটি কবিতা হৃদয়-অরণ্য বিভাগে স্থান পাইয়াছে।

এক সময়ে জ্যোতিদাদারা দূরদেশে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন—তেতলার ছাদের ঘরগুলি শূন্য ছিল। সেই সময় আমি সেই ছাদ ও ঘর অধিকার করিয়া নির্জ্জন দিনগুলি যাপন করিতাম।

এইরূপে যখন আপন মনে একা ছিলাম তখন, জানিনা কেমন করিয়া, কাব্যরচনার যে সংস্কারের মধ্যে বেষ্টিত ছিলাম সেটা খসিয়া গেল। আমার সঙ্গীরা যেসব কবিতা ভালো বাসিতেন ও তাঁহাদের নিকট খ্যাতি পাইবার ইচ্ছায় মন স্বভাবতই যেসব কবিতার ছাঁচে লিখিবার চেষ্টা করিত, বোধ

করি, তাঁহারা দূরে যাইতেই আপনা-আপনি সেইসকল কবিতার শাসন হইতে আমার চিত্ত মুক্তি লাভ করিল।

একটা শ্লেট লইয়া কবিতা লিখিতাম। সেটাও বোধ হয় একটা মুক্তির লক্ষণ। তাহার আগে কোমর বাঁধিয়া যখন খাতায় কবিতা লিখিতাম তাহার মধ্যে নিশ্চয়ই রীতিমত কাব্য লিখিবার একটা পণ ছিল, কবিযশের পাকা সেহায় সেগুলি জমা হইতেছে বলিয়া নিশ্চয়ই অন্যের সঙ্গে তুলনা করিয়া মনে মনে হিসাব মিলাইবার একটা চিন্তা ছিল কিন্তু শ্লেটে যাহা লিখিতাম তাহা লিখিবার খেয়ালেই লেখা। শ্লেট জিনিষটা বলে, ভয় কি তোমার, যাহা খুসি তাহাই লেখনা, হাত বুলাইলেই তো মুছিয়া যাইবে।

কিন্তু এমনি করিয়া দুটো একটা কবিতা লিখিতেই মনের মধ্যে ভারি একটা আনন্দের আবেগ আসিল। আমার সমস্ত অন্তঃকরণ বলিয়া উঠিল—বাঁচিয়া গেলাম। যাহা লিখিতেছি, এ দেখিতেছি সম্পূর্ণ আমারই।

ইহাকে কেহ যেন গর্ব্বোচ্ছ্বাস বলিয়া মনে না করেন। পূর্ব্বের অনেক রচনায় বরঞ্চ গর্ব্ব ছিল—কারণ গর্ব্বই সে-সব লেখার শেষ বেতন। নিজের প্রতিষ্ঠাসম্বন্ধে হঠাৎ নিঃসংশয়তা অনুভব করিবার যে পরিতৃপ্তি তাহাকে অহঙ্কার বলিব না। ছেলের প্রতি মা-বাপের প্রথম যে আনন্দ, সে, ছেলে সুন্দর বলিয়া নহে, ছেলে যথার্থ আমারই বলিয়া। ইহার সঙ্গে সঙ্গে ছেলের গুণ স্মরণ করিয়া তাঁহারা গর্ব্ব অনুভব করিতে পারেন কিন্তু সে আর-একটা জিনিষ। এই স্বাধীনতার প্রথম

আনন্দের বেগে ছন্দোবন্ধকে আমি একেবারেই খাতির করা ছাড়িয়া দিলাম। নদী যেমন একটা খালের মতো সীধা চলে না—আমার ছন্দ তেমনি আঁকিয়া বাঁকিয়া নানামূর্ত্তি ধারণ করিয়া চলিতে লাগিল। আগে হইলে এটাকে অপরাধ বলিয়া গণ্য করিতাম কিন্তু এখন লেশমাত্র সঙ্কোচ বোধ হইল না। স্বাধীনতা আপনাকে প্রথম প্রচার করিবার সময় নিয়মকে ভাঙে, তাহার পরে নিয়মকে আপন হাতে সে গড়িয়া তুলে—তখনই সে যথার্থ আপনার অধীন হয়।

আমার সেই উচ্ছৃঙ্খল কবিতা শোনাইবার একজনমাত্র লোক তখন ছিলেন অক্ষয়বাবু। তিনি হঠাৎ আমার এই লেখাগুলি দেখিয়া ভারি খুসি হইয়া বিস্ময় প্রকাশ করিলেন। তাঁহার কাছ হইতে অনুমোদন পাইয়া আমার পথ আরো প্রশস্ত হইয়া গেল।

বিহারী চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার বঙ্গসুন্দরী কাব্যে যে ছন্দের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন তাহা তিনমাত্রামূলক—যেমন

> একদিন দেব তরুণ তপন
> হেরিলেন সুরনদীর জলে
> অপরূপ এক কুমারীরতন
> খেলা করে নীল নলিনী-দলে।

তিনমাত্রা জিনিষটা দুইমাত্রার মতো চৌকা নহে, তাহা গোলার মতো গোল, এই জন্য তাহা দ্রুতবেগে গড়াইয়া

চলিয়া যায়, তাহার এই বেগবান গতির নৃত্য যেন ঘন ঘন ঝঙ্কারে নূপুর বাজাইতে থাকে। একদা এই ছন্দটাই আমি বেশি করিয়া ব্যবহার করিতাম। ইহা যেন তুই পায়ে চলা নহে, ইহা যেন বাইসিকেলে ধাবমান হওয়ার মতো। এইটেই আমার অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল। সন্ধ্যাসঙ্গীতে আমি ইচ্ছা করিয়া নহে কিন্তু স্বভাবতই এই বন্ধন ছেদন করিয়াছিলাম। তখন কোনো বন্ধনের দিকে তাকাই নাই। মনে কোনো ভয়ডর যেন ছিল না। লিখিয়া গিয়াছি, কাহারো কাছে কোনো জবাবদিহির কথা ভাবি নাই। কোনো প্রকার পূর্ব্ব-সংস্কারকে খাতির না করিয়া এমনি করিয়া লিখিতে যাওয়াতে যে জোর পাইলাম তাহাতেই প্রথম এই আবিষ্কার করিলাম যে যাহা আমারি সকলের চেয়ে কাছে পড়িয়াছিল তাহাকেই আমি দূরে সন্ধান করিয়া ফিরিয়াছি। কেবলমাত্র নিজের উপর ভরসা করিতে পারি নাই বলিয়াই নিজের জিনিষকে পাই নাই। হঠাৎ স্বপ্ন হইতে জাগিয়াই যেন দেখিলাম আমার হাতে শৃঙ্খল পরান নাই। সেই জন্যই হাতটাকে যেমন খুসি ব্যবহার করিতে পারি এই আনন্দটাকে প্রকাশ করিবার জন্যই হাতটাকে যথেচ্ছ ছুঁড়িয়াছি।

আমার কাব্যলেখার ইতিহাসের মধ্যে এই সময়টাই আমার পক্ষে সকলের চেয়ে স্মরণীয়। কাব্যহিসাবে সন্ধ্যা-সঙ্গীতের মূল্য বেশি না হইতে পারে। উহার কবিতাগুলি যথেষ্ট কাঁচা। উহার ছন্দ ভাষা ভাব, মূর্ত্তি ধরিয়া, পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে পারে নাই। উহার গুণের মধ্যে এই যে, আমি

হঠাৎ একদিন আপনার ভরসায় যা খুসি তাই লিখিয়া গিয়াছি। সুতরাং সে লেখাটার মূল্য না থাকিতে পারে কিন্তু খুসিটার মূল্য আছে।

গানসম্বন্ধে প্রবন্ধ

ব্যারিষ্টার হইব বলিয়া বিলাতে আয়োজন সুরু করিয়াছিলাম এমন সময়ে পিতা আমাকে দেশে ডাকিয়া আনিলেন। আমার কৃতিত্বলাভের এই সুযোগ ভাঙিয়া যাওয়াতে বন্ধুগণ কেহ কেহ দুঃখিত হইয়া আমাকে পুনরায় বিলাতে পাঠাইবার জন্য পিতাকে অনুরোধ করিলেন। এই অনুরোধের জোরে আবার একবার বিলাতে যাত্রা করিয়া বাহির হইলাম। সঙ্গে আরো একজন আত্মীয় ছিলেন। ব্যারিষ্টার হইয়া আসাটা আমার ভাগ্য এমনি সম্পূর্ণ নামাঞ্জুর করিয়া দিলেন যে বিলাত পর্য্যন্ত পৌঁছিতেও হইল না—বিশেষ কারণে মান্দ্রাজের ঘাটে নামিয়া পড়িয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিতে হইল। ঘটনাটা যতো বড়ো গুরুতর, কারণটা তদনুরূপ কিছুই নহে; শুনিলে লোকে হাসিবে এবং সে হাস্যটা ষোলআনা আমারই প্রাপ্য নহে; এই জন্যই সেটাকে বিবৃত করিয়া বলিলাম না। যাহা হউক লক্ষ্মীর প্রসাদলাভের জন্য দুইবার যাত্রা করিয়া দুইবারই

তাড়া খাইয়া আসিয়াছি। আশা করি, বারলাইব্রেরির ভূভার-বৃদ্ধি না করাতে আইনদেবতা আমাকে সদয়চক্ষে দেখিবেন।

পিতা তখন মসুরি পাহাড়ে ছিলেন। বড়ো ভয়ে ভয়ে তাঁহার কাছে গিয়াছিলাম। তিনি কিছুমাত্র বিরক্তি প্রকাশ করিলেন না, বরং মনে হইল তিনি খুসি হইয়াছেন। নিশ্চয়ই তিনি মনে করিয়াছিলেন ফিরিয়া আসাই আমার পক্ষে মঙ্গলকর হইয়াছে এবং এই মঙ্গল ঈশ্বর-আশীর্ব্বাদেই ঘটিয়াছে।

দ্বিতীয় বার বিলাতে যাইবার পূর্ব্বদিন সায়াহ্নে বেথুন-সোসাইটির আমন্ত্রণে মেডিকেল কলেজ হলে আমি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলাম। সভাস্থলে এই আমার প্রথম প্রবন্ধ পড়া। সভাপতি ছিলেন বৃদ্ধ রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রবন্ধের বিষয় ছিল সঙ্গীত। যন্ত্রসঙ্গীতের কথা ছাড়িয়া দিয়া আমি গেয় সঙ্গীত সম্বন্ধে ইহাই বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম যে গানের কথাকেই গানের সুরের দ্বারা পরিস্ফুট করিয়া তোলা এই শ্রেণীর সঙ্গীতের মুখ্য উদ্দেশ্য। আমার প্রবন্ধে লিখিত অংশ অল্পই ছিল। আমি দৃষ্টান্ত দ্বারা বক্তব্যটিকে সমর্থনের চেষ্টায় প্রায় আগাগোড়াই নানাপ্রকার সুর দিয়া নানাভাবের গান গাহিয়াছিলাম। সভাপতি মহাশয় "বন্দে বাল্মীকি-কোকিলং" বলিয়া আমার প্রতি যে প্রচুর সাধুবাদ প্রয়োগ করিয়াছিলেন আমি তাহার প্রধান কারণ এই বুঝি যে, আমার বয়স তখন অল্প ছিল এবং বালককণ্ঠে নানা বিচিত্র গান শুনিয়া তাঁহার মন আর্দ্র হইয়াছিল। কিন্তু যে মতটিকে

তখন এত স্পর্দ্ধার সঙ্গে ব্যক্ত করিয়াছিলাম সে মতটি যে সত্য নয় সে কথা আজ স্বীকার করিব। গীতিকলার নিজেরই একটি বিশেষ প্রকৃতি ও বিশেষ কাজ আছে। গানে যখন কথা থাকে তখন কথার উচিত হয় না সেই সুযোগে গানকে ছাড়াইয়া যাওয়া, সেখানে সে গানেরই বাহনমাত্র। গান নিজের ঐশ্বর্য্যেই বড়ো—বাক্যের দাসত্ব সে কেন করিতে যাইবে? বাক্য যেখানে শেষ হইয়াছে সেইখানেই গানের আরম্ভ। যেখানে অনির্ব্বচনীয় সেইখানেই গানের প্রভাব। বাক্য যাহা বলিতে পারে না গান তাহাই বলে। এইজন্য গানের কথাগুলিতে কথার উপদ্রব যতই কম থাকে ততই ভালো। হিন্দুস্থানী গানের কথা সাধারণত এতই অকিঞ্চিৎকর যে তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া সুর আপনার আবেদন অনায়াসে প্রচার করিতে পারে। এইরূপে রাগিণী যেখানে শুদ্ধমাত্র স্বররূপেই আমাদের চিত্তকে অপরূপ ভাবে জাগ্রত করিতে পারে সেইখানেই সঙ্গীতের উৎকর্ষ। কিন্তু বাংলাদেশে বহুকাল হইতে কথারই আধিপত্য এত বেশি যে এখানে বিশুদ্ধ সঙ্গীত নিজের স্বাধীন অধিকারটি লাভ করিতে পারে নাই। সেইজন্য এদেশে তাহাকে ভগিনী কাব্যকলার আশ্রয়েই বাস করিতে হয়। বৈষ্ণব কবিদের পদাবলী হইতে নিধুবাবুর গান পর্য্যন্ত সকলেরই অধীন থাকিয়া সে আপনার মাধুর্য্যবিকাশের চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু আমাদের দেশে স্ত্রী যেমন স্বামীর অধীনতা স্বীকার করিয়াই স্বামীর উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে পারে, এদেশে গানও তেমনি বাক্যের অনুবর্ত্তন

করিবার ভার লইয়া বাক্যকে ছাড়াইয়া যায়। গান রচনা করিবার সময় এইটে বার বার অনুভব করা গিয়াছে। গুন গুন করিতে করিতে যখনি একটা লাইন লিখিলাম—"তোমার গোপন কথাটি সখি রেখোনা মনে"—তখনি দেখিলাম সুর যে জায়গায় কথাটা উড়াইয়া লইয়া গেল, কথা আপনি সেখানে পায়ে হাঁটিয়া গিয়া পৌঁছিতে পারিত না। তখন মনে হইতে লাগিল আমি যে গোপন কথাটি শুনিবার জন্য সাধাসাধি করিতেছি তাহা যেন বনশ্রেণীর শ্যামলিমার মধ্যে মিলাইয়া আছে, পূর্ণিমারাত্রির নিস্তব্ধ শুভ্রতার মধ্যে ডুবিয়া আছে, দিগন্তরালের নীলাভ সুদূরতার মধ্যে অবগুণ্ঠিত হইয়া আছে—তাহা যেন সমস্ত জলস্থলআকাশের নিগূঢ় গোপন কথা। বহু বাল্যকালে একটা গান শুনিয়াছিলাম "তোমায় বিদেশিনী সাজিয়ে কে দিলে!" সেই গানের ঐ একটিমাত্র পদ মনে এমন একটি অপরূপ চিত্র আঁকিয়া দিয়াছিল যে আজও ঐ লাইনটা মনের মধ্যে গুঞ্জন করিয়া বেড়ায়। এক-দিন ঐ গানের ঐ পদটার মোহে আমিও একটি গান লিখিতে বসিয়াছিলাম। স্বরগুঞ্জনের সঙ্গে প্রথম লাইনটা লিখিয়া-ছিলাম—"আমি চিনিগো চিনি তোমারে, ওগো বিদেশিনী"—সঙ্গে যদি সুরটুকু না থাকিত তবে এ গানের কী ভাব দাঁড়াইত বলিতে পারি না। কিন্তু ঐ সুরের মন্ত্রগুণে বিদেশিনীর এক অপরূপ মূর্ত্তি মনে জাগিয়া উঠিল। আমার মন বলিতে লাগিল, আমাদের এই জগতের মধ্যে একটি কোন্ বিদেশিনী আনাগোনা করে—কোন্ রহস্যসিন্ধুর পরপারে ঘাটের উপরে

তাহার বাড়ি—তাহাকেই শারদপ্রাতে, মাধবী রাত্রিতে ক্ষণে ক্ষণে দেখিতে পাই—হৃদয়ের মাঝখানেও মাঝে মাঝে তাহার আভাস পাওয়া গেছে, আকাশে কান পাতিয়া তাহার কণ্ঠস্বর কখনো বা শুনিয়াছি। সেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিশ্ববিমোহিনী বিদেশিনীর দ্বারে আমার গানের সুর আমাকে আনিয়া উপস্থিত করিল এবং আমি কহিলাম—

ভুবন ভ্রমিয়া শেষে
এসেছি তোমারি দেশে,
আমি অতিথি তোমারি দ্বারে, ওগো বিদেশিনী!

ইহার অনেক দিন পরে একদিন বোলপুরের রাস্তা দিয়া কে গাহিয়া যাইতেছিল—

খাঁচার মাঝে অচিন্ পাখী কম্‌নে আসে যায়
ধ'র্‌তে পারলে মনোবেড়ি দিতেম পাখীর পায়।"

দেখিলাম বাউলের গানও ঠিক ঐ একই কথা বলিতেছে। মাঝে মাঝে বদ্ধ খাঁচার মধ্যে আসিয়া অচিন পাখী বন্ধনহীন অচেনার কথা বলিয়া যায়—মন তাহাকে চিরন্তন করিয়া ধরিয়া রাখিতে চায় কিন্তু পারে না। এই অচিন্ পাখীর নিঃশব্দ যাওয়াআসার খবর গানের সুর ছাড়া আর কে দিতে পারে!

এই কারণে চিরকাল গানের বই ছাপাইতে সঙ্কোচ বোধ করি। কেননা গানের বহিতে আসল জিনিষই বাদ পড়িয়া যায়। সঙ্গীত বাদ দিয়া সঙ্গীতের বাহনগুলিকে সাজাইয়া রাখিলে কেমন হয় যেমন গণপতিকে বাদ দিয়া তাঁহার মুষিকটাকে ধরিয়া রাখা।

গঙ্গাতীর

বিলাতযাত্রার আরম্ভ পথ হইতে যখন ফিরিয়া আসিলাম তখন জ্যোতিদাদা চন্দননগরে গঙ্গাধারের বাগানে বাস করিতেছিলেন—আমি তাঁহাদের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। আবার সেই গঙ্গা! সেই আলস্যে আনন্দে অনির্ব্বচনীয়, বিষাদে ও ব্যাকুলতায় জড়িত, স্নিগ্ধ শ্যামল নদীতীরের সেই কলধ্বনি-করুণ দিনরাত্রি! এইখানেই আমার স্থান, এই-খানেই আমার মাতৃহস্তের অন্নপরিবেষণ হইয়া থাকে। আমার পক্ষে বাংলাদেশের এই আকাশভরা আলো, এই দক্ষিণের বাতাস, এই গঙ্গার প্রবাহ, এই রাজকীয় আলস্য, এই আকাশের নীল ও পৃথিবীর সবুজের মাঝখানকার দিগন্ত-প্রসারিত উদার অবকাশের মধ্যে সমস্ত শরীর মন ছাড়িয়া দিয়া আত্মসমর্পণ—তৃষ্ণার জল ও ক্ষুধার খাদ্যের মতোই

অত্যাবশ্যক ছিল। সে তো খুব বেশি দিনের কথা নহে—তবু ইতিমধ্যেই সময়ের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। আমাদের তরুচ্ছায়াপ্রচ্ছন্ন গঙ্গাতটের নিভৃত নীড়গুলির মধ্যে কলকারখানা, ঊর্দ্ধফণা সাপের মতো প্রবেশ করিয়া সোঁ সোঁ শব্দে কালো নিঃশ্বাস ফুঁসিতেছে। এখন খরমধ্যাহ্নে আমাদের মনের মধ্যেও বাংলাদেশের প্রশস্ত স্নিগ্ধচ্ছায়া সঙ্কীর্ণতম হইয়া আসিয়াছে। এখন দেশের সর্ব্বত্রই অনবসর আপন সহস্র বাহু প্রসারিত করিয়া ঢুকিয়া পড়িয়াছে। হয় তো সে ভালোই—কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন ভালো এমন কথাও জোর করিয়া বলিতে পারি না।

আমার গঙ্গাতীরের সেই সুন্দর দিনগুলি গঙ্গার জলে উৎসর্গ-করা পূর্ণবিকশিত পদ্মফুলের মতো একটি একটি করিয়া ভাসিয়া যাইতে লাগিল। কখনো বা ঘনঘোর বর্ষার দিনে হার্ম্মোনিয়ম যন্ত্রযোগে বিদ্যাপতির "ভরাবাদর মাহভাদর" পদটিতে মনের মতো সুর বসাইয়া বর্ষার রাগিণী গাহিতে গাহিতে বৃষ্টিপাতমুখরিত জলধারাচ্ছন্ন মধ্যাহ্ন, ক্ষ্যাপার মতো কাটাইয়া দিতাম; কখনো বা সূর্য্যাস্তের সময় আমরা নৌকা লইয়া বাহির হইয়া পড়িতাম—জ্যোতিদাদা বেহালা বাজাইতেন আমি গান গাহিতাম; পূরবী রাগিণী হইতে আরম্ভ করিয়া যখন বেহাগে গিয়া পৌঁছিতাম তখন পশ্চিমতটের আকাশে সোনার খেলনার কারখানা একেবারে নিঃশেষে দেউলে হইয়া গিয়া পূর্ব্ববনান্ত হইতে চাঁদ উঠিয়া আসিত। আমরা যখন বাগানে ফিরিয়া আসিয়া নদীতীরের ছাদটার উপরে বিছানা

করিয়া বসিতাম তখন জলে স্থলে শুভ্র শান্তি, নদীতে নৌকা প্রায় নাই, তীরের বনরেখা অন্ধকারে নিবিড়, নদীর তরঙ্গহীন প্রবাহের উপর আলো ঝিক্‌মিক্ করিতেছে।

আমরা যে বাগানে ছিলাম তাহা মোরান্ সাহেবের বাগান নামে খ্যাত ছিল। গঙ্গা হইতে উঠিয়া ঘাটের সোপান-গুলি পাথরে বাঁধানো একটি প্রশস্ত সুদীর্ঘ বারান্দায় গিয়া পৌঁছিত। সেই বারান্দাটাই বাড়ির বারান্দা। ঘরগুলি সমতল নহে—কোনো ঘর উচ্চ তলে, কোনো ঘরে দুই চারি ধাপ সিঁড়ি বাহিয়া নামিয়া যাইতে হয়। সবগুলি ঘর যে সমরেখায় তাহাও নহে। ঘাটের উপরেই বৈঠকখানাঘরের সাসিগুলিতে রঙিন ছবিওয়ালা কাচ বসানো ছিল। একটি ছবি ছিল, নিবিড় পল্লবে বেষ্টিত গাছের শাখায় একটি দোলা—সেই দোলায় রৌদ্রছায়াখচিত নিভৃত নিকুঞ্জে দুজনে দুলিতেছে; আর একটি ছবি ছিল, কোনো দুর্গপ্রাসাদের সিঁড়ি বাহিয়া উৎসববেশে সজ্জিত নরনারী কেহ বা উঠিতেছে কেহ বা নামিতেছে। সাসির উপরে আলো পড়িত এবং এই ছবিগুলি বড়ো উজ্জ্বল হইয়া দেখা দিত। এই দুটি ছবি সেই গঙ্গাতীরের আকাশকে যেন ছুটির সুরে ভরিয়া তুলিত। কোন্ দূর দেশের কোন দূরকালের উৎসব আপনার শব্দহীন কথাকে আলোর মধ্যে ঝল্‌মল্ করিয়া মেলিয়া দিত—এবং কোথাকার কোন্ একটি চিরনিভৃত ছায়ায় যুগলদোলনের রসমাধুর্য্য নদীতীরের বনশ্রেণীর মধ্যে একটি অপরিস্ফুট গল্পের বেদনা সঞ্চার করিয়া দিত। বাড়ির সর্ব্বোচ্চতলে চারিদিক-

খোলা একটি গোল ঘর ছিল। সেইখানে আমার কবিতা লিখিবার জায়গা করিয়া লইয়াছিলাম। সেখানে বসিলে ঘন গাছের মাথাগুলি ও খোলা আকাশ ছাড়া আর কিছু চোখে পড়িত না। তখনো সন্ধ্যাসঙ্গীতের পালা চলিতেছে—এই ঘরের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই লিখিয়াছিলাম—

অনন্ত এ আকাশের কোলে
টলমল মেঘের মাঝার—
এইখানে বাঁধিয়াছি ঘর
তোর তরে কবিতা আমার।

এখন হইতে কাব্যসমালোচকদের মধ্যে আমার সম্বন্ধে এই একটা রব উঠিতেছিল যে, আমি ভাঙাভাঙা ছন্দ ও আধ-আধ ভাষার কবি। সমস্তই আমার ধোঁয়া-ধোঁয়া ছায়া-ছায়া। কথাটা তখন আমার পক্ষে যতই অপ্রিয় হউক্ না কেন, তাহা অমূলক নহে। বস্তুতই সেই কবিতাগুলির মধ্যে বাস্তব সংসারের দৃঢ়ত্ব কিছুই ছিল না। ছেলেবেলা হইতেই বাহিরের লোকসংশ্রব হইতে বহুদূরে যেমন করিয়া গণ্ডিবদ্ধ হইয়া মানুষ হইয়াছিলাম তাহাতে লিখিবার সম্বল পাইব কোথায়? একটা কথা আমি মানিতে পারি না। তাঁহারা আমার কবিতাকে যখন ঝাপ্‌সা বলিতেন তখন সেই সঙ্গে এই খোঁচাটুকুও ব্যক্ত বা অব্যক্তভাবে যোগ করিয়া দিতেন—ওটা যেন একটা ফ্যাশান্। যাহার নিজের দৃষ্টি খুব ভালো সে ব্যক্তি কোনো যুবককে চশমা পরিতে দেখিলে অনেক সময়ে রাগ করে এবং মনে করে ও বুঝি চশমাটাকে অলঙ্কার-

রূপে ব্যবহার করিতেছে। বেচারা চোখে কম দেখে এ অপবাদটা স্বীকার করা যাইতে পারে কিন্তু কম দেখার ভান করে এটা কিছু বেশি হইয়া পড়ে।

যেমন নীহারিকাকে সৃষ্টিছাড়া বলা চলে না কারণ তাহা সৃষ্টির একটা সবিশেষ অবস্থার সত্য—তেমনি কাব্যের অস্ফুটতাকে ফাঁকি বলিয়া উড়াইয়া দিলে কাব্যসাহিত্যের একটা সত্যেরই অপলাপ করা হয়। মানুষের মধ্যে অবস্থা-বিশেষে একটা আবেগ আসে যাহা অব্যক্তের বেদনা, যাহা অপরিস্ফুটতার ব্যাকুলতা। মনুষ্যপ্রকৃতিতে তাহা সত্য সুতরাং তাহার প্রকাশকে মিথ্যা বলিব কী করিয়া! এরূপ কবিতার মূল নাই বলিলে ঠিক বলা হয় না, তবে কি না মূল্য নাই বলিয়া তর্ক করা চলিতে পারে। কিন্তু একেবারে নাই বলিলে কি অত্যুক্তি হইবে না? কেননা কাব্যের ভিতর দিয়া মানুষ আপনার হৃদয়কে ভাষায় প্রকাশ করিতে চেষ্টা করে; সেই হৃদয়ের কোনো অবস্থার পরিচয় যদি কোনো লেখায় ব্যক্ত হয় তবে মানুষ তাহাকে কুড়াইয়া রাখিয়া দেয়—ব্যক্তি যদি না হয় তবেই তাহাকে ফেলিয়া দিয়া থাকে। অতএব হৃদয়ের অব্যক্ত আকৃতিকে ব্যক্ত করায় পাপ নাই—যত অপরাধ ব্যক্ত না করিতে পারার দিকে। মানুষের মধ্যে একটা দ্বৈত আছে। বাহিরের ঘটনা, বাহিরের জীবনের সমস্ত চিন্তা ও আবেগের গম্ভীর অন্তরালে যে মানুষটা বসিয়া আছে, তাহাকে ভালো করিয়া চিনি না ও ভুলিয়া থাকি, কিন্তু জীবনের মধ্যে তাহার সত্তাকে তো লোপ করিতে পারি না।

বাহিরের সঙ্গে তাহার অন্তরের সুর যখন মেলে না—সামঞ্জস্য যখন সুন্দর ও সম্পূর্ণ হইয়া উঠে না তখন সেই অন্তর নিবাসীর পীড়ার বেদনায় মানসপ্রকৃতি ব্যথিত হইতে থাকে। এই বেদনাকে কোনো বিশেষ নাম দিতে পারি না—ইহার বর্ণনা নাই—এইজন্য ইহার যে রোদনের ভাষা তাহা স্পষ্ট ভাষা নহে—তাহার মধ্যে অর্থবদ্ধ কথার চেয়ে অর্থহীন সুরের অংশই বেশি। সন্ধ্যাসঙ্গীতে যে বিষাদ ও বেদনা ব্যক্ত হইতে চাহিয়াছে তাহার মূল সত্যটি সেই অন্তরের রহস্যের মধ্যে। সমস্ত জীবনের একটি মিল যেখানে আছে সেখানে জীবন কোনো মতে পৌঁছিতে পারিতেছিল না। নিদ্রায় অভিভূত চৈতন্য যেমন দুঃস্বপ্নের সঙ্গে লড়াই করিয়া কোনো মতে জাগিয়া উঠিতে চায়—ভিতরের সত্তাটি তেমনি করিয়াই বাহিরের সমস্ত জটিলতাকে কাটাইয়া নিজেকে উদ্ধার করিবার জন্য যুদ্ধ করিতে থাকে—অন্তরের গভীরতম অলক্ষ্য প্রদেশের সেই যুদ্ধের ইতিহাস অস্পষ্ট ভাষায় সন্ধ্যাসঙ্গীতে প্রকাশিত হইয়াছে। সকল সৃষ্টিতেই যেমন দুই শক্তির লীলা, কাব্যসৃষ্টির মধ্যেও তেমনি। যেখানে অসামঞ্জস্য অতিরিক্ত অধিক, অথবা সামঞ্জস্য যেখানে সম্পূর্ণ, সেখানে কাব্যলেখা বোধ হয় চলে না। যেখানে অসামঞ্জস্যের বেদনাই প্রবলভাবে সামঞ্জস্যকে পাইতে ও প্রকাশ করিতে চাহিতেছে সেইখানেই কবিতা বাঁশির অবরোধের ভিতর হইতে নিঃশ্বাসের মতো রাগিণীতে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে।

সন্ধ্যাসঙ্গীতের জন্ম হইলে পর সূতিকাগৃহে উচ্চস্বরে শাঁখ

বাজে নাই বটে কিন্তু তাই বলিয়া কেহ যে তাহাকে আদর করিয়া লয় নাই তাহা নহে। আমার অন্য কোনো প্রবন্ধে আমি বলিয়াছি—রমেশদত্ত মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ-সভার দ্বারের কাছে বঙ্কিম বাবু দাঁড়াইয়া ছিলেন;—রমেশ-বাবু বঙ্কিম বাবুর গলায় মালা পরাইতে উদ্যত হইয়াছেন এমন সময়ে আমি সেখানে উপস্থিত হইলাম। বঙ্কিম বাবু তাড়াতাড়ি সে মালা আমার গলায় দিয়া বলিলেন, "এ মালা ইহারই প্রাপ্য—রমেশ তুমি সন্ধ্যাসঙ্গীত পড়িয়াছ?" তিনি বলিলেন "না"।—তখন বঙ্কিম বাবু সন্ধ্যাসঙ্গীতের কোনো কবিতা সম্বন্ধে যে মত ব্যক্ত করিলেন তাহাতে আমি পুরস্কৃত হইয়াছিলাম।

প্রিয় বাবু

এই সন্ধ্যাসঙ্গীত রচনার দ্বারাই আমি এমন একজন বন্ধু পাইয়াছিলাম যাঁহার উৎসাহ অনুকূল আলোকের মতো আমাকে কাব্যরচনার বিকাশ চেষ্টায় প্রাণসঞ্চার করিয়া দিয়াছিল। তিনি শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন। তৎপূর্ব্বে ভগ্ন-হৃদয় পড়িয়া তিনি আমার আশা ত্যাগ করিয়াছিলেন, সন্ধ্যা-সঙ্গীতে তাঁহার মন জিতিয়া লইলাম। তাঁহার সঙ্গে যাঁহাদের

পরিচয় আছে তাঁহারা জানেন সাহিত্যের সাত সমুদ্রের নাবিক তিনি। দেশী বিদেশী প্রায় সকল ভাষার সকল সাহিত্যের বড়োরাস্তায় ও গলিতে তাঁহার সদাসর্ব্বদা আনাগোনা। তাঁহার কাছে বসিলে ভাবরাজ্যের অনেক দূরদিগন্তের দৃশ্য একেবারে দেখিতে পাওয়া যায়। সেটা আমার পক্ষে ভারি কাজে লাগিয়াছিল। সাহিত্য সম্বন্ধে পূরা সাহসের সঙ্গে তিনি আলোচনা করিতে পারিতেন—তাঁহার ভালোলাগা মন্দলাগা কেবলমাত্র ব্যক্তিগত রুচির কথা নহে। একদিকে বিশ্বসাহিত্যের রসভাণ্ডারে প্রবেশ ও অন্যদিকে নিজের শক্তির প্রতি নির্ভর ও বিশ্বাস—এই দুই বিষয়েই তাঁহার বন্ধুত্ব আমার যৌবনের আরম্ভ কালেই যে কত উপকার করিয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তখনকার দিনে যত কবিতাই লিখিয়াছি সমস্তই তাঁহাকে শুনাইয়াছি এবং তাঁহার আনন্দের দ্বারাই আমার কবিতাগুলির অভিষেক হইয়াছে। এই সুযোগটি যদি না পাইতাম তবে সেই প্রথম বয়সের চাষ আবাদে বর্ষা নামিত এবং তাহার পরে কাব্যের ফসলে ফলন কতটা হইত তাহা বলা শক্ত।

প্রভাত-সঙ্গীত

গঙ্গার ধারে বসিয়া সন্ধ্যা-সঙ্গীত ছাড়া কিছু কিছু গদ্যও লিখিতাম। সেও কোনো বাঁধা লেখা নহে—একরকম যা-খুসি তাই লেখা। ছেলেরা যেমন লীলাচ্ছলে পতঙ্গ ধরিয়া থাকে এও সেই রকম। মনের রাজ্যে যখন বসন্ত আসে তখন ছোটো ছোটো স্বল্পায়ু রঙীন ভাবনা উড়িয়া উড়িয়া বেড়ায়, তাহাদিগকে কেহ লক্ষ্যও করে না, অবকাশের দিনে সেই-গুলাকে ধরিয়া রাখিবার খেয়াল আসিয়াছিল। আসল কথা, তখন সেই একটা ঝোঁকের মুখে চলিয়াছিলাম—মন বুক ফুলাইয়া বলিতেছিল, আমার যাহা ইচ্ছা তাহাই লিখিব—কী লিখিব সে খেয়াল ছিল না কিন্তু আমিই লিখিব এইমাত্র তাহার একটা উত্তেজনা। এই ছোটো ছোটো গদ্য লেখাগুলা এক সময়ে বিবিধ প্রসঙ্গ নামে গ্রন্থ-আকারে বাহির হইয়াছে—প্রথম সংস্করণের শেষেই তাহাদিগকে সমাধি দেওয়া হইয়াছে, দ্বিতীয় সংস্করণে আর তাহাদিগকে নূতন জীবনের পাট্টা দেওয়া হয় নাই।

বোধ করি এই সময়েই বৌঠাকুরাণীর হাট নামে এক বড়ো নবেল লিখিতে সুরু করিয়াছিলাম।

এইরূপে গঙ্গাতীরে কিছুদিন কাটিয়া গেলে জ্যোতিদাদা কিছুদিনের জন্য চৌরঙ্গি জাদুঘরের নিকট দশ নম্বর সদর

ষ্ট্রীটে বাস করিতেন। আমি তাঁহার সঙ্গে ছিলাম। এখানেও একটু একটু করিয়া বৌঠাকুরাণীর হাট ও একটি একটি করিয়া সন্ধ্যা-সঙ্গীত লিখিতেছি এমন সময়ে আমরে মধ্যে হঠাৎ একটা কী উলট্‌ পালট্‌ হইয়া গেল।

একদিন জোড়াসাঁকোর বাড়ির ছাদের উপর অপরাহ্নের শেষে বেড়াইতেছিলাম। দিবাবসানের ম্লানিমার উপরে সূর্য্যাস্তের আভাটি জড়িত হইয়া সেদিনকার আসন্ন সন্ধ্যা আমার কাছে বিশেষভাবে মনোহর হইয়া প্রকাশ পাইয়াছিল। পাশের বাড়ির দেয়ালগুলা পর্য্যন্ত আমার কাছে সুন্দর হইয়া উঠিল। আমি মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, পরিচিত জগতের উপর হইতে এই যে তুচ্ছতার আবরণ একেবারে উঠিয়া গেল একি কেবলমাত্র সায়াহ্নের আলোক-সম্পাতের একটি জাদুমাত্র? কখনোই তাহা নয়। আমি বেশ দেখিতে পাইলাম ইহার আসল কারণটি এই যে, সন্ধ্যা আমারই মধ্যে আসিয়াছে—আমিই ঢাকা পড়িয়াছি। দিনের আলোতে আমিই যখন অত্যন্ত উগ্র হইয়াছিলাম তখন যাহা-কিছুকেই দেখিতে-শুনিতেছিলাম সমস্তকে আমিই জড়িত করিয়া আবৃত করিয়াছি। এখন সেই আমি সরিয়া আসিয়াছে বলিয়াই জগৎকে তাহার নিজের স্বরূপে দেখিতেছি। সে স্বরূপ কখনোই তুচ্ছ নহে—তাহা আনন্দময় সুন্দর। তাহার পর আমি মাঝে মাঝে ইচ্ছাপূর্ব্বক নিজেকে যেন সরাইয়া ফেলিয়া জগৎকে দর্শকের মতো দেখিতে চেষ্টা করিতাম, তখন মনটা খুসি হইয়া উঠিত। আমার মনে আছে,

জগৎটাকে কেমন করিয়া দেখিলে যে ঠিকমতো দেখা যায় এবং সেই সঙ্গে নিজের ভার লাঘব হয় সেই কথা একদিন বাড়ির কোনো আত্মীয়কে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম— কিছুমাত্র কৃতকার্য্য হই নাই তাহা জানি। এমন সময়ে আমার জীবনের একটা অভিজ্ঞতা লাভ করিলাম তাহা আজ পর্য্যন্ত ভুলিতে পারি নাই।

সদরষ্ট্রীটের রাস্তাটা যেখানে গিয়া শেষ হইয়াছে সেইখানে বোধ করি ফ্রী-স্কুলের বাগানের গাছ দেখা যায়। একদিন সকালে বারান্দায় দাঁড়াইয়া আমি সেইদিকে চাহিলাম। তখন সেই গাছগুলির পল্লবান্তরাল হইতে সূর্য্যোদয় হইতেছিল। চাহিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ এক মুহূর্ত্তের মধ্যে আমার চোখের উপর হইতে যেন একটা পর্দ্দা সরিয়া গেল। দেখিলাম একটি অপরূপ মহিমায় বিশ্ব-সংসার সমাচ্ছন্ন, আনন্দে এবং সৌন্দর্য্যে সর্ব্বত্রই তরঙ্গিত। আমার হৃদয়ে স্তরে স্তরে যে একটা বিষাদের আচ্ছাদন ছিল তাহা এক নিমিষেই ভেদ করিয়া আমার সমস্ত ভিতরটাতে বিশ্বের আলোক একেবারে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল। সেই-দিনই নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ কবিতাটি নির্ঝরের মতোই যেন উৎসারিত হইয়া বহিয়া চলিল। লেখা শেষ হইয়া গেল কিন্তু জগতের সেই আনন্দরূপের উপর তখনো যবনিকা পড়িয়া গেল না। এমনি হইল আমার কাছে তখন কেহই এবং কিছুই অপ্রিয় রহিল না। সেইদিনই কিম্বা তাঁহার পরের দিন একটা ঘটনা ঘটিল তাহাতে আমি নিজেই আশ্চর্য্য

বোধ করিলাম। একটি লোক ছিল সে মাঝে মাঝে আমাকে এই প্রকারের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিত, আচ্ছা মশায় আপনি কি ঈশ্বরকে কখনো স্বচক্ষে দেখিয়াছেন? আমাকে স্বীকার করিতেই হইত দেখি নাই—তখন সে বলিত আমি দেখিয়াছি। যদি জিজ্ঞাসা করিতাম, কিরূপ দেখিয়াছ? সে উত্তর করিত চোখের সম্মুখে বিজ্ বিজ্ করিতে থাকেন। এরূপ মানুষের সঙ্গে তত্ত্বালোচনায় কালযাপন সকল সময়ে প্রীতিকর হইতে পারে না। বিশেষতঃ তখন আমি প্রায় লেখার ঝোঁকে থাকিতাম। কিন্তু লোকটা ভালোমানুষ ছিল বলিয়া তাহাকে বাধা দিতে পারিতাম না, সমস্ত সহিয়া যাইতাম।

এইবার, মধ্যাহ্নকালে সেই লোকটি যখন আসিল তখন আমি সম্পূর্ণ আনন্দিত হইয়া তাহাকে বলিলাম, এস, এস। সে যে নির্ব্বোধ এবং অদ্ভুত রকমের ব্যক্তি, তাহার সেই বহিরাবরণটি যেন খুলিয়া গেছে। আমি যাহাকে দেখিয়া খুসি হইলাম এবং অভ্যর্থনা করিয়া লইলাম—সে তাহার ভিতরকার লোক—আমার সঙ্গে তাহার অনৈক্য নাই, আত্মীয়তা আছে। যখন তাহাকে দেখিয়া আমার কোনো পীড়া বোধ হইল না মনে হইল না যে, আমার সময় নষ্ট হইবে—তখন আমার ভারি আনন্দ হইল—বোধ হইল এই আমার মিথ্যা জাল কাটিয়া গেল, এতদিন এই সম্বন্ধে নিজেকে বারবার যে কষ্ট দিয়াছি, তাহা অলীক এবং অনাবশ্যক।

আমি বারান্দায় দাঁড়াইয়া থাকিতাম, রাস্তা দিয়া মুটে মজুর যে কেহ চলিত তাহাদের গতিভঙ্গী, শরীরের গঠন,

তাহাদের মুখশ্রী আমার কাছে ভারি আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হইত ; সকলেই যেন নিখিল-সমুদ্রের উপর দিয়া তরঙ্গলীলার মতো বহিয়া চলিয়াছে। শিশুকাল হইতে কেবল চোখ দিয়া দেখাই অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল, আজ যেন একেবারে সমস্ত চৈতন্য দিয়া দেখিতে আরম্ভ করিলাম। রাস্তা দিয়া এক যুবক যখন আরেক যুবকের কাঁধে হাত দিয়া হাসিতে হাসিতে অবলীলাক্রমে চলিয়া যাইত সেটাকে আমি সামান্য ঘটনা বলিয়া মনে করিতে পারিতাম না—বিশ্বজগতে অতলস্পর্শ গভীরতার মধ্যে যে অফুরান রসের উৎস চারিদিকে হাসির ঝরণা ঝরাইতেছে সেইটাকে যেন দেখিতে পাইতাম।

সামান্য কিছু কাজ করিবার সময়ে মানুষের অঙ্গে প্রত্যঙ্গে যে গতিবৈচিত্র্য প্রকাশিত হয় তাহা আগে কখনো লক্ষ্য করিয়া দেখি নাই—এমন মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে সমস্ত মানবদেহের চলনের সঙ্গীত আমাকে মুগ্ধ করিল। এ সমস্তকে আমি স্বতন্ত্র করিয়া দেখিতাম না, একটা সমষ্টিকে দেখিতাম। এই মুহূর্ত্তেই পৃথিবীর সর্ব্বত্রই নানা লোকালয়ে, নানা কাজে নানা আবশ্যকে কোটি কোটি মানব চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে—সেই ধরণীব্যাপী সমগ্র মানবের দেহচাঞ্চল্যকে সুবৃহৎভাবে এক করিয়া দেখিয়া আমি একটি মহাসৌন্দর্য্যনৃত্যের আভাস পাইতাম। বন্ধুকে লইয়া বন্ধু হাসিতেছে, শিশুকে লইয়া মাতা পালন করিতেছে, একটা গোরু আর একটা গোরুর পাশে দাঁড়াইয়া তাহার গা চাটিতেছে, ইহাদের মধ্যে যে একটি অন্তহীন অপরিমেয়তা আছে তাহাই আমার মনকে বিস্ময়ের

আঘাতে যেন বেদনা দিতে লাগিল। এই সময়ে যে লিখিয়াছিলাম :—

হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি
জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি,—

ইহা কবিকল্পনার অত্যুক্তি নহে। বস্তুত যাহা অনুভব করিয়াছিলাম, তাহা প্রকাশ করিবার শক্তি আমার ছিল না।

কিছুকাল আমার এইরূপ আত্মহারা আনন্দের অবস্থা ছিল। এমন সময়ে জ্যোতিদাদারা স্থির করিলেন তাঁহারা দার্জ্জিলিঙে যাইবেন। আমি ভাবিলাম এ আমার হইল ভালো—সদরষ্ট্রীটের সহরে ভিড়ের মধ্যে যাহা দেখিলাম—হিমালয়ের উদার শৈলশিখরে তাহাই আরো ভালো করিয়া গভীর করিয়া দেখিতে পাইব। অন্তত এই দৃষ্টিতে হিমালয় আপনাকে কেমন করিয়া প্রকাশ করে তাহা জানা যাইবে।

কিন্তু সদরষ্ট্রীটের সেই তুচ্ছ বাড়িটারই জিত হইল। হিমালয়ের উপরে চড়িয়া যখন তাকাইলাম তখন হঠাৎ দেখি আর সেই দৃষ্টি নাই। বাহির হইতে আসল জিনিষ কিছু পাইব এইটে মনে করাই বোধ করি আমার অপরাধ হইয়াছিল। নগাধিরাজ যত বড়োই অভ্রভেদী হোন না তিনি কিছুই হাতে তুলিয়া দিতে পারেন না অথচ যিনি দেনে-ওয়ালা তিনি গলির মধ্যেই এক মুহূর্ত্তে বিশ্বসংসারকে দেখাইয়া দিতে পারেন।

আমি দেবদারুবনে ঘুরিলাম, ঝরনার ধারে বসিলাম, তাহার জলে স্নান করিলাম, কাঞ্চনশৃঙ্গার মেঘমুক্ত মহিমার

দিকে তাকাইয়া রহিলাম—কিন্তু যেখানে পাওয়া সুসাধ্য মনে করিয়াছিলাম সেইখানেই কিছু খুঁজিয়া পাইলাম না। পরিচয় পাইয়াছি কিন্তু আর দেখা পাই না। রত্ন দেখিতেছিলাম, হঠাৎ তাহা বন্ধ হইল এখন কৌটা দেখিতেছি। কিন্তু কৌটার উপরকার কারুকার্য্য যতই থাক্ তাহাকে আর কেবল শূন্য কৌটামাত্র বলিয়া ভ্রম করিবার আশঙ্কা রহিল না।

প্রভাত-সঙ্গীতের গান থামিয়া গেল শুধু তার দূর প্রতিধ্বনি স্বরূপ "প্রতিধ্বনি" নামে একটি কবিতা দার্জ্জিলিঙে লিখিয়াছিলাম। সেটা এমনি একটা অবোধ্য ব্যাপার হইয়াছিল যে একদা দুই বন্ধু বাজি রাখিয়া তাহার অর্থ নির্ণয় করিবার ভার লইয়াছিল। হতাশ হইয়া তাহাদের মধ্যে একজন আমার কাছ হইতে গোপনে অর্থ বুঝিয়া লইবার জন্য আসিয়াছিল। আমার সহায়তায় সে বেচারা যে বাজি জিতিতে পারিয়াছিল এমন আমার বোধ হয় না। ইহার মধ্যে সুখের বিষয় এই যে, দুজনের কাহাকেও হারের টাকা দিতে হইল না। হায়রে, যে দিন পদ্মের উপরে এবং বর্ষার সরোবরের উপরে কবিতা লিখিয়াছিলাম সেই অত্যন্ত পরিস্কার রচনার দিন কতদূরে চলিয়া গিয়াছে!

কিছু একটা বুঝাইবার জন্য কেহ তো কবিতা লেখে না। হৃদয়ের অনুভূতি কবিতার ভিতর দিয়া আকার ধারণ করিতে চেষ্টা করে। এইজন্য কবিতা শুনিয়া কেহ যখন বলে বুঝিলাম না তখন বিষম মুস্কিলে পড়িতে হয়। কেহ যদি ফুলের গন্ধ শুঁকিয়া

বলে কিছু বুঝিলাম না তাহাকে এই কথা বলিতে হয় ইহাতে বুঝিবার কিছু নাই, এ যে কেবল গন্ধ। উত্তর শুনি, সে তো জানি, কিন্তু খামকা গন্ধই বা কেন, ইহার মানেটা কী? হয়, ইহার জবাব বন্ধ করিতে হয়, নয়, খুব একটু ঘোরালো করিয়া বলিতে হয় প্রকৃতির ভিতরকার আনন্দ এমনি করিয়া গন্ধ হইয়া প্রকাশ পায়। কিন্তু মুস্কিল এই যে, মানুষকে যে-কথা দিয়া কবিতা লিখিতে হয় সে কথার যে মানে আছে। এই জন্যই তো ছন্দবন্ধ প্রভৃতি নানা উপায়ে কথা কহিবার স্বাভাবিক পদ্ধতি উলট্‌-পালট্‌ করিয়া দিয়া কবিকে অনেক কৌশল করিতে হইয়াছে, যাহাতে কথার ভাবটা বড়ো হইয়া কথার অর্থটাকে যথাসম্ভব ঢাকিয়া ফেলিতে পারে। এই ভাবটা তত্ত্বও নহে বিজ্ঞানও নহে, কোনো প্রকারের কাজের জিনিষ নহে, তাহা চোখের জল ও মুখের হাসির মতো অন্তরের চেহারা মাত্র। তাহার সঙ্গে—তত্ত্বজ্ঞান বিজ্ঞান কিম্বা আর কোনো বুদ্ধিসাধ্য জিনিষ মিলাইয়া দিতে পার তো দাও কিন্তু সেটা গৌণ। খেয়া নৌকায় পার হইবার সময় যদি মাছ ধরিয়া লইতে পার তো সে তোমার বাহাদুরি কিন্তু তাই বলিয়া খেয়ানৌকা জেলে ডিঙি নয়—খেয়া নৌকায় মাছ রপ্তানি হইতেছে না বলিয়া পাটুনিকে গালি দিলে অবিচার করা হয়।

প্রতিধ্বনি কবিতাটা আমার অনেক দিনের লেখা—সেটা কাহারো চোখে পড়ে না সুতরাং তাহার জন্য কাহারো কাছে আজ আমাকে জবাবদিহি করিতে হয় না। সেটা ভালোমন্দ

যেমনি হোক একথা জোর করিয়া বলিতে পারি ইচ্ছা করিয়া পাঠকদের ধাঁধা লাগাইবার জন্য সে কবিতাটা লেখা হয় নাই এবং কোনো গভীর তত্ত্বকথা ফাঁকি দিয়া কবিতায় বলিয়া লইবার প্রয়াসও তাহা নহে।

আসল কথা হৃদয়ের মধ্যে যে একটা ব্যাকুলতা জন্মিয়াছিল সে নিজেকে প্রকাশ করিতে চাহিয়াছে। যাহার জন্য ব্যাকুলতা তাহার আর কোনো নাম খুঁজিয়া না পাইয়া তাহাকে বলিয়াছে প্রতিধ্বনি এবং কহিয়াছে—

ওগো প্রতিধ্বনি
বুঝি আমি তোরে ভালোবাসি
বুঝি আর কারেও বাসি না।

বিশ্বের কেন্দ্রস্থলে সে কোন্ গানের ধ্বনি জাগিতেছে, প্রিয়মুখ হইতে বিশ্বের সমুদয় সুন্দর সামগ্রী হইতে প্রতিঘাত পাইয়া যাহার প্রতিধ্বনি আমাদের হৃদয়ের ভিতরে গিয়া প্রবেশ করিতেছে। কোনো বস্তুকে নয় কিন্তু সেই প্রতিধ্বনিকেই বুঝি আমরা ভালোবাসি কেন না ইহা যে দেখা গেছে একদিন যাহার দিকে তাকাই নাই আর একদিন সেই একই বস্তু আমাদের সমস্ত মন ভুলাইয়াছে।

একদিন জগৎকে কেবল বাহিরের দৃষ্টিতে দেখিয়া আসিয়াছি এই জন্য তাহার একটা সমগ্র আনন্দরূপ দেখিতে পাই নাই। একদিন হঠাৎ আমার অন্তরের যেন একটা গভীর কেন্দ্রস্থল হইতে একটা আলোকরশ্মি মুক্ত হইয়া সমস্ত বিশ্বের উপর যখন ছড়াইয়া পড়িল তখন সেই জগৎকে আর কেবল

ঘটনাপুঞ্জ বস্তুপুঞ্জ করিয়া দেখা গেল না, তাহাকে আগাগোড়া পরিপূর্ণ করিয়া দেখিলাম। ইহা হইতেই একটা অনুভূতি আমার মনের মধ্যে আসিয়াছিল যে অন্তরের কোন্ একটি গভীরতম গুহা হইতে সুরের ধারা আসিয়া দেশে কালে ছড়াইয়া পড়িতেছে—এবং প্রতিধ্বনিরূপে সমস্ত দেশকাল হইতে প্রত্যাহত হইয়া সেইখানেই আনন্দস্রোতে ফিরিয়া যাইতেছে। সেই অসীমের দিকে ফেরার মুখের প্রতিধ্বনিই আমাদের মনকে সৌন্দর্য্যে ব্যাকুল করে। গুণী যখন পূর্ণ-হৃদয়ের উৎস হইতে গান ছাড়িয়া দেন তখন সেই এক আনন্দ; আবার যখন সেই গানের ধারা তাঁহারই হৃদয়ে ফিরিয়া যায় তখন সে এক দ্বিগুণতর আনন্দ। বিশ্বকবির কাব্যগান যখন আনন্দময় হইয়া তাঁহারই চিত্তে ফিরিয়া যাইতেছে তখন সেই-টেকে আমাদের চেতনার উপর দিয়া বহিয়া যাইতে দিলে আমরা জগতের পরম পরিণামটিকে যেন অনির্ব্বচনীয়রূপে জানিতে পারি। যেখানে আমাদের সেই উপলব্ধি সেইখানে আমাদের প্রীতি; সেখানে আমাদেরও মন সেই অসীমের অভিমুখীন আনন্দস্রোতের টানে উতলা হইয়া সেই দিকে আপনাকে ছাড়িয়া দিতে চায়। সৌন্দর্য্যের ব্যাকুলতার ইহাই তাৎপর্য্য। যে-সুর অসীম হইতে বাহির হইয়া সীমার দিকে আসিতেছে তাহাই সত্য, তাহাই মঙ্গল, তাহা নিয়মে বাঁধা, আকারে নির্দ্দিষ্ট; তাহারই যে প্রতিধ্বনি সীমা হইতে অসীমের দিকে পুনশ্চ ফিরিয়া যাইতেছে তাহাই সৌন্দর্য্য তাহাই আনন্দ। তাহাকে ধরাছোঁয়ার মধ্যে আনা

অসম্ভব, তাই সে এমন করিয়া ঘরছাড়া করিয়া দেয়। "প্রতিধ্বনি" কবিতার মধ্যে আমার মনের এই অনুভূতিই রূপকে ও গানে ব্যক্ত হইবার চেষ্টা করিয়াছে। সে চেষ্টার ফলটি স্পষ্ট হইয়া উঠিবে এমন আশা করা যায় না, কারণ চেষ্টাটাই আপনাকে আপনি স্পষ্ট করিয়া জানিত না।

আরো কিছু অধিক বয়সে প্রভাত-সঙ্গীত সম্বন্ধে একটা পত্র লিখিয়াছিলাম, সেটার এক অংশ এখানে উদ্ধৃত করি।—

'জগতে কেহ নাই সবাই প্রাণে মোর'—ও একটা বয়সের বিশেষ অবস্থা। যখন হৃদয়টা সর্ব্বপ্রথম জাগ্রত হ'য়ে দুই বাহু বাড়িয়ে দেয়,তখন মনে করে সে যেন সমস্ত জগৎটাকে চায় যেমন নবোদ্গত-দন্ত শিশু মনে করেন সমস্ত বিশ্বসংসার তিনি গালে পূরে দিতে পারেন।

"ক্রমে ক্রমে বুঝ্‌তে পারা যায় মনটা যথার্থ কী চায় এবং কী চায় না। তখন সেই পরিব্যাপ্ত হৃদয়বাষ্প সঙ্কীর্ণ সীমা অবলম্বন ক'রে জ্বল্‌তে এবং জ্বালাতে আরম্ভ করে। একেবারে সমস্ত জগৎটা দাবি ক'রে বস্‌লে কিছুই পাওয়া যায় না, অবশেষে একটা কোনোকিছুর মধ্যে সমস্ত প্রাণমন দিয়ে নিবিষ্ট হ'তে পার্‌লে তবেই অসীমের মধ্যে প্রবেশের সিংহদ্বারটি পাওয়া যায়। প্রভাতসঙ্গীত আমার অন্তরপ্রকৃতির প্রথম বহির্মুখ উচ্ছ্বাস, সেই জন্যে ওটাতে আর কিছুমাত্র বাচ বিচার নেই।"—

প্রথম উচ্ছ্বাসের একটা সাধারণ ভাবের ব্যাপ্ত আনন্দ ক্রমে আমাদিগকে বিশেষ পরিচয়ের দিকে ঠেলিয়া লইয়া

যায়—বিলের জল ক্রমে যেন নদী হইয়া বাহির হইতে চায়—তখন পূর্ব্বরাগ অনুরাগে পরিণত হয়। বস্তুত অনুরাগ পূর্ব্বং-রাগের অপেক্ষা এক হিসাবে সঙ্কীর্ণ। তাহা একগ্রাসে সমস্তটা না লইয়া ক্রমে ক্রমে খণ্ডে খণ্ডে চাখিয়া লইতে থাকে। প্রেম তখন একাগ্র হইয়া অংশের মধ্যেই সমগ্রকে, সীমার মধ্যেই অসীমকে উপভোগ করিতে পারে। তখন তাহার চিত্ত প্রত্যক্ষ বিশেষের মধ্য দিয়াই অপ্রত্যক্ষ অশেষের মধ্যে আপনাকে প্রসারিত করিয়া দেয়। তখন সে যাহা পায় তাহা কেবলং নিজের মনের একটা অনির্দ্দিষ্ট ভাবানন্দ নহে—বাহিরের সহিত প্রত্যক্ষের সহিত একান্ত মিলিত হইয়া তাহার হৃদয়ের ভাবটি সর্ব্বাঙ্গীন সত্য হইয়া উঠে।

মোহিতবাবুর গ্রন্থাবলীতে প্রভাত-সঙ্গীতের কবিতাগুলিকে "নিষ্ক্রমণ" নাম দেওয়া হইয়াছে। কারণ, তাহা হৃদয়ারণ্য হইতে বাহিরের বিশ্বে প্রথম আগমনের বার্ত্তা। তার পরে সুখদুঃখআলোকঅন্ধকারে সংসারপথের যাত্রী এই হৃদয়টার সঙ্গে একে একে খণ্ডে খণ্ডে নানা সুরে ও নানা ছন্দে বিচিত্র-ভাবে বিশ্বের মিলন ঘটিয়াছে—অবশেষে এই বহুবিচিত্রের নানা বাঁধানো ঘাটের ভিতর দিয়া পরিচয়ের ধারা বহিয়া চলিতে চলিতে নিশ্চয়ই আর একদিন আবার একবার অসীম ব্যাপ্তির মধ্যে গিয়া পৌঁছিবে, কিন্তু সেই ব্যাপ্তি অনির্দ্দিষ্ট আভাসের ব্যাপ্তি নহে তাহা পরিপূর্ণ সত্যের পরিব্যাপ্তি।

আমার শিশুকালেই বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে আমার খুব একটি সহজ এবং নিবিড় যোগ ছিল। বাড়ির ভিতরের নারিকেল

গাছগুলি প্রত্যেকে আমার কাছে অত্যন্ত সত্য হইয়া দেখা দিত। নর্ম্মাল স্কুল হইতে চারিটার পর ফিরিয়া গাড়ি হইতে নামিয়াই আমাদের বাড়ির ছাদটার পিছনে দেখিলাম ঘন সজল নীলমেঘ রাশীকৃত হইয়া আছে—মনটা তখনি এক নিমেষে নিবিড় আনন্দের মধ্যে আবৃত হইয়া গেল—সেই মুহূর্ত্তের কথা আজিও আমি ভুলিতে পারি নাই। সকালে জাগিবামাত্রই সমস্ত পৃথিবীর জীবনোল্লাসে আমার মনকে তাহার খেলার সঙ্গীর মতো ডাকিয়া বাহির করিত, মধ্যাহ্নে সমস্ত আকাশ এবং প্রহর যেন সুতীব্র হইয়া উঠিয়া আপন গভীরতার মধ্যে আমাকে বিরাগী করিয়া দিত এবং রাত্রির অন্ধকার যে মায়াপথের গোপন দরজাটা খুলিয়া দিত তাহা সম্ভব-অসম্ভবের সীমানা ছাড়াইয়া রূপকথার অপরূপ রাজ্যে সাত সমুদ্র তেরোনদী পার করিয়া লইয়া যাইত। তাহার পর একদিন যখন যৌবনের প্রথম উন্মেষে হৃদয় আপনার খোরাকের দাবি করিতে লাগিল তখন বাহিরের সঙ্গে জীবনের সহজ যোগটি বাধাগ্রস্ত হইয়া গেল। তখন ব্যথিত হৃদয়টাকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া নিজের মধ্যেই নিজের আবর্ত্তন সুরু হইল—চেতনা তখন আপনার ভিতরের দিকেই আবদ্ধ হইয়া রহিল। এইরূপে রুগ্ন হৃদয়টার আবদারে অন্তরের সঙ্গে বাহিরের যে সামঞ্জস্যটা ভাঙিয়া গেল, নিজের চিরদিনের যে সহজ অধিকারটি হারাইলাম সন্ধ্যা-সঙ্গীতে তাহারই বেদনা ব্যক্ত হইতে চাহিয়াছে। অবশেষে একদিন সেই রুদ্ধদ্বার জানিনা কোন ধাক্কায় হঠাৎ ভাঙিয়া গেল, তখন, যাহাকে হারাইয়া-

ছিলাম, তাহাকে পাইলাম। শুধু পাইলাম তাহা নহে, বিচ্ছেদের ব্যবধানের ভিতর দিয়া তাহার পূর্ণতার পরিচয় পাইলাম। সহজকে দুরূহ করিয়া তুলিয়া যখন পাওয়া যায় তখনি পাওয়া সার্থক হয়। এইজন্য আমার শিশুকালের বিশ্বকে প্রভাত-সঙ্গীতে যখন আবার পাইলাম তখন তাহাকে অনেক বেশি পাওয়া গেল। এমনি করিয়া প্রকৃতির সঙ্গে সহজ মিলন, বিচ্ছেদ ও পুনর্ম্মিলনে জীবনের প্রথম অধ্যায়ের একটা পালা শেষ হইয়া গেল। শেষ হইয়া গেল বলিলে মিথ্যা বলা হয়। এই পালাটাই আবার আরো একটু বিচিত্র হইয়া সুরু হইয়া আবার আরো একটা দুরূহতর সমস্যার ভিতর দিয়া বৃহত্তর পরিণামে পৌঁছিতে চলিল। বিশেষ মানুষ জীবনে বিশেষ একটা পালাই সম্পূর্ণ করিতে আসিয়াছে —পর্ব্বে পর্ব্বে তাহার চক্রটা বৃহত্তর পরিধিকে অবলম্বন করিয়া বাড়িতে থাকে—প্রত্যেক পাককে হঠাৎ পৃথক বলিয়া ভ্রম হয় কিন্তু খুঁজিয়া দেখিলে দেখা যায় কেন্দ্রটা একই।

যখন সন্ধ্যা-সঙ্গীত লিখিতেছিলাম তখন খণ্ড খণ্ড গদ্য "বিবিধ প্রসঙ্গ" নামে বাহির হইতেছিল। আর প্রভাত-সঙ্গীত যখন লিখিতেছিলাম কিম্বা তাহার কিছু পর হইতে ঐরূপ গদ্য লেখাগুলি আলোচনা নামক গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়া ছাপা হইয়াছিল। এই দুই গদ্যগ্রন্থে যে প্রভেদ ঘটিয়াছে তাহা পড়িয়া দেখিলেই লেখকের চিত্তের গতি নির্ণয় করা কঠিন হয় না।

— ———

রাজেন্দ্রলাল মিত্র

এই সময়ে, বাংলার সাহিত্যিকগণকে একত্র করিয়া একটি পরিষৎ স্থাপন করিবার কল্পনা জ্যোতিদাদার মনে উদিত হইয়াছিল। বাংলার পরিভাষা বাঁধিয়া দেওয়া ও সাধারণতঃ সর্ব্বপ্রকার উপায়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পুষ্টিসাধন এই সভার উদ্দেশ্য ছিল। বর্ত্তমান সাহিত্যপরিষৎ যে উদ্দেশ্য লইয়া আবির্ভূত হইয়াছে তাহার সঙ্গে সেই সঙ্কল্পিত সভার প্রায় কোনো অনৈক্য ছিল না।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় উৎসাহের সহিত এই প্রস্তাবটি গ্রহণ করিলেন। তাঁহাকেই এই সভার সভাপতি করা হইয়াছিল। যখন বিদ্যাসাগর মহাশয়কে এই সভায় আহ্বান করিবার জন্য গেলাম, তখন সভার উদ্দেশ্য ও সভ্যদের নাম শুনিয়া তিনি বলিলেন—আমি পরামর্শ দিতেছি আমাদের মতো লোককে পরিত্যাগ কর—"হোমরা-চোমরা"দের লইয়া কোনো কাজ হইবে না, কাহারো সঙ্গে কাহারো মতে মিলিবে না। এই বলিয়া তিনি এ সভায় যোগ দিতে রাজি হইলেন না। বঙ্কিমবাবু সভ্য হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে সভার কাজে যে পাওয়া গিয়াছিল তাহা বলিতে পারি না।

বলিতে গেলে যে কয়দিন সভা বাঁচিয়া ছিল, সমস্ত কাজ একা রাজেন্দ্রলাল মিত্রই করিতেন। ভৌগোলিক পরিভাষা-

নির্ণয়েই আমরা প্রথম হস্তক্ষেপ করিয়াছিলাম। পরিভাষার প্রথম খসড়া সমস্তটা রাজেন্দ্রলালই ঠিক করিয়া দিয়াছিলেন। সেটি ছাপাইয়া অন্যান্য সভ্যদের আলোচনার জন্য সকলের হাতে বিতরণ করা হইয়াছিল। পৃথিবীর সমস্ত দেশের নামগুলি সেই সেই দেশে প্রচলিত উচ্চারণ অনুসারে লিপিবদ্ধ করিবার সঙ্কল্পও আমাদের ছিল।

বিদ্যাসাগরের কথা ফলিল—হোমরা-চোমরাদের একত্র করিয়া কোনো কাজে লাগানো সম্ভবপর হইল না। সভা একটুখানি অঙ্কুরিত হইয়াই শুকাইয়া গেল।

কিন্তু রাজেন্দ্রলাল মিত্র সব্যসাচী ছিলেন। তিনি একাই একটি সভা! এই উপলক্ষ্যে তাঁহার সহিত পরিচিত হইয়া আমি ধন্য হইয়াছিলাম।

এপর্য্যন্ত বাংলা দেশে অনেক বড়ো বড়ো সাহিত্যিকের সঙ্গে আমার আলাপ হইয়াছে, কিন্তু রাজেন্দ্রলালের স্মৃতি আমার মনে যেমন উজ্জ্বল হইয়া বিরাজ করিতেছে এমন আর কাহারো নহে।

মাণিকতলার বাগানে যেখানে কোর্ট অফ্ ওয়ার্ডস্ ছিল সেখানে আমি যখন তখন তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে যাইতাম। আমি সকালে যাইতাম—দেখিতাম তিনি লেখাপড়ার কাজে নিযুক্ত আছেন। অল্পবয়সের অবিবেচনা বশতই অসঙ্কোচে আমি তাঁহার কাজের ব্যাঘাত করিতাম। কিন্তু সে জন্য তাঁহাকে মুহূর্ত্তকালও অপ্রসন্ন দেখি নাই। আমাকে দেখিবা-মাত্র তিনি কাজ রাখিয়া দিয়া কথা আরম্ভ করিয়া দিতেন

সকলেই জানেন তিনি কানে কম শুনিতেন। এই জন্য পারৎপক্ষে তিনি আমাকে প্রশ্ন করিবার অবকাশ দিতেন না। কোনো একটা বড়ো প্রসঙ্গ তুলিয়া তিনি নিজেই কথা কহিয়া যাইতেন। তাঁহার মুখে সেই কথা শুনিবার জন্যই আমি তাঁহার কাছে যাইতাম। আর কাহারো সঙ্গে বাক্যালাপে এত নূতন নূতন বিষয়ে এতো বেশি করিয়া ভাবিবার জিনিষ পাই নাই। আমি মুগ্ধ হইয়া তাঁহার আলাপ শুনিতাম। বোধ করি তখনকার কালের পাঠ্যপুস্তক নির্ব্বাচনসমিতির তিনি একজন প্রধান সভ্য ছিলেন। তাঁহার কাছে যেসব বই পাঠানো হইত তিনি সেগুলি পেন্সিলের দাগ দিয়া নোট করিয়া পড়িতেন। এক একদিন সেইরূপ কোনো একটা বই উপলক্ষ্য করিয়া তিনি বাংলা-ভাষারীতি ও ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে কথা কহিতেন, তাহাতে আমি বিস্তর উপকার পাইতাম। এমন অল্প বিষয় ছিল যে-সম্বন্ধে তিনি ভালো করিয়া আলোচনা না করিয়াছিলেন এবং যাহা-কিছু তাঁহার আলোচনার বিষয় ছিল তাহাই তিনি প্রাঞ্জল করিয়া বিবৃত করিতে পারিতেন। তখন যে বাংলা সাহিত্যসভার প্রতিষ্ঠাচেষ্টা হইয়াছিল সেই সভায় আর কোনো সভ্যের কিছুমাত্র মুখাপেক্ষা না করিয়া যদি একমাত্র মিত্র মহাশয়কে দিয়া কাজ করাইয়া লওয়া যাইত তবে বর্ত্তমান সাহিত্যপরিষদের অনেক কাজ কেবল সেই একজন ব্যক্তিদ্বারা অনেকদূর অগ্রসর হইত সন্দেহ নাই।

কেবল তিনি মননশীল লেখক ছিলেন ইহাই তাঁহার প্রধান

গৌরব নহে। তাঁহার মূর্ত্তিতেই তাঁহার মনুষ্যত্ব যেন প্রত্যক্ষ হইত। আমার মতো অর্ব্বাচীনকেও তিনি কিছুমাত্র অবজ্ঞা না করিয়া ভারি একটি দাক্ষিণ্যের সহিত আমার সঙ্গেও বড়ো বড়ো বিষয়ে আলাপ করিতেন—অথচ তেজস্বিতায় তখনকার দিনে তাঁহার সমকক্ষ কেহই ছিল না। এমন কি, আমি তাঁহার কাছ হইতে "যমের কুকুর" নামে একটি প্রবন্ধ আদায় করিয়া ভারতীতে ছাপাইতে পারিয়াছিলাম; তখনকার কালের আর কোনো যশস্বী লেখকের প্রতি এমন করিয়া উৎপাত করিতে সাহসও করি নাই এবং এতটা প্রশ্রয় পাইবার আশাও করিতে পারিতাম না। অথচ যোদ্ধৃবেশে তাঁহার রুদ্রমূর্ত্তি বিপৎজনক ছিল। ম্যুনিসিপাল সভায় সেনেটসভায় তাঁহার প্রতিপক্ষ সকলেই তাঁহাকে ভয় করিয়া চলিত। তখনকার দিনে কৃষ্ণদাস পাল ছিলেন কৌশলী, আর রাজেন্দ্রলাল ছিলেন বীর্য্যবান। বড়ো বড়ো মল্লের সঙ্গেও দ্বন্দ্বযুদ্ধে কখনো তিনি পরাঙ্মুখ হন নাই ও কখনো তিনি পরাভূত হইতে জানিতেন না। এসিয়াটিক সোসাইটি সভার গ্রন্থপ্রকাশ ও পুরাতত্ত্ব আলোচনা ব্যাপারে অনেক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতকে তিনি কাজে খাটাইতেন। আমার মনে আছে এই উপলক্ষ্যে তখনকার কালের মহত্ত্ববিদ্বেষী ঈর্ষাপরায়ণ অনেকেই বলিত যে, পণ্ডিতেরাও কাজ করে ও তাহার যশের ফল মিত্র মহাশয় ফাঁকি দিয়া ভোগ করিয়া থাকেন। আজিও এরূপ দৃষ্টান্ত কখনো কখনো দেখা যায় যে, যে-ব্যক্তি যন্ত্রমাত্র ক্রমশ তাহার মনে হইতে থাকে আমিই

বুঝি কৃতী, .আর যন্ত্রটি বুঝি অনাবশ্যক শোভামাত্র। কলম বেচারার যদি চেতনা থাকিত তবে লিখিতে লিখিতে নিশ্চয় কোন্ একদিন সে মনে করিয়া বসিত—লেখার সমস্ত কাজটাই করি আমি, অথচ আমার মুখেই কেবল কালী পড়ে আর লেখকের খ্যাতিই উজ্জ্বল হইয়া উঠে।

বাংলা দেশের এই একজন অসামান্য মনস্বীপুরুষ মৃত্যুর পরে দেশের লোকের নিকট হইতে বিশেষ কোনো সম্মান লাভ করেন নাই। ইহার একটা কারণ ইঁহার মৃত্যুর অনতি-কালের মধ্যে বিদ্যাসাগরের মৃত্যু ঘটে—সেই শোকেই রাজেন্দ্রলালের বিয়োগ-বেদনা দেশের চিত্ত হইতে বিলুপ্ত হইয়াছিল। তাহার আর একটা কারণ, বাংলা ভাষায় তাঁহার কীর্ত্তির পরিমাণ তেমন অধিক ছিল না, এই জন্য দেশের সর্ব্বসাধারণের হৃদয়ে তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার সুযোগ পান নাই।

কারোয়ার

ইহার পরে কিছুদিনের জন্য আমারা সদর ষ্ট্রীটের দল কারোয়ারে সমুদ্রতীরে আশ্রয় লইয়াছিলাম।

কারোয়ার বোম্বাই প্রেসিডেন্সির দক্ষিণ অংশে স্থিত কর্ণাটের প্রধান নগর। তাহা এলালতা ও চন্দনতরুর জন্ম-

ভূমি মলয়াচলের দেশ। মেজদাদা তখন সেখানে জজ ছিলেন।

এই ক্ষুদ্র শৈলমালাবেষ্টিত সমুদ্রের বন্দরটি এমন নিভৃত এমন প্রচ্ছন্ন যে, নগর এখানে নাগরীমূর্ত্তি প্রকাশ করিতে পারে নাই। অর্দ্ধচন্দ্রাকার বেলাভূমি অকূল নীলাম্বুরাশির অভিমুখে দুই বাহু প্রসারিত করিয়া দিয়াছে—সে যেন অনন্তকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিবার একটি মূর্ত্তিমতী ব্যাকুলতা। প্রশস্ত বালুতটের প্রান্তে বড়ো বড়ো ঝাউ গাছের অরণ্য ; এই অরণ্যের এক সীমায় কালানদী নামে এক ক্ষুদ্র নদী তাহার দুই গিরিবন্ধুর উপকূলরেখার মাঝখান দিয়া সমুদ্রে আসিয়া মিশিয়াছে। মনে আছে একদিন শুক্লপক্ষের গোধূলিতে একটি ছোটো নৌকায় করিয়া আমরা এই কালানদী বাহিয়া উজাইয়া চলিয়াছিলাম। এক জায়গায় তীরে নামিয়া শিবাজীর একটি প্রাচীন গিরিদুর্গ দেখিয়া আবার নৌকা ভাসাইয়া দিলাম। নিস্তব্ধ বন পাহাড় এবং এই নির্জ্জন সঙ্কীর্ণ নদীর স্রোতটির উপর জ্যোৎস্নারাত্রি ধ্যানাসনে বসিয়া চন্দ্রালোকের জাদুমন্ত্র পড়িয়া দিল। আমরা তীরে নামিয়া একজন চাষার কুটীরে বেড়া-দেওয়া পরিষ্কার নিকানো আঙিনায় গিয়া উঠিলাম। প্রাচীরের ঢালু ছায়াটির উপর দিয়া যেখানে চাঁদের আলো আড় হইয়া আসিয়া পড়িয়াছে, সেইখানে তাহাদের দাওয়াটির সামনে আসন পাতিয়া আহার করিয়া লইলাম। ফিরিবার সময় ভাঁটিতে নৌকা ছাড়িয়া দেওয়া গেল।

সমুদ্রের মোহানার কাছে আসিয়া পৌঁছিতে অনেক বিলম্ব হইল। সেইখানে নৌকা হইতে নামিয়া বালুতটের উপর দিয়া হাঁটিয়া বাড়ির দিকে চলিলাম। তখন নিশীথরাত্রি, সমুদ্র নিস্তরঙ্গ, ঝাউবনের নিয়তমর্ম্মরিত চাঞ্চল্য একেবারে থামিয়া গিয়াছে, সুদূরবিস্তৃত বালুকারাশির প্রান্তে তরুশ্রেণীর ছায়াপুঞ্জ নিস্পন্দ, দিক্‌চক্রবালে নীলাভ শৈলমালা পাণ্ডুরনীল আকাশতলে নিমগ্ন। এই উদার শুভ্রতা এবং নিবিড় স্তব্ধতার মধ্য দিয়া আমরা কয়েকটি মানুষ কালো ছায়া ফেলিয়া নীরবে চলিতে লাগিলাম। বাড়িতে যখন পৌঁছিলাম তখন ঘুমের চেয়েও কোন্ গভীরতার মধ্যে আমার ঘুম ডুবিয়া গেল। সেই রাত্রেই যে কবিতাটি লিখিয়াছিলাম তাহা সুদূর প্রবাসের সেই সমুদ্রতীরের একটি বিগত রজনীর সহিত বিজড়িত। সেই স্মৃতির সহিত তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া পাঠকদের কেমন লাগিবে সন্দেহ করিয়া মোহিতবাবুর প্রকাশিত গ্রন্থাবলীতে ইহা ছাপানো হয় নাই। কিন্তু আশা করি জীবনস্মৃতির মধ্যে তাহাকে এইখানে একটি আসন দিলে তাহার পক্ষে অনধিকার প্রবেশ হইবে না।

যাই যাই ডুবে যাই, আরো আরো ডুবে যাই
বিহ্বল অবশ অচেতন।
কোন্ খানে কোন দূরে, নিশীথের কোন্ মাঝে
কোথা হ'য়ে যাই নিমগন।
হে ধরণী, পদতলে দিয়োনা, দিয়োনা বাধা,
দাও মোরে দাও ছেড়ে দাও!

অনন্ত দিবসনিশি এমনি ডুবিতে থাকি
তোমরা সুদূরে চ'লে যাও !
তোমরা চাহিয়া থাক, জ্যোৎস্নাঅমৃতপানে
বিহ্বল বিলীন তারাগুলি ;
অপার দিগন্ত ওগো থাক এ মাথার পরে
দুই দিকে দুই পাখা তুলি !
গান নাই, কথা নাই, শব্দ নাই, স্পর্শ নাই,
নাই ঘুম নাই জাগরণ,—
কোথা কিছু নাহি জাগে সর্ব্বাঙ্গে জ্যোৎস্না লাগে
সর্ব্বাঙ্গ পুলকে অচেতন।
অসীমে সুনীলে শূন্যে বিশ্ব কোথা ভেসে গেছে,
তারে যেন দেখা নাহি যায় ;
নিশীথের মাঝে শুধু মহান্ একাকী আমি
অতলেতে ডুবিরে কোথায় !
গাও বিশ্ব গাও তুমি সুদূর অদৃশ্য হ'তে
গাও তব নাবিকের গান,
শতলক্ষ যাত্রী ল'য়ে কোথায় যেতেছ তুমি
তাই ভাবি মুদিয়া নয়ান।
অনন্ত রজনী শুধু ডুবে যাই নিবে যাই
ম'রে যাই অসীম মধুরে—
বিন্দু হতে বিন্দু হ'য়ে মিলায়ে মিশায়ে যাই
অনন্তের সুদূর সুদূরে।

একথা এখানে বলা আবশ্যক কোনো সদ্য আবেগে মন

যখন কানায় কানায় ভরিয়া উঠে তখন যে লেখা ভালো হইতে হইবে এমন কথা নাই। তখন গদগদ বাক্যের পালা। ভাবের সঙ্গে ভাবুকের সম্পূর্ণ ব্যবধান ঘটিলেও যেমন চলে না তেমনি একেবারে অব্যবধান ঘটিলেও কাব্যরচনার পক্ষে তাহা অনুকূল হয় না। স্মরণের তুলিতেই কবিত্বের রঙ ফোটে ভালো। প্রত্যক্ষের একটা জবরদস্তি আছে—কিছু পরিমাণে তাহার শাসন কাটাইতে না পারিলে কল্পনা আপনার জায়গাটি পায় না। শুধু কবিত্বে নয় সকলপ্রকার কারুকলাতেও কারুকরের চিত্তের একটি নির্লিপ্ততা থাকা চাই—মানুষের অন্তরের মধ্যে যে সৃষ্টিকর্ত্তা আছে, কর্ত্তৃত্ব তাহারি হাতে না থাকিলে চলে না। রচনার বিষয়টাই যদি তাহাকে ছাপাইয়া কর্ত্তৃত্ব করিতে যায় তবে তাহা প্রতিবিম্ব হয় প্রতিমূর্ত্তি হয় না।

প্রকৃতির প্রতিশোধ

এই কারোয়ারে "প্রকৃতির প্রতিশোধ" নামক নাট্যকাব্যটি লিখিয়াছিলাম। কাব্যের নায়ক সন্ন্যাসী সমস্ত স্নেহবন্ধন মায়াবন্ধন ছিন্ন করিয়া প্রকৃতির উপরে জয়ী হইয়া একান্ত বিশুদ্ধভাবে অনন্তকে উপলব্ধি করিতে চাহিয়াছিল। অনন্ত যেন সব কিছুর বাহিরে। অবশেষে একটি বালিকা

তাহাকে স্নেহপাশে বদ্ধ করিয়া অনন্তের ধ্যান হইতে সংসারের মধ্যে ফিরাইয়া আনে। যখন ফিরিয়া আসিল তখন সন্ন্যাসী ইহাই দেখিল—ক্ষুদ্রকে লইয়াই বৃহৎ, সীমাকে লইয়াই অসীম, প্রেমকে লইয়াই মুক্তি। প্রেমের আলো যখনি পাই তখনি যেখানে চোখ মেলি সেখানেই দেখি সীমার মধ্যেও সীমা নাই।

প্রকৃতির সৌন্দর্য্য যে কেবলমাত্র আমারই মনের মরীচিকা নহে তাহার মধ্যে যে অসীমের আনন্দই প্রকাশ পাইতেছে এবং সেইজন্যই যে এই সৌন্দর্য্যের কাছে আমরা আপনাকে ভুলিয়া যাই এই কথাটা নিশ্চয় করিয়া বুঝাইবার জায়গা ছিল বটে সেই কারোয়ারের সমুদ্রবেলা। বাহিরের প্রকৃতিতে যেখানে নিয়মের ইন্দ্রজালে অসীম আপনাকে প্রকাশ করিতেছেন সেখানে সেই নিয়মের বাঁধাবাঁধির মধ্যে আমরা অসীমকে না দেখিতে পারি, কিন্তু যেখানে সৌন্দর্য্য ও প্রীতির সম্পর্কে হৃদয় একেবারে অব্যবহিতভাবে ক্ষুদ্রের মধ্যেও সেই ভূমার স্পর্শ লাভ করে, সেখানে সেই প্রত্যক্ষ-বোধের কোনো কাছে তর্ক খাটিবে কী করিয়া? এই হৃদয়ের পথ দিয়াই প্রকৃতি সন্ন্যাসীকে আপনার সীমা সিংহাসনের অধিরাজ অসীমের খাষদরবারে লইয়া গিয়াছিলেন। প্রকৃতির প্রতিশোধ-এর মধ্যে একদিকে যতসব পথের লোক যতসব গ্রামের নরনারী—তাহারা আপনাদের ঘরগড়া প্রাত্যহিক তুচ্ছতার মধ্যে অচেতনভাবে দিন কাটাইয়া দিতেছে; আর একদিকে সন্ন্যাসী, সে আপনার ঘরগড়া এক অসীমের মধ্যে

কোনোমতে আপনাকে ও সমস্ত কিছুকে বিলুপ্ত করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে! প্রেমের সেতুতে যখন এই দুই পক্ষের ভেদ ঘুচিল, গৃহীর সঙ্গে সন্ন্যাসীর যখন মিলন ঘটিল, তখনই সীমায় অসীমে মিলিত হইয়া সীমার মিথ্যা তুচ্ছতা ও অসীমের মিথ্যা শূন্যতা দূর হইয়া গেল। আমার নিজের প্রথম জীবনে আমি যেমন একদিন আমার অন্তরের একটা অনির্দ্দেশ্যতাময় অন্ধকার গুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া বাহিরের সহজ অধিকারটি হারাইয়া বসিয়াছিলাম, অবশেষে সেই বাহির হইতেই একটি মনোহর আলোক হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমাকে প্রকৃতির সঙ্গে পরিপূর্ণ করিয়া মিলাইয়া দিল—এই প্রকৃতির প্রতিশোধেও সেই ইতিহাসটিই একটু অন্য রকম করিয়া লিখিতে হইয়াছে। পরবর্ত্তী আমার সমস্ত কাব্যরচনার ইহাও একটা ভূমিকা। আমার তো মনে হয় আমার কাব্যরচনার এই একটিমাত্র পালা। সে পালার নাম দেওয়া যাইতে পারে সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলন সাধনের পালা। এই ভাবটাকেই আমার শেষ বয়সের একটি কবিতার ছত্রে প্রকাশ করিয়াছিলাম:—

"বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।"

তখনো "আলোচনা" নাম দিয়া যে ছোটো ছোটো গদ্য প্রবন্ধ বাহির করিয়াছিলাম তাহার গোড়ার দিকেই প্রকৃতির প্রতিশোধের ভিতরকার ভাবটির একটি তত্ত্বব্যাখ্যা লিখিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। সীমা যে সীমাবদ্ধ নহে, তাহা যে অতলস্পর্শ গভীরতাকে এক কণার মধ্যে সংহত করিয়া

দেখাইতেছে ইহা লইয়া আলোচনা করা হইয়াছে। তত্ত্ব-হিসাবে সে ব্যাখ্যার কোনো মূল্য আছে কিনা, এবং কাব্য-হিসাবে প্রকৃতির প্রতিশোধ-এর স্থান কী তাহা জানি না—কিন্তু আজ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে এই একটিমাত্র আইডিয়া অলক্ষ্যভাবে নানা বেশে আজ পর্য্যন্ত আমার সমস্ত রচনাকে অধিকার করিয়া আসিয়াছে।

কারোয়ার হইতে ফিরিবার সময় জাহাজে প্রকৃতির প্রতিশোধ-এর কয়েকটি গান লিখিয়াছিলাম। বড়ো একটি আনন্দের সঙ্গে প্রথম গানটি জাহাজের ডেকে বসিয়া সুর দিয়া গাহিতে গাহিতে রচনা করিয়াছিলাম—

হ্যাদেগো নন্দরাণী—
আমাদের শ্যামকে ছেড়ে দাও—
আমরা রাখাল বালক গোষ্ঠে যাব
আমাদের শ্যামকে দিয়ে যাও।

সকালের সূর্য্য উঠিয়াছে, ফুল ফুটিয়াছে, রাখাল বালকেরা মাঠে যাইতেছে,—সেই সূর্য্যোদয়, সেই ফুল ফোটা সেই মাঠে বিহার তাহারা শূন্য রাখিতে চায় না,—সেইখানেই তাহারা তাহাদের শ্যামের সঙ্গে মিলিত হইতে চাহিতেছে,—সেইখানেই অসীমের সাজপরা রূপটি তাহারা দেখিতে চায়,—সেইখানেই মাঠে ঘাটে বনে পর্ব্বতে অসীমের সঙ্গে আনন্দের খেলায় তাহারা যোগ দিবে বলিয়াই তাহারা বাহির হইয়া পড়িয়াছে—দূরে নয় ঐশ্বর্য্যের মধ্যে নয়, তাহাদের উপকরণ অতি সামান্য—পীতধড়া ও বনফুলের মালাই তাহাদের সাজের

পক্ষে যথেষ্ট—কেননা, সর্ব্বত্রই যাহার আনন্দ, তাহাকে কোনো বড়ো জায়গায় খুঁজিতে গেলে, তাহার জন্য আয়োজন আড়ম্বর করিতে গেলেই লক্ষ্য হারাইয়া ফেলিতে হয়।

কারোয়ার হইতে ফিরিয়া আসার কিছুকাল পরে ১২৯০ সালে ২৪শে অগ্রহায়ণে আমার বিবাহ হয়, তখন আমার বয়স ২২ বৎসর।

ছবি ও গান

ছবি ও গান নাম ধরিয়া আমার যে কবিতাগুলি বাহির হইয়াছিল তাহার অধিকাংশ এই সময়কার লেখা।

চৌরঙ্গির নিকটবর্ত্তী সার্কুলররোডের একটি বাগান-বাড়িতে আমরা তখন বাস করিতাম। তাহার দক্ষিণের দিকে মস্ত একটা বস্তি ছিল। আমি অনেক সময়েই দোতলার জানালার কাছে বসিয়া সেই লোকালয়ের দৃশ্য দেখিতাম। তাহাদের সমস্ত দিনের নানাপ্রকার কাজ, বিশ্রাম, খেলা ও আনাগোনা দেখিতে আমার ভারি ভালো লাগিত, সে যেন আমার কাছে বিচিত্র গল্পের মতো হইত।

নানা জিনিষকে দেখিবার যে দৃষ্টি সেই দৃষ্টি যেন আমাকে পাইয়া বসিয়াছিল। তখন একটি একটি যেন স্বতন্ত্র ছবিকে

কল্পনার আলোকে ও মনের আনন্দ দিয়া ঘিরিয়া লইয়া দেখিতাম। এক-একটি বিশেষ দৃশ্য এক একটি বিশেষ রসে রঙে নির্দ্দিষ্ট হইয়া আমার চোখে পড়িত। এমনি করিয়া নিজের মনের কল্পনাপরিবেষ্টিত ছবিগুলি গড়িয়া তুলিতে ভারি ভালো লাগিত। সে আর কিছু নয়, এক একটি পরিস্ফুট চিত্র আঁকিয়া তুলিবার আকাঙ্ক্ষা। চোখ দিয়া মনের জিনিষকে ও মন দিয়া চোখের দেখাকে দেখিতে পাইবার ইচ্ছা। তুলি দিয়া ছবি আঁকিতে যদি পারিতাম তবে পটের উপর রেখা ও রঙ দিয়া উতলা মনের দৃষ্টি ও সৃষ্টিকে বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতাম. কিন্তু সে উপায় আমার হাতে ছিল না। ছিল কেবল কথা ও ছন্দ। কিন্তু কথার তুলিতে তখন স্পষ্ট রেখার টান দিতে শিখি নাই, তাই কেবলি রঙ ছড়াইয়া পড়িত। তা হউক, তবু ছেলেরা যখন প্রথম রঙের বাক্স উপহার পায় তখন যেমন-তেমন করিয়া নানাপ্রকার ছবি আঁকিবার চেষ্টায় অস্থির হইয়া ওঠে, আমিও সেই দিন নবযৌবনের নানান্ রঙের বাক্সটা নূতন পাইয়া আপন মনে কেবলি রকম-বেরকম ছবি আঁকিবার চেষ্টা করিয়া দিন কাটাইয়াছি। সেই সেদিনের বাইশ বছর বয়সের সঙ্গে এই ছবিগুলাকে আজ মিলাইয়া দেখিলে হয়তো ইহাদের কাঁচা লাইন ও ঝাপ্‌সা রঙের ভিতর দিয়াও একটা কিছু চেহারা খুঁজিয়া পাওয়া যাইতে পারে।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি প্রভাতসঙ্গীতে একটা পর্ব্ব শেষ হইয়াছে। ছবি ও গান হইতে পালাটা আবার একরকম

করিয়া সুরু হইল। একটা জিনিষের আরম্ভের আয়োজনে বিস্তর বাহুল্য থাকে। কাজ যত অগ্রসর হইতে থাকে তত সে সমস্ত সরিয়া পড়ে। এই নূতন পালার প্রথমের দিকে বোধ করি বিস্তর বাজে জিনিষ আছে। সেগুলি যদি গাছের পাতা হইত তবে নিশ্চয় ঝরিয়া যাইত। কিন্তু বইয়ের পাতা তো অতো সহজে ঝরে না, তাহার দিন ফুরাইলেও সে টিঁকিয়া থাকে। নিতান্ত সামান্য জিনিষকেও বিশেষ করিয়া দেখিবার একটা পালা এই "ছবি ও গান"-এ আরম্ভ হইয়াছে। গানের সুর যেমন শাদা কথাকেও গম্ভীর করিয়া তোলে তেমনি কোনো একটা সামান্য উপলক্ষ্য লইয়া সেইটেকে হৃদয়ের রসে রসাইয়া তাহার তুচ্ছতা মোচন করিবার ইচ্ছা ছবি ও গান-এ ফুটিয়াছে। না, ঠিক তাহা নহে। নিজের মনের তারটা যখন সুরে বাঁধা থাকে তখনই বিশ্বসঙ্গীতের ঝঙ্কার সকল জায়গা হইতে উঠিয়াই তাহাতে অনুরণন তোলে। সেইদিন লেখকের চিত্তযন্ত্রে একটা সুর জাগিতেছিল বলিয়াই বাহিরে কিছুই তুচ্ছ ছিল না। এক একদিন হঠাৎ যাহা চোখে পড়িত, দেখিতাম তাহারই সঙ্গে আমার প্রাণের একটা সুর মিলিতেছে। ছোটো শিশু যেমন ধুলা বালি ঝিনুক শামুক যাহা খুসি তাহাই লইয়া খেলিতে পারে কেননা তাহার মনের ভিতরেই খেলা জাগিতেছে; সে আপনার অন্তরের খেলার আনন্দ দ্বারা জগতের আনন্দখেলাকে সত্যভাবেই আবিষ্কার করিতে পারে, এই জন্য সর্ব্বত্রই তাহার আয়োজন; তেমনি অন্তরের মধ্যে যেদিন আমাদের যৌবনের গান নানা

সুরে ভরিয়া উঠে তখনি আমরা সেই বোধের দ্বারা সত্য করিয়া দেখিতে পাই যে, বিশ্ববীণার হাজার লক্ষ তার নিত্য সুরে যেখানে বাঁধা নাই এমন জায়গাই নাই—তখন যাহা চোখে পড়ে, যাহা হাতের কাছে আসে তাহাতেই আসর জমিয়া ওঠে, দূরে যাইতে হয় না।

বালক

"ছবি ও গান" ও "কড়ি ও কোমল"-এর মাঝখানে বালক নামক একখানি মাসিকপত্র এক বৎসরের ওষধির মতো ফসল ফলাইয়া লীলাসম্বরণ করিল।

বালকদের পাঠ্য একটি সচিত্র কাগজ বাহির করিবার জন্য মেজবৌঠাকুরাণীর বিশেষ আগ্রহ জন্মিয়াছিল। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, সুধীন্দ্র বলেন্দ্র প্রভৃতি আমাদের বাড়ির বালকগণ এই কাগজে আপন আপন রচনা প্রকাশ করে। কিন্তু শুদ্ধমাত্র তাহাদের লেখায় কাগজ চলিতে পারে না জানিয়া তিনি সম্পাদক হইয়া আমাকেও রচনার ভার গ্রহণ করিতে বলেন। দুই এক সংখ্যা "বালক" বাহির হইবার পর একবার দুই একদিনের জন্য দেওঘরে রাজনারায়ণ বাবুকে দেখিতে যাই। কলিকাতায় ফিরিবার সময় রাত্রের গাড়িতে ভিড় ছিল;

ভালো করিয়া ঘুম হইতেছিল না—ঠিক চোখের উপর আলো জ্বলিতেছিল। মনে করিলাম ঘুম যখন হইবেই না তখন এই সুযোগে বালক-এর জন্য একটা গল্প ভাবিয়া রাখি। গল্প ভাবিবার ব্যর্থ চেষ্টার টানে গল্প আসিল না, ঘুম আসিয়া পড়িল। স্বপ্ন দেখিলাম, কোন্ এক মন্দিরের সিঁড়ির উপর বলির রক্তচিহ্ন দেখিয়া একটি বালিকা অত্যন্ত করুণ ব্যাকুলতার সঙ্গে তাহার বাপকে জিজ্ঞাসা করিতেছে—বাবা, এ কি! এ যে রক্ত! বালিকার এই কাতরতায় তাহার বাপ অন্তরে ব্যথিত হইয়া অথচ বাহিরে রাগের ভান করিয়া কোনোমতে তার প্রশ্নটাকে চাপা দিতে চেষ্টা করিতেছে।—জাগিয়া উঠিয়াই মনে হইল, এটি আমার স্বপ্নলব্ধ গল্প। এমন স্বপ্নে পাওয়া গল্প এবং অন্য লেখা আমার আরো আছে। এই স্বপ্নটির সঙ্গে ত্রিপুরার রাজা গোবিন্দমাণিক্যের পুরাবৃত্ত মিশাইয়া "রাজর্ষি" গল্প মাসে মাসে লিখিতে লিখিতে বালক-এ বাহির করিতে লাগিলাম।

তখনকার দিনগুলি নির্ভাবনার দিন ছিল। কি আমার জীবনে কি আমার গদ্যেপদ্যে কোনোপ্রকার অভিপ্রায় আপনাকে একাগ্রভাবে প্রকাশ করিতে চায় নাই। পথিকের দলে তখন যোগ দিই নাই, কেবল পথের ধারের ঘরটাতে আমি বসিয়া থাকিতাম। পথ দিয়া নানা লোক নানা কাজে চলিয়া যাইত, আমি চাহিয়া দেখিতাম—এবং বর্ষা শরৎ বসন্ত দূরপ্রবাসের অতিথির মতো অনাহূত আমার ঘরে আসিয়া কাটাইয়া দিত।—কিন্তু শুধু কেবল শরৎ বসন্ত লইয়াই

আমার কারবার ছিল না। আমার ছোটো ঘরটাতে কত অদ্ভুত মানুষ মাঝেমাঝে দেখা করিতে আসিত তাহার সীমা নাই; তাহারা যেন নোঙর-ছেঁড়া নৌকা—কোনো তাহাদের প্রয়োজন নাই কেবল ভাসিয়া বেড়াইতেছে। উহারই মধ্যে দুই একজন লক্ষ্মীছাড়া বিনা পরিশ্রমে আমার দ্বারা অভাব-পূরণ করিয়া লইবার জন্য নানা ছল করিয়া আমার কাছে আসিত। কিন্তু আমাকে ফাঁকি দিতে কোনো কৌশলেরই প্রয়োজন ছিল না—তখন আমার সংসারভার লঘু ছিল এবং বঞ্চনাকে বঞ্চনা বলিয়াই চিনিতাম না। আমি অনেক ছাত্রকে দীর্ঘকাল পড়িবার বেতন দিয়াছি তাহাদের পক্ষে বেতন নিষ্প্রয়োজন এবং পড়াটার প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্তই অনধ্যায়। একবার এক লম্বা চুলওয়ালা ছেলে তাহার কাল্পনিক ভগিনীর এক চিঠি আনিয়া আমার কাছে দিল। তাহাতে তিনি তাঁহারই মতো কাল্পনিক এক বিমাতার অত্যাচারে পীড়িত এই সহোদরটিকে আমার হস্তে সমর্পণ করিতেছেন। ইহার মধ্যে কেবল এই সহোদরটিই কাল্পনিক নহে তাহার নিশ্চয় প্রমাণ পাইলাম। কিন্তু যে পাখী উড়িতে শেখে নাই তাহার প্রতি অত্যন্ত তাগবাগ করিয়া বন্দুক লক্ষ্য করা যেমন অনাবশ্যক—ভগিনীর চিঠিও আমার পক্ষে তেমনি বাহুল্য ছিল। একবার একটি ছেলে আসিয়া খবর দিল সে বি.এ পড়িতেছে, কিন্তু মাথার ব্যামোতে পরীক্ষা দেওয়া তাহার পক্ষে অসাধ্য হইয়াছে। শুনিয়া আমি উদ্বিগ্ন হইলাম কিন্তু অন্যান্য অধিকাংশ বিদ্যারই ন্যায় ডাক্তারিবিদ্যাতেও

আমার পারদর্শিতা ছিল না সুতরাং কী উপায়ে তাহাকে আশ্বস্ত করিব ভাবিয়া পাইলাম না। সে বলিল, স্বপ্নে দেখিয়াছি পূর্ব্বজন্মে আপনার স্ত্রী আমার মাতা ছিলেন, তাঁহার পাদোদক খাইলেই আমার আরোগ্যলাভ হইবে। বলিয়া একটু হাসিয়া কহিল, আপনি বোধ হয় এ সমস্ত বিশ্বাস করেন না। আমি বলিলাম, আমি বিশ্বাস নাই করিলাম, তোমার রোগ যদি সারে তো সারুক্। স্ত্রীর পাদোদক বলিয়া একটা জল চালাইয়া দিলাম। খাইয়া সে আশ্চর্য্য উপকার বোধ করিল। ক্রমে অভিব্যক্তির পর্য্যায়ে জল হ'তে অতি সহজে সে অন্নে আসিয়া উত্তীর্ণ হইল। ক্রমে আমার ঘরের একটা অংশ অধিকার করিয়া বন্ধুবান্ধবদিগকে ডাকাইয়া সে তামাক খাওয়াইতে লাগিল। আমি সসঙ্কোচে সেই ধূমাচ্ছন্ন ঘর ছাড়িয়া দিলাম। ক্রমেই অত্যন্ত স্থূল কয়েকটি ঘটনায় স্পষ্টরূপে প্রমাণ হইতে লাগিল তাহার অন্য যে ব্যাধি থাক মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা ছিল না। ইহার পরে পূর্ব্বজন্মের সন্তানদিগকে বিশিষ্ট প্রমাণ ব্যতীত বিশ্বাস করা আমার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিল। দেখিলাম এ সম্বন্ধে আমার খ্যাতি ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। একদিন চিঠি পাইলাম আমার গতজন্মের একটি কন্যাসন্তান রোগশান্তির জন্য আমার প্রসাদপ্রার্থিনী হইয়াছেন। এইখানে শক্ত হইয়া দাঁড়ি টানিতে হইল, পুত্রটিকে লইয়া অনেক দুঃখ পাইয়াছি কিন্তু গতজন্মের কন্যাদায় কোনোমতেই আমি গ্রহণ করিতে সম্মত হইলাম না।

এদিকে শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব জমিয়া উঠিয়াছে। সন্ধ্যার সময় প্রায় আমার সেই ঘরের কোণে তিনি এবং প্রিয়বাবু আসিয়া জুটিতেন। গানে এবং সাহিত্যালোচনায় রাত হইয়া যাইত। কোনো কোনো দিন, দিনও এমনি করিয়া কাটিত। আসল কথা, মানুষের "আমি" বলিয়া পদার্থটা যখন নানাদিক হইতে প্রবল ও পরিপুষ্ট হইয়া না ওঠে তখন যেমন তাহার জীবনটা বিনা ব্যাঘাতে শরতের মেঘের মতো ভাসিয়া চলিয়া যায় আমার তখন সেই-রূপ অবস্থা।

বঙ্কিমচন্দ্র

এই সময়ে বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে আমার আলাপের সূত্রপাত হয়। তাঁহাকে প্রথম যখন দেখি সে অনেক দিনের কথা। তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন ছাত্রেরা মিলিয়া একটি বার্ষিক সম্মিলনী স্থাপন করিয়াছিলেন। চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তাহার প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। বোধ করি তিনি আশা করিয়াছিলেন কোনো এক দূর ভবিষ্যতে আমিও তাঁহাদের এই সম্মিলনীতে অধিকার লাভ করিতে পারিব—

সেই ভরসায় আমাকেও মিলনস্থানে কী একটা কবিতা পড়িবার ভার দিয়াছিলেন। তখন তাঁহার যুবা বয়স ছিল। মনে আছে, কোনো জর্ম্মান যোদ্ধৃ কবির যুদ্ধকবিতার ইংরেজি তর্জ্জমা তিনি সেখানে স্বয়ং পড়িবেন এইরূপ সংকল্প করিয়া খুব উৎসাহের সহিত আমাদের বাড়িতে সেগুলি আবৃত্তি করিয়াছিলেন। কবিবীরের বামপার্শ্বের প্রেয়সী সঙ্গিনী তরবারীর প্রতি তাঁহার প্রেমোচ্ছ্বাসগীতি যে একদিন চন্দ্রনাথ বাবুর প্রিয় কবিতা ছিল ইহাতে পাঠকেরা বুঝিবেন যে, কেবল যে এক সময়ে চন্দ্রনাথ বাবু যুবক ছিলেন তাহা নহে তখনকার সময়টাই কিছু অন্যরকম ছিল।

সেই সম্মিলনসভার ভিড়ের মধ্যে ঘুরিতে ঘুরিতে নানা লোকের মধ্যে হঠাৎ এমন একজনকে দেখিলাম যিনি সকলের হইতে স্বতন্ত্র—যাঁহাকে অন্য পাঁচজনের সঙ্গে মিশাইয়া ফেলিবার জো নাই। সেই গৌরকান্তি দীর্ঘকায় পুরুষের মুখের মধ্যে এমন একটি দৃপ্ত তেজ দেখিলাম যে তাঁহার পরিচয় জানিবার কৌতূহল সম্বরণ করিতে পারিলাম না। সেদিনকার এত লোকের মধ্যে কেবলমাত্র, তিনি কে, ইহাই জানিবার জন্য প্রশ্ন করিয়াছিলাম। যখন উত্তরে শুনিলাম তিনিই বঙ্কিমবাবু, তখন বড়ো বিস্ময় জন্মিল। লেখা পড়িয়া এতদিন যাঁহাকে মহৎ বলিয়া জানিতাম চেহারাতেও তাঁহার বিশিষ্টতার যে এমন একটি নিশ্চিত পরিচয় আছে সে কথা সেদিন আমার মনে খুব লাগিয়াছিল। বঙ্কিমবাবুর খড়্গানাসায়, তাঁহার চাপা ঠোঁটে তাঁহার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ভারি একটা প্রবলতার লক্ষণ

ছিল। বক্ষের উপর দুই হাত বদ্ধ করিয়া তিনি যেন সকলের নিকট হইতে পৃথক হইয়া চলিতেছিলেন, কাহারও সঙ্গে যেন তাঁর কিছুমাত্র গা-ঘেঁষাঘেঁষি ছিল না, এইটেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশি করিয়া আমার চোখে ঠেকিয়াছিল। তাঁহার যে কেবলমাত্র বুদ্ধিশালী মননশীল লেখকের ভাব ছিল তাহা নহে তাঁহার ললাটে যেন একটি অদৃশ্য রাজতিলক পরানো ছিল।

এইখানে একটি ছোটো ঘটনা ঘটিল তাহার ছবিটি আমার মনে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে। একটি ঘরে একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত স্বদেশ সম্বন্ধে তাঁহার কয়েকটি স্বরচিত শ্লোক পড়িয়া শ্রোতাদের কাছে তাহার বাংলা ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। বঙ্কিমবাবু ঘরে ঢুকিয়া এক প্রান্তে দাঁড়াইলেন। পণ্ডিতের কবিতার একস্থলে, অশ্লীল নহে, কিন্তু, ইতর একটি উপমা ছিল। পণ্ডিতমহাশয় যেমন সেটিকে ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিলেন অমনি বঙ্কিম বাবু হাত দিয়া মুখ চাপিয়া তাড়াতাড়ি সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। দরজার কাছ হইতে তাঁহার সেই দৌড়িয়া পালানোর দৃশ্যটা যেন আমি চোখে দেখিতে পাইতেছি।

তাহার পরে অনেকবার তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা হইয়াছে কিন্তু উপলক্ষ্য ঘটে নাই। অবশেষে একবার, যখন হাওড়ায় তিনি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন তখন সেখানে তাঁহার বাসায় সাহস করিয়া দেখা করিতে গিয়াছিলাম। দেখা হইল, যথাসাধ্য আলাপ করিবারও চেষ্টা করিলাম, কিন্তু ফিরিয়া আসিবার সময় মনের মধ্যে যেন একটা লজ্জা লইয়া ফিরি-

লাম। অর্থাৎ আমি যে নিতান্তই অর্ব্বাচীন সেইটে অনুভব করিয়া ভাবিতে লাগিলাম এমন করিয়া বিনা পরিচয়ে বিনা আহ্বানে তাঁহার কাছে আসিয়া ভালো করি নাই।

তাহার পরে বয়সে আরো কিছু বড়ো হইয়াছি; সে সময়কার লেখকদলের মধ্যে সকলের কনিষ্ঠ বলিয়া একটা আসন পাইয়াছি—কিন্তু সে আসনটা কিরূপ, ও কোন্‌খানে পড়িবে তাহা ঠিকমত স্থির হইতেছিল না;—ক্রমে ক্রমে যে একটু খ্যাতি পাইতেছিলাম তাহার মধ্যে যথেষ্ট দ্বিধা ও অনেকটা পরিমাণে অবজ্ঞা জড়িত হইয়াছিল। তখনকার দিনে আমাদের লেখকদের একটা করিয়া বিলাতী ডাকনাম ছিল, কেহ ছিলেন বাংলার বায়রন, কেহ এমার্সন, কেহ আর কিছু। আমাকে তখন কেহ কেহ শেলি বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন—সেটা শেলির পক্ষে অপমান এবং আমার পক্ষে উপহাসস্বরূপ ছিল; তখন আমি কলভাষার কবি বলিয়া উপাধি পাইয়াছি: তখন বিদ্যাও ছিল না, জীবনের অভিজ্ঞতাও ছিল অল্প, তাই গদ্য পদ্য যাহা লিখিতাম তাহার মধ্যে বস্তু যেটুকু ছিল ভাবুকতা ছিল তাহার চেয়ে বেশি, সুতরাং তাহাকে ভালো বলিতে গেলেও জোর দিয়া প্রশংসা করা যাইত না। তখন আমার বেশভূষা ব্যবহারেও সেই অর্দ্ধস্ফুটতার পরিচয় যথেষ্ট ছিল; চুল ছিল বড়ো, বড়ো এবং ভাবগতিকেও কবিত্বের একটা তুরীয় রকমের সৌখিনতা প্রকাশ পাইত; অত্যন্তই খাপছাড়া হইয়াছিলাম, বেশ সহজ মানুষের প্রশস্ত প্রচলিত আচার আচরণের

মধ্যে গিয়া পৌঁছিয়া সকলের সঙ্গে সুসঙ্গত হইয়া উঠিতে পারি নাই।

এই সময়ে অক্ষয় সরকার মহাশয় “নবজীবন” মাসিকপত্র বাহির করিয়াছেন—আমিও তাহাতে দুটা একটা লেখা দিয়াছি।

বঙ্কিমবাবু তখন বঙ্গদর্শনের পালা শেষ করিয়া ধর্ম্মালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। “প্রচার” বাহির হইতেছে। আমিও তখন প্রচার-এ একটি গান ও কোনো বৈষ্ণব পদ অবলম্বন করিয়া একটি গদ্য ভাবোচ্ছ্বাস প্রকাশ করিয়াছি।

এই সময়ে কিম্বা ইহারই কিছু পূর্ব্ব হইতে আমি বঙ্কিম বাবুর কাছে আবার একবার সাহস করিয়া যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিয়াছি। তখন তিনি ভবানীচরণ দত্তর ষ্ট্রীটে বাস করিতেন। বঙ্কিমবাবুর কাছে যাইতাম বটে কিন্তু বেশি কিছু কথাবার্ত্তা হইত না। আমার তখন শুনিবার বয়স, কথা বলিবার বয়স নহে। ইচ্ছা করিত আলাপ জমিয়া উঠুক কিন্তু সঙ্কোচে কথা সরিত না। এক-একদিন দেখিতাম সঞ্জীব বাবু তাকিয়া অধিকার করিয়া গড়াইতেছেন। তাঁহাকে দেখিলে বড়ো খুসি হইতাম। তিনি আলাপী লোক ছিলেন। গল্প করায় তাঁহার আনন্দ ছিল এবং তাঁহার মুখে গল্প শুনিতেও আনন্দ হইত। যাঁহারা তাঁহার প্রবন্ধ পড়িয়াছেন তাঁহারা নিশ্চয়ই ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন যে, সে লেখাগুলি কথা-কহার অজস্র আনন্দবেগেই লিখিত—ছাপার অক্ষরে আসর জমাইয়া যাওয়া; এই ক্ষমতাটি অতি অল্প লোকেরই আছে; তাহার

পরে সেই মুখে-বলার ক্ষমতাটিকে লেখার মধ্যেও তেমনি অবাধে প্রকাশ করিবার শক্তি আরো কম লোকের দেখিতে পাওয়া যায়।

এই সময়ে কলিকাতায় শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের অভ্যুদয় ঘটে। বঙ্কিম বাবুর মুখেই তাঁহার কথা প্রথম শুনিলাম। আমার মনে হইতেছে প্রথমটা বঙ্কিম বাবুই সাধারণের কাছে তাঁহার পরিচয়ের সূত্রপাত করিয়া দেন। সেই সময়ে হঠাৎ হিন্দুধর্ম্ম পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সাক্ষ্য দিয়া আপনার কৌলিন্য প্রমাণ করিবার যে অদ্ভুত চেষ্টা করিয়াছিল তাহা দেখিতে দেখিতে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। ইতি-পূর্ব্বে দীর্ঘকাল ধরিয়া থিয়সফিই আমাদের দেশে এই আন্দোলনের ভূমিকা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল।

কিন্তু বঙ্কিম বাবু যে ইহার সঙ্গে সম্পূর্ণ যোগ দিতে পারিয়াছিলেন তাহা নহে। তাঁহার প্রচার পত্রে তিনি যে ধর্ম্মব্যাখ্যা করিতেছিলেন তাহার উপরে তর্কচূড়ামণির ছায়া পড়ে নাই, কারণ তাহা একেবারেই অসম্ভব ছিল।

আমি তখন আমার কোণ ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া পড়িতেছিলাম, আমার তখনকার এই আন্দোলনকালের লেখা-গুলিতে তাহার পরিচয় আছে। তাহার কতক বা ব্যঙ্গ-কাব্যে, কতক বা কৌতুকনাট্যে, কতক বা তখনকার সঞ্জীবনী কাগজে পত্রআকারে বাহির হইয়াছিল। ভাবাবেশের কুহক কাটাইয়া তখন মল্লভূমিতে আসিয়া তাল ঠুকিতে আরম্ভ করিয়াছি।

সেই লড়ায়ের উত্তেজনার মধ্যে বঙ্কিমবাবুর সঙ্গেও আমার একটা বিরোধের সৃষ্টি হইয়াছিল। তখনকার ভারতী ও প্রচার-এ তাহার ইতিহাস রহিয়াছে, তাহার বিস্তারিত আলোচনা এখানে অনাবশ্যক। এই বিরোধের অবসানে বঙ্কিমবাবু আমাকে যে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন আমার দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা হারাইয়া গিয়াছে—যদি থাকিত তবে পাঠকেরা দেখিতে পাইতেন বঙ্কিমবাবু কেমন সম্পূর্ণ ক্ষমার সহিত এই বিরোধের কাঁটাটুকু উৎপাটন করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

জাহাজের খোল

কাগজে কী একটা বিজ্ঞাপন দেখিয়া একদিন মধ্যাহ্নে জ্যোতিদাদা নিলামে গিয়া ফিরিয়া আসিয়া খবর দিলেন যে তিনি সাত হাজার টাকা দিয়া একটা জাহাজের খোল কিনিয়াছেন। এখন ইহার উপরে এঞ্জিন জুড়িয়া কামরা তৈরি করিয়া একটা পুরা জাহাজ নির্ম্মাণ করিতে হইবে!

দেশের লোকেরা কলম চালায়, রসনা চালায় কিন্তু

জাহাজ চালায় না, বোধ করি এই ক্ষোভ তাঁহার মনে ছিল। দেশে দেশালাই কাঠি জ্বালাইবার জন্য তিনি একদিন চেষ্টা করিয়াছিলেন, দেশালাই কাঠি অনেক ঘর্ষণেও জ্বলে নাই; দেশে তাঁতের কল চালাইবার জন্যও তাঁহার উৎসাহ ছিল কিন্তু সেই তাঁতের কল একটিমাত্র গামছা প্রসব করিয়া তাহার পর হইতে স্তব্ধ হইয়া আছে। তাহার পরে স্বদেশী চেষ্টায় জাহাজ চালাইবার জন্য তিনি হঠাৎ একটা শূন্য খোল কিনিলেন, সে খোল একদা ভর্ত্তি হইয়া উঠিল, শুধু কেবল এঞ্জিনে এবং কামরায় নহে, ঋণে এবং সর্ব্বনাশে। কিন্তু তবু একথা মনে রাখিতে হইবে এই সকল চেষ্টার ক্ষতি যাহা, সে একলা তিনিই স্বীকার করিয়াছেন, আর ইহার লাভ যাহা তাহা নিশ্চয়ই এখনো তাঁহার দেশের খাতায় জমা হইয়া আছে। পৃথিবীতে এইরূপ বেহিসাবী অব্যবসায়ী লোকেরাই দেশের কর্ম্মক্ষেত্রের উপর দিয়া বারম্বার নিষ্ফল অধ্যবসায়ের বন্যা বহাইয়া দিতে থাকেন; সে বন্যা হঠাৎ আসে এবং সে বন্যা হঠাৎ চলিয়া যায়, কিন্তু তাহা স্তরে স্তরে যে পলি রাখিয়া চলে তাহাতেই দেশের মাটিকে প্রাণপূর্ণ করিয়া তোলে—তাহার পর ফসলের দিন যখন আসে তখন তাঁহাদের কথা কাহারও মনে থাকে না বটে কিন্তু সমস্ত জীবন যাঁহারা ক্ষতি-বহন করিয়াই আসিয়াছেন মৃত্যুর পরবর্ত্তী এই ক্ষতিটুকুও তাঁহারা অনায়াসে স্বীকার করিতে পারিবেন।

একদিকে বিলাতি কোম্পানি আর একদিকে তিনি একলা—এই দুই পক্ষে বাণিজ্য-নৌযুদ্ধ ক্রমশই কিরূপ প্রচণ্ড

হইয়া উঠিল তাহা খুলনা বরিশালের লোকেরা এখনো বোধ করি স্মরণ করিতে পারিবেন। প্রতিযোগিতার তাড়নায় জাহাজের পর জাহাজ তৈরি হইল, ক্ষতির পর ক্ষতি বাড়িতে লাগিল, এবং আয়ের অঙ্ক ক্রমশই ক্ষীণ হইতে হইতে টিকিটের মূল্যের উপসর্গটা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া গেল,—বরিশাল খুলনার ষ্টীমার লাইনে সত্যযুগ আবির্ভাবের উপক্রম হইল। যাত্রীরা যে কেবল বিনাভাড়ায় যাতায়াত স্বুরু করিল তাহা নহে, তাহারা বিনামূল্যে মিষ্টান্ন খাইতে আরম্ভ করিলেন! ইহার উপরে বরিশালের ভলন্টিয়ারের দল স্বদেশী কীর্ত্তন গাহিয়া কোমর বাঁধিয়া যাত্রী সংগ্রহে লাগিয়া গেল। স্বুতরাং জাহাজে যাত্রীর অভাব হইল না কিন্তু আর সকল প্রকার অভাবই বাড়িল বই কমিল না। অঙ্কশাস্ত্রের মধ্যে স্বদেশহিতৈষিতার উৎসাহ প্রবেশ করিবার পথ পায় না;—কীর্ত্তন যতই জমুক, উত্তেজনা যতই বাড়ুক, গণিত আপনার নামতা ভুলিতে পারিল না—স্বুতরাং তিন-ত্রিক্‌খে-নয় ঠিক তালে তালে ফড়িংয়ের মতো লাফ দিতে দিতে ঋণের পথে অগ্রসর হইতে লাগিল।

অব্যবসায়ী ভাবুক মানুষের একটা কুগ্রহ এই যে, লোকেরা তাঁহাদিগকে অতি সহজেই চিনিতে পারে কিন্তু তাঁহারা লোক চিনিতে পারেন না; অথচ তাঁহারা যে চেনেন না এইটুকুমাত্র শিখিতে তাঁহাদের বিস্তর খরচ এবং ততোধিক বিলম্ব হয় এবং সেই শিক্ষা কাজে লাগানো তাঁহাদের দ্বারা ইহজীবনেও ঘটে না। যাত্রীরা যখন

বিনামূল্যে মিষ্টান্ন খাইতেছিল তখন জ্যোতিদাদার কর্ম্ম-চারীরা যে তপস্বীর মতো উপবাস করিতেছিল এমন কোনো লক্ষণ দেখা যায় নাই, অতএব যাত্রীদের জন্যও জলযোগের ব্যবস্থা ছিল কর্ম্মচারীরাও বঞ্চিত হয় নাই, কিন্তু সকলের চেয়ে মহত্তম লাভ রহিল জ্যোতিদাদার—সে তাঁহার এই সর্ব্বস্ব-ক্ষতিস্বীকার।

তখন খুলনা বরিশালের নদীপথে প্রতিদিনের এই জয়-পরাজয়ের সংবাদ আলোচনায় আমাদের উত্তেজনার অন্ত ছিল না। অবশেষে একদিন খবর আসিল তাঁহার স্বদেশী নামক জাহাজ হাবড়ার ব্রীজে ঠেকিয়া ডুবিয়াছে। এইরূপে যখন তিনি তাঁহার নিজের সাধ্যের সীমা একেবারে সম্পূর্ণ অতিক্রম করিলেন, নিজের পক্ষে কিছুই আর বাকি রাখিলেন না তখনি তাঁহার ব্যবসা বন্ধ হইয়া গেল।

মৃত্যুশোক

ইতিমধ্যে বাড়িতে পরে পরে কয়েকটি মৃত্যুঘটনা ঘটিল। ইতিপূর্ব্বে মৃত্যুকে আমি কোনোদিন প্রত্যক্ষ করি নাই। মার যখন মৃত্যু হয় আমার তখন বয়স অল্প। অনেকদিন

হইতে তিনি রোগে ভুগিতেছেন, কখন যে তাঁহার জীবন সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছিল তাহা জানিতেও পাই নাই। এতোদিন পর্য্যন্ত যে ঘরে আমরা শুইতাম সেই ঘরেই স্বতন্ত্র শয্যায় মা শুইতেন। কিন্তু তাঁহার রোগের সময় একবার কিছুদিন তাঁহাকে বোটে করিয়া গঙ্গায় বেড়াইতে লইয়া যাওয়া হয়—তাহার পরে বাড়িতে ফিরিয়া তিনি অন্তঃপুরের তেতলার ঘরে থাকিতেন। যে রাত্রিতে তাঁহার মৃত্যু হয় তখন আমরা ঘুমাইতেছিলাম, তখন কত রাত্রি জানি না একজন পুরাতন দাসী আমাদের ঘরে ছুটিয়া আসিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, "ওরে তোদের কী সর্ব্বনাশ হ'ল রে!" তখনি বৌ ঠাকুরাণী তাড়াতাড়ি তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়া ঘর হইতে টানিয়া বাহির করিয়া লইয়া গেলেন—পাছে গভীর রাত্রে আচম্‌কা আমাদের মনে গুরুতর আঘাত লাগে এই আশঙ্কা তাঁহার ছিল। স্তিমিত প্রদীপে অস্পষ্ট আলোকে ক্ষণকালের জন্য জাগিয়া উঠিয়া হঠাৎ বুকটা দমিয়া গেল কিন্তু কী হইয়াছে ভালো করিয়া বুঝিতেই পারিলাম না। প্রভাতে উঠিয়া যখন মার মৃত্যুসংবাদ শুনিলাম তখনো সে কথাটার অর্থ সম্পূর্ণ গ্রহণ করিতে পারিলাম না। বাহিরের বারান্দায় আসিয়া দেখিলাম তাঁহার সুসজ্জিত দেহ প্রাঙ্গনে খাটের উপরে শয়ান। কিন্তু মৃত্যু যে ভয়ঙ্কর, সে দেহে তাহার কোনো প্রমাণ ছিল না;—সেদিন প্রভাতের আলোকে মৃত্যুর যে রূপ দেখিলাম তাহা সুখ-সুপ্তির মতোই প্রশান্ত ও মনোহর। জীবন হইতে জীবনান্তের বিচ্ছেদ স্পষ্ট করিয়া

চোখে পড়িল না। কেবল যখন তাঁহার দেহ বহন করিয়া বাড়ির সদর দরজার বাহিরে লইয়া গেল এবং আমরা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ শ্মশানে চলিলাম তখনি শোকের সমস্ত ঝড় যেন একেবারে এক দম্‌কায় আসিয়া মনের ভিতরটাতে এই একটা হাহাকার তুলিয়া দিল যে, এই বাড়ির এই দরজা দিয়া মা আর একদিনও নিজের এই চিরজীবনের ঘরকরনার মধ্যে আপনার আসনটিতে আসিয়া বসিবেন না। বেলা হইল, শ্মশান হইতে ফিরিয়া আসিলাম; গলির মোড়ে আসিয়া তেতলায় পিতার ঘরের দিকে চাহিয়া দেখিলাম—তিনি তখনো তাঁহার ঘরের সম্মুখের বারান্দায় স্তব্ধ হইয়া উপাসনায় বসিয়া আছেন।

বাড়িতে যিনি কনিষ্ঠা বধূ ছিলেন তিনিই মাতৃহীন বালকদের ভার লইলেন। তিনিই আমাদিগকে খাওয়াইয়া পরাইয়া সর্ব্বদা কাছে টানিয়া, আমাদের যে কোনো অভাব ঘটিয়াছে তাহা ভুলাইয়া রাখিবার জন্য দিনরাত্রি চেষ্টা করিলেন। যে ক্ষতি পূরণ হইবে না, যে বিচ্ছেদের প্রতিকার নাই তাহাকে ভুলিবার শক্তি প্রাণশক্তির একটা প্রধান অঙ্গ;—শিশুকালে সেই প্রাণশক্তি নবীন ও প্রবল থাকে, তখন সে কোনো আঘাতকে গভীরভাবে গ্রহণ করে না, স্থায়ী রেখায় আঁকিয়া রাখে না। এই জন্য জীবনে প্রথম যে মৃত্যু কালো ছায়া ফেলিয়া প্রবেশ করিল, তাহা আপনার কালিমাকে চিরন্তন না করিয়া ছায়ার মতোই একদিন নিঃশব্দ-পথে চলিয়া গেল। ইহার পরে বড়ো হইলে যখন বসন্ত-

প্রভাতে একমুঠা অনতিস্ফুট মোটা মোটা বেলফুল চাদরের প্রান্তে বাঁধিয়া ক্ষ্যাপার মতো বেড়াইতাম—তখন সেই কোমল চিক্কণ কুঁড়িগুলি ললাটের উপর বুলাইয়া প্রতিদিনই আমার মায়ের শুভ্র আঙুলগুলি মনে পড়িত;—আমি স্পষ্টই দেখিতে পাইতাম যে-স্পর্শ সেই সুন্দর আঙুলের আগায় ছিল সেই স্পর্শই প্রতিদিন এই বেলফুলগুলির মধ্যে নির্ম্মল হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে; জগতে তাহার আর অন্ত নাই—তা আমরা ভুলিই, আর মনে রাখি।

কিন্তু আমার চব্বিশ বছর বয়সের সময় মৃত্যুর সঙ্গে যে পরিচয় হইল তাহা স্থায়ী পরিচয়। তাহা তাহার পরবর্ত্তী প্রত্যেক বিচ্ছেদশোকের সঙ্গে মিলিয়া অশ্রুর মালা দীর্ঘ করিয়া গাঁথিয়া চলিয়াছে। শিশুবয়সের লঘু জীবন বড়ো বড়ো মৃত্যুকেও অনায়াসেই পাশ কাটাইয়া ছুটিয়া যায়—কিন্তু অধিক বয়সে মৃত্যুকে অত সহজে ফাঁকি দিয়া এড়াইয়া চলিবার পথ নাই। তাই সেদিনকার সমস্ত দুঃসহ আঘাত বুক পাতিয়া লইতে হইয়াছিল।

জীবনের মধ্যে কোথাও যে কিছুমাত্র ফাঁক আছে তাহা তখন জানিতাম না; সমস্তই হাসিকান্নায় একেবারে নিরেট করিয়া বোনা। তাহাকে অতিক্রম করিয়া আর কিছুই দেখা যাইত না, তাই তাহাকে একেবারে চরম করিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলাম। এমন সময় কোথা হইতে মৃত্যু আসিয়া এই অত্যন্ত প্রত্যক্ষ জীবনটার একটা প্রান্ত যখন এক মুহূর্ত্তের মধ্যে ফাঁক করিয়া দিল তখন মনটার মধ্যে সে কী ধাঁধাই

লাগিয়া গেল! চারিদিকে গাছপালা মাটি জল চন্দ্রসূর্য্য গ্রহতারা তেমনি নিশ্চিত সত্যেরই মতো বিরাজ করিতেছে অথচ তাহাদেরই মাঝখানে তাহাদেরই মতো যাহা নিশ্চিত সত্য ছিল, এমন কি, দেহ প্রাণ হৃদয় মনের সহস্রবিধ স্পর্শের দ্বারা যাহাকে তাহাদের সকলের চেয়েই বেশি সত্য করিয়াই অনুভব করিতাম সেই নিকটের মানুষ যখন এত সহজে এক নিমিষে স্বপ্নের মতো মিলাইয়া গেল তখন সমস্ত জগতের দিকে চাহিয়া মনে হইতে লাগিল এ কী অদ্ভুত আত্মখণ্ডন! যাহা আছে এবং যাহা রহিল না, এই উভয়ের মধ্যে কোনো মতে মিল করিব কেমন করিয়া!

জীবনের এই রন্ধ্রটির ভিতর দিয়া যে একটা অতলস্পর্শ অন্ধকার প্রকাশিত হইয়া পড়িল তাহাই আমাকে দিনরাত্রি আকর্ষণ করিতে লাগিল। আমি ঘুরিয়া ফিরিয়া কেবল সেইখানে আসিয়া দাঁড়াই, সেই অন্ধকারের দিকেই তাকাই এবং খুঁজিতে থাকি যাহা গেল তাহার পরিবর্ত্তে কী আছে। শূন্যতাকে মানুষ কোনোমতেই অন্তরের সঙ্গে বিশ্বাস করিতে পারে না। যাহা নাই তাহাই মিথ্যা—যাহা মিথ্যা তাহা নাই। এই জন্যই যাহা দেখিতেছি না, তাহার মধ্যে দেখিবার চেষ্টা, যাহা পাইতেছি না তাহার মধ্যেই পাইবার সন্ধান কিছুতেই থামিতে চায় না। চারা গাছকে অন্ধকার বেড়ার মধ্যে ঘিরিয়া রাখিলে তাহার সমস্ত চেষ্টা যেমন সেই অন্ধকারকে কোনোমতে ছাড়াইয়া আলোকে মাথা তুলিবার জন্য পদাঙ্গুলিতে ভর করিয়া যথাসম্ভব খাড়া হইয়া উঠিতে থাকে—

তেমনি, মৃত্যু যখন মনের চারিদিকে হঠাৎ একটা "নাই"-অন্ধকারের বেড়া গাড়িয়া দিল, তখন সমস্ত মনপ্রাণ অহোরাত্র দুঃসাধ্য চেষ্টায় তাহারই ভিতর দিয়া কেবলি "আছে"-আলোকের মধ্যে বাহির হইতে চাহিল। কিন্তু সেই অন্ধকারকে অতিক্রম করিবার পথ অন্ধকারের মধ্যে যখন দেখা যায় না তখন তাহার মতো দুঃখ আর কী আছে।

তবু এই দুঃসহ দুঃখের ভিতর দিয়া আমার মনের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে একটা আকস্মিক আনন্দের হাওয়া বহিতে লাগিল, তাহাতে আমি নিজেই আশ্চর্য্য হইতাম। জীবন যে একেবারে অবিচলিত নিশ্চিত নহে এই দুঃখের সংবাদেই মনের ভার লঘু হইয়া গেল। আমরা যে নিশ্চল সত্যের পাথরে গাঁথা দেয়ালের মধ্যে চিরদিনের কয়েদী নহি এই চিন্তায় আমি ভিতরে ভিতরে উল্লাস বোধ করিতে লাগিলাম। যাহাকে ধরিয়াছিলাম তাহাকে ছাড়িতেই হইল এইটাকে ক্ষতির দিক দিয়া দেখিয়া যেমন বেদনা পাইলাম তেমনি সেইক্ষণেই ইহাকে মুক্তির দিক দিয়া দেখিয়া একটা উদার শান্তি বোধ করিলাম। সংসারের বিশ্বব্যাপী অতি বিপুল ভার জীবন-মৃত্যুর হরণপূরণে আপনাকে আপনি সহজেই নিয়মিত করিয়া চারিদিকে কেবলি প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে, সে ভার বদ্ধ হইয়া কাহাকেও কোনোখানে চাপিয়া রাখিয়া দিবেনা—একেশ্বর জীবনের দৌরাত্ম্য কাহাকেও বহন করিতে হইবে না—এই কথাটা একটা আশ্চর্য্য নূতন সত্যের মতো আমি সেদিন যেন প্রথম উপলব্ধি করিয়াছিলাম।

সেই বৈরাগ্যের ভিতর দিয়া প্রকৃতির সৌন্দর্য্য আরও গভীররূপে রমণীয় হইয়া উঠিয়াছিল। কিছু দিনের জন্য জীবনের প্রতি আমার অন্ধ আসক্তি একেবারেই চলিয়া গিয়াছিল বলিয়াই চারিদিকে আলোকিত নীল আকাশের মধ্যে গাছপালার আন্দোলন আমার অশ্রুধৌত চক্ষে ভারি একটি মাধুরী বর্ষণ করিত। জগৎকে সম্পূর্ণ করিয়া এবং সুন্দর করিয়া দেখিবার জন্য যে দূরত্বের প্রয়োজন মৃত্যু সেই দূরত্ব ঘটাইয়া দিয়াছিল। আমি নির্লিপ্ত হইয়া দাঁড়াইয়া মরণের বৃহৎ পটভূমিকার উপর সংসারের ছবিটি দেখিলাম এবং জানিলাম তাহা বড়ো মনোহর।

সেই সময়ে আবার কিছুকালের জন্য আমার একটা সৃষ্টিছাড়া রকমের মনের ভাব ও বাহিরের আচরণ দেখা দিয়াছিল। সংসারের লোকলৌকিকতাকে নিরতিশয় সত্যপদার্থের মতো মনে করিয়া তাহাকে সদাসর্ব্বদা মানিয়া চলিতে আমার হাসি পাইত। সে সমস্ত যেন আমার গায়েই ঠেকিত না। কে আমাকে কী মনে করিবে কিছুদিন এ দায় আমার মনে একেবারেই ছিল না। ধুতির উপর গায়ে কেবল একটা মোটা চাদর এবং পায়ে একজোড়া চটি পরিয়া কতদিন থ্যাকারের বাড়িতে বই কিনিতে গিয়াছি। আহারের ব্যবস্থাটাও অনেক অংশে খাপছাড়া ছিল। কিছুকাল ধরিয়া আমার শয়ন ছিল বৃষ্টি বাদল শীতেও তেতলায় বাহিরের বারান্দায়; সেখানে আকাশের তারার সঙ্গে আমার চোখোচোখি হইতে পারিত এবং ভোরের আলোর সঙ্গে আমার সাক্ষাতের বিলম্ব হইত না।

এসমস্ত যে বৈরাগ্যের কৃচ্ছ্রসাধন তাহা একেবারেই নহে। এ যেন আমার একটা ছুটির পালা, সংসারের বেত হাতে গুরুমহাশয়কে যখন নিতান্ত একটা ফাঁকি বলিয়া মনে হইল তখন পাঠশালার প্রত্যেক ছোটো ছোটো শাসনও এড়াইয়া মুক্তির আস্বাদনে প্রবৃত্ত হইলাম। একদিন সকালে ঘুম হইতে জাগিয়াই যদি দেখি পৃথিবীর ভারাকর্ষণটা একেবারে অর্দ্ধেক কমিয়া গিয়াছে তাহা হইলে কি আর সরকারী রাস্তা বাহিয়া সাবধানে চলিতে ইচ্ছা করে? নিশ্চয়ই তাহা হইলে হ্যারিসন রোডের চারতলা পাঁচতলা বাড়িগুলা বিনা কারণেই লাফ দিয়া ডিঙাইয়া চলি, এবং ময়দানে হাওয়া খাইবার সময় যদি সামনে অক্টর্লনি মনুমেণ্টটা আসিয়া পড়ে তাহা হইলে ঐটুকুখানি পাশ কাটাইতেও প্রবৃত্তি হয় না, ধাঁ করিয়া তাহাকে লঙ্ঘন করিয়া পার হইয়া যাই। আমারও সেই দশা ঘটিয়াছিল—পায়ের নীচে হইতে জীবনের টান কমিয়া যাইতেই আমি বাঁধা রাস্তা একেবারে ছাড়িয়া দিবার জো করিয়াছিলাম।

বাড়ির ছাদে একলা গভীর অন্ধকারে মৃত্যুরাজ্যের কোনো একটা চূড়ার উপরকার একটা ধ্বজপতাকা, তাহার কালো পাথরের তোরণদ্বারের উপরে আঁক পড়া কোনো একটা অক্ষর কিম্বা একটা চিহ্ন দেখিবার জন্য আমি যেন সমস্ত রাত্রিটার উপর অন্ধের মতো দুইহাত বুলাইয়া ফিরিতাম। আবার সকাল বেলায় যখন আমার সেই বাহিরের পাতা বিছানার উপরে ভোরের আলো আসিয়া পড়িত তখন চোখ মেলিয়াই

দেখিতাম আমার মনের চারিদিকের আবরণ যেন স্বচ্ছ হইয়া আসিয়াছে; কুয়াশা কাটিয়া গেলে পৃথিবীর নদী গিরি অরণ্য যেমন ঝলমল করিয়া ওঠে জীবনলোকের প্রসারিত ছবিখানি আমার চোখে তেমনি শিশিরসিক্ত নবীন ও সুন্দর করিয়া দেখা দিয়াছে।

বর্ষা ও শরৎ

এক এক বৎসরে বিশেষ এক একটা গ্রহ রাজার পদ ও মন্ত্রীর পদ লাভ করে, পঞ্জিকার আরম্ভেই পশুপতি ও হৈমবতীর নিভৃত আলাপে তাহার সংবাদ পাই। তেমনি দেখিতেছি জীবনের এক এক পর্য্যায়ে এক একটি ঋতু বিশেষ-ভাবে আধিপত্য গ্রহণ করিয়া থাকে। বাল্যকালের দিকে যখন তাকাইয়া দেখি তখন সকলের চেয়ে স্পষ্ট করিয়া মনে পড়ে তখনকার বর্ষার দিনগুলি। বাতাসের বেগে জলের ছাঁটে বারান্দা একেবারে ভাসিয়া যাইতেছে, সারি সারি ঘরের সমস্ত দরজা বন্ধ হইয়াছে, প্যারীবুড়ি কক্ষে একটা বড়ো ঝুড়িতে তরী তরকারী বাজার করিয়া ভিজিতে ভিজিতে জল কাঁদা ভাঙ্গিয়া আসিতেছে, আমি বিনা কারণে দীর্ঘ বারান্দায় প্রবল আনন্দে ছুটিয়া বেড়াইতেছি। আর মনে

পড়ে ইস্কুলে গিয়াছি ; দরমায় ঘেরা দালানে আমাদের ক্লাস বসিয়াছে ;—অপরাহ্ণে ঘনঘোর মেঘের স্তূপে স্তূপে আকাশ ছাইয়া গিয়াছে ;—দেখিতে দেখিতে নিবিড় ধারায় বৃষ্টি নামিয়া আসিল ; থাকিয়া থাকিয়া দীর্ঘ একটানা মেঘ-ডাকার শব্দ ; আকাশটাকে যেন বিদ্যুতের নখ দিয়া এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত কোন্ পাগ্‌লী ছিঁড়িয়া ফাড়িয়া ফেলিতেছে ; বাতাসের দমকায় দরমার বেড়া ভাঙ্গিয়া পড়িতে চায়, অন্ধকারে ভালো করিয়া বইয়ের অক্ষর দেখা যায় না—পণ্ডিত মশায় পড়া বন্ধ করিয়া দিয়াছেন ; বাহিরের ঝড় বাদলটার উপরেই ছুটাছুটি মাতামাতির বরাত দিয়া বন্ধ ছুটিতে বেঞ্চির উপরে বসিয়া পা দুলাইতে দুলাইতে মনটাকে তেপান্তরের মাঠ পার করিয়া দৌড় করাইতেছি। আরো মনে পড়ে শ্রাবণের গভীর রাত্রি, ঘুমের ফাঁকের মধ্য দিয়া ঘনবৃষ্টির ঝম্‌ঝম্ শব্দ মনের সুপ্তির চেয়েও নিবিড়তর একটা পুলক জমাইয়া তুলিতেছে ; একটু যেই ঘুম ভাঙিতেছে মনে মনে প্রার্থনা করিতেছি সকালেও যেন এই বৃষ্টির বিরাম না হয় এবং বাহিরে গিয়া দেখিতে পাই আমাদের গলিতে জল দাঁড়াইয়াছে এবং পুকুরের ঘাটের একটি ধাপও আর জাগিয়া নাই।

কিন্তু আমি যে-সময়কার কথা বলিতেছি সে সময়ের দিকে তাকাইলে দেখিতে পাই তখন শরৎঋতু সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিয়াছে। তখনকার জীবনটা আশ্বিনের একটা বিস্তীর্ণ স্বচ্ছ অবকাশের মাঝখানে দেখা যায়—সেই

শিশিরে ঝলমল করা সরস সবুজের উপর সোনা গলানো রৌদ্রের মধ্যে মনে পড়িতেছে দক্ষিণের বারান্দায় গান বাঁধিয়া তাহাতে যোগিয়া সুর লাগাইয়া গুন গুন করিয়া গাহিয়া বেড়াইতেছি—সেই শরতের সকালবেলায়।

"আজি শরততপনে প্রভাতস্বপনে
কী জানি পরাণ কী যে চায়।"

বেলা বাড়িয়া চলিতেছে—বাড়ির ঘণ্টায় দুপুর বাজিয়া গেল—একটা মধ্যাহ্নের গানের আবেশে সমস্ত মনটা মাতিয়া আছে, কাজ কর্ম্মের কোনো দাবীতে কিছুমাত্র কান দিতেছি না ; সেও শরতের দিনে।

"হেলাফেলা সারাবেলা
এ কী খেলা আপন মনে।"

মনে পড়ে দুপুর বেলায় জাজিম-বিছানো কোণের ঘরে একটা ছবি আঁকার খাতা লইয়া ছবি আঁকিতেছি। সে যে চিত্রকলার কঠোর সাধনা নহে—সে কেবল ছবি আঁকার ইচ্ছাটাকে লইয়া আপন মনে খেলা করা। যেটুকু মনের মধ্যে থামিয়া গেল কিছুমাত্র আঁকা গেল না সেইটুকুই ছিল তাহার প্রধান অংশ। এদিকে সেই কর্ম্মহীন শরৎমধ্যাহ্নের একটি সোনালিরঙের মাদকতা দেয়াল ভেদ করিয়া কলিকাতা সহরের সেই একটি সামান্য ক্ষুদ্র ঘরকে পেয়ালার মতো আগাগোড়া ভরিয়া তুলিতেছে। জানিনা কেন, আমার তখনকার জীবনের দিনগুলিকে যে-আকাশ যে-আলোকের মধ্যে দেখিতে পাইতেছি তাহা এই শরতের আকাশ, শরতের

আলোক। সে যেমন চাষীদের ধানপাকানো শরৎ তেমনি সে আমার গান পাকানো শরৎ,—সে আমার সমস্ত দিনের আলোকময় অবকাশের গোলা বোঝাই করা শরৎ—আমার বন্ধনহীন মনের মধ্যে অকারণ পুলকে ছবি আঁকানো গল্প-বানানো শরৎ।

সেই বাল্যকালের বর্ষা এবং এই যৌবনকালের শরতের মধ্যে একটা প্রভেদ এই দেখিতেছি যে সেই বর্ষার দিনে বাহিরের প্রকৃতিই অত্যন্ত নিবিড় হইয়া আমাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার সমস্ত দলবল সাজসজ্জা এবং বাজনা বাদ্য লইয়া মহা সমারোহে আমাকে সঙ্গদান করিয়াছে। আর এই শরৎকালের মধুর উজ্জ্বল আলোকটির মধ্যে যে উৎসব, তাহা মানুষের। মেঘরৌদ্রের লীলাকে পশ্চাতে রাখিয়া সুখদুঃখের আন্দোলন মর্ম্মরিত হইয়া উঠিতেছে, নীল আকা-শের উপরে মানুষের অনিমেষ দৃষ্টির আবেশটুকু একটা রঙ মাখাইয়াছে, এবং বাতাসের সঙ্গে মানুষের হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা-বেগ নিঃশ্বসিত হইয়া বহিতেছে।

আমার কবিতা এখন মানুষের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এখানে তো একেবারে অবারিত প্রবেশের ব্যবস্থা নাই; মহলের পর মহল, দ্বারের পর দ্বার। পথে দাঁড়াইয়া কেবল বাতায়নের ভিতরকার দীপালোকটুকুমাত্র দেখিয়া কতবার ফিরিতে হয়, শানাইয়ের বাঁশিতে ভৈরবীর তান দূর প্রাসাদের সিংহদ্বার হইতে কানে আসিয়া পৌঁছে। মনের সঙ্গে মনের আপোষ, ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছার বোঝাপড়া, কত বাঁকাচোরা

বাধার ভিতর দিয়া দেওয়া এবং নেওয়া। সেই সব বাধায় ঠেকিতে ঠেকিতে জীবনের নির্ঝরধারা মুখরিত উচ্ছাসে হাসি-কান্নায় ফেনাইয়া উঠিয়া নৃত্য করিতে থাকে, পদে পদে আবর্ত্ত ঘুরিয়া ঘুরিয়া উঠে এবং তাহার গতিবিধির কোনো নিশ্চিত হিসাব পাওয়া যায় না।

"কড়ি ও কোমল" মানুষের জীবননিকেতনের সেই সম্মুখের রাস্তাটায় দাঁড়াইয়া গান। সেই রহস্যসভার মধ্যে প্রবেশ করিয়া আসন পাইবার জন্য দরবার।

"মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে,
মানুষের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।"

বিশ্বজীবনের কাছে ক্ষুদ্র জীবনের এই আত্মনিবেদন।

শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী

দ্বিতীয়বার বিলাত যাইবার জন্য যখন যাত্রা করি তখন আশুর সঙ্গে জাহাজে আমার প্রথম পরিচয় হয়। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম্ এ পাস করিয়া কেম্ব্রিজে ডিগ্রি লইয়া বারিষ্টর হইতে চলিতেছেন। কলিকাতা হইতে মাদ্রাজ পর্য্যন্ত কেবল কয়টা দিনমাত্র আমরা জাহাজে একত্র ছিলাম। কিন্তু দেখা গেল পরিচয়ের গভীরতা দিনসংখ্যার উপর নির্ভর

করে না। একটি সহজ সহৃদয়তার দ্বারা অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি এমন করিয়া আমার চিত্ত অধিকার করিয়া লইলেন যে, পূর্ব্বে তাঁহার সঙ্গে যে চেনাশোনা ছিলনা সেই ফাঁকটা এই কয়দিনের মধ্যেই যেন আগাগোড়া ভরিয়া গেল।

আশু বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিলে তাঁহার সঙ্গে আমাদের আত্মীয়সম্বন্ধ স্থাপিত হইল। তখনো বারিষ্টরী ব্যবসায়ের ব্যূহের ভিতরে ঢুকিয়া পড়িয়া লয়ের মধ্যে লীন হইবার সময় তাঁহার হয় নাই। মক্কেলের কুঞ্চিত থলিগুলি পূর্ণ বিকশিত হইয়া তখনো স্বর্ণকোষ উন্মুক্ত করে নাই এবং সাহিত্যবনের মধুসঞ্চয়েই তিনি তখন উৎসাহী হইয়া ফিরিতেছিলেন। তখন দেখিতাম সাহিত্যের ভাবুকতা একেবারে তাঁহার প্রকৃতির মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার মনের ভিতরে যে সাহিত্যের হাওয়া বহিত তাহার মধ্যে লাইব্রেরি-শেল্‌ফের মরক্কো চামড়ার গন্ধ একেবারেই ছিল না। সেই হাওয়ায় সমুদ্রপারের অপরিচিত নিকুঞ্জের নানা ফুলের নিঃশ্বাস একত্র হইয়া মিলিত, তাঁহার সঙ্গে আলাপের যোগে আমরা যেন কোনো একটি দূর বনের প্রান্তে বসন্তের দিনে চড়িভাতি করিতে যাইতাম।

ফরাসী কাব্যসাহিত্যের রসে তাঁহার বিশেষ বিলাস ছিল। আমি তখন কড়ি ও কোমল-এর কবিতাগুলি লিখিতেছিলাম। আমার সেই সকল লেখায় তিনি ফরাসী কোনো কোনো কবির ভাবের মিল দেখিতে পাইতেন। তাঁহার মনে হইয়াছিল, মানবজীবনের বিচিত্র রসলীলা কবির মনকে

একান্ত করিয়া টানিতেছে এই কথাটাই কড়ি ও কোমল এর কবিতার ভিতর দিয়া নানা প্রকারে প্রকাশ পাইতেছে। এই জীবনের মধ্যে প্রবেশ করিবার ও তাহাকে সকল দিক দিয়া গ্রহণ করিবার জন্য একটি অপরিতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা এই কবিতা-গুলির মূল কথা।

আশু বলিলেন, তোমার এই কবিতাগুলির যথোচিত পর্য্যায়ে সাজাইয়া আমিই প্রকাশ করিব। তাঁহারই পরে প্রকাশের ভার দেওয়া হইয়াছিল। "মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে"—এই চতুর্দ্দশপদী কবিতাটি তিনিই গ্রন্থের প্রথমেই বসাইয়া দিলেন। তাঁহার মতে এই কবিতাটির মধ্যেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্মকথাটি আছে।

অসম্ভব নহে। বাল্যকালে যখন ঘরের মধ্যে বদ্ধ ছিলাম তখন অন্তঃপুরের ছাদের প্রাচীরের ছিদ্র দিয়া বাহিরের বিচিত্র পৃথিবীর দিকে উৎসুকদৃষ্টিতে হৃদয় মেলিয়া দিয়াছি। যৌবনের আরম্ভে মানুষের জীবলোক আমাকে তেমনি করিয়াই টানিয়াছে। তাহারও মাঝখানে আমার প্রবেশ ছিলনা, আমি প্রান্তে দাঁড়াইলাম। খেয়া নৌকা পাল তুলিয়া ঢেউ-য়ের উপর দিয়া পাড়ি দিতেছে তীরে দাঁড়াইয়া আমার মন বুঝি তাহার পাটনিকে হাত বাড়াইয়া ডাক পাড়িত। জীবন যে জীবনযাত্রায় বাহির হইয়া পড়িতে চায়।

কড়ি ও কোমল

জীবনের মাঝখানে ঝাঁপ দিয়া পড়িবার পক্ষে আমার সামাজিক অবস্থার বিশেষত্ববশত কোনো বাধা ছিল বলিয়াই যে আমি পীড়াবোধ করিতেছিলাম সে কথা সত্য নহে। আমাদের দেশের যাহারা সমাজের মাঝখানটাতে পড়িয়া আছে তাহারাই যে চারিদিক হইতে প্রাণের প্রবল বেগ অনুভব করে এমন কোনো লক্ষণ দেখা যায় না। চারিদিকে পাড়ি আছে এবং ঘাট আছে, কালো জলের উপর প্রাচীন বনস্পতির শীতল কালো ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে; স্নিগ্ধ পল্লবরাশির মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া কোকিল পুরাতন পঞ্চমস্বরে ডাকিতেছে—কিন্তু এ তো বাঁধাপুকুর এখানে স্রোত কোথায়, ঢেউ কই, সমুদ্র হইতে কোটালের বান ডাকিয়া আসে কবে? মানুষের মুক্ত জীবনের প্রবাহ যেখানে পাথর কাটিয়া জয়ধ্বনি করিয়া তরঙ্গে তরঙ্গে উঠিয়া পড়িয়া সাগরযাত্রায় চলিয়াছে তাহারই জলোচ্ছ্বাসের শব্দ কি আমার ঐ গলির ওপারটার প্রতিবেশীসমাজ হইতেই আমার কানে আসিয়া পৌঁছিতেছিল? তাহা নহে। যেখানে জীবনের উৎসব হইতেছে সেইখানকার প্রবল সুখদুঃখের নিমন্ত্রণ পাইবার জন্য একলা ঘরের প্রাণটা কাঁদে।

যে মৃদু নিশ্চেষ্টতার মধ্যে মানুষ কেবলই মধ্যাহ্নতন্দ্রায়

ঢুলিয়া ঢুলিয়া পড়ে সেখানে মানুষের জীবন আপনার পূর্ণ পরিচয় হইতে আপনি বঞ্চিত থাকে বলিয়াই তাহাকে এমন একটা অবসাদে ঘিরিয়া ফেলে। সেই অবসাদের জড়িমা হইতে বাহির হইয়া যাইবার জন্য আমি চিরদিন বেদনা বোধ করিয়াছি। তখন যে সমস্ত আত্মশক্তিহীন রাষ্ট্রনৈতিক সভা ও খবরের কাগজের আন্দোলন প্রচলিত হইয়াছিল, দেশের পরিচয়হীন ও সেবাবিমুখ যে দেশানুরাগের মৃদুমাদকতা তখন শিক্ষিতমণ্ডলীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল—আমার মন কোনো-মতেই তাহাতে সায় দিত না। আপনার সম্বন্ধে আপনার চারিদিকের সম্বন্ধে বড়ো একটা অধৈর্য্য ও অসন্তোষ আমাকে ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিত; আমার প্রাণ বলিত "ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুয়ীন!"

"আনন্দময়ীর আগমনে আনন্দে গিয়াছে দেশ ছেয়ে—
হের ঐ ধনীর দুয়ারে দাঁড়াইয়া কাঙালিনী মেয়ে।"

এ-তো আমার নিজেরই কথা। যে-সব সমাজে ঐশ্বর্য্যশালী স্বাধীন জীবনের উৎসব, সেখানে শানাই বাজিয়া উঠিয়াছে, সেখানে আনাগোনা কলরবের অন্ত নাই; আমরা বাহির প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছি মাত্র—সাজ করিয়া আসিয়া যোগ দিতে পারিলাম কই?

মানুষের বৃহৎ জীবনকে বিচিত্রভাবে নিজের জীবনে উপলব্ধি করিবার ব্যথিত আকাঙ্ক্ষা, এ যে সেই দেশেই সম্ভব যেখানে সমস্তই বিচ্ছিন্ন এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃত্রিমসীমায় আবদ্ধ। আমি আমার সেই ভৃত্যের আঁকা খড়ির গণ্ডির মধ্যে বসিয়া

মনে মনে উদার পৃথিবীর উন্মুক্ত খেলাঘরটিকে যেমন করিয়া কামনা করিয়াছি যৌবনের দিনেও আমার নিভৃত হৃদয় তেমনি বেদনার সঙ্গেই মানুষের বিরাট হৃদয়-লোকের দিকে হাত বাড়াইয়াছে। সে যে দুর্লভ, সে যে দুর্গম দূরবর্ত্তী। কিন্তু তাহার সঙ্গে প্রাণের যোগ না যদি বাঁধিতে পারি, সেখান হইতে হাওয়া যদি না আসে, স্রোত যদি না বহে, পথিকের অব্যাহত আনাগোনা যদি না চলে, তবে যাহা জীর্ণ পুরাতন তাহাই নূতনের পথ জুড়িয়া পড়িয়া থাকে, তাহা হইলে মৃত্যুর ভগ্নাবশেষ কেহ সরাইয়া লয় না, তাহা কেবলি জীবনের উপরে চাপিয়া চাপিয়া পড়িয়া তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে।

বর্ষার দিনে কেবল ঘনঘটা এবং বর্ষণ। শরতের দিনে মেঘ-রৌদ্রের খেলা আছে কিন্তু তাহাই আকাশকে আবৃত করিয়া নাই, এদিকে ক্ষেতে ক্ষেতে ফসল ফলিয়া উঠিতেছে। তেমনি আমার কাব্যলোকে যখন বর্ষার দিন ছিল তখন কেবল ভাবাবেগের বায়ু এবং বর্ষণ। তখন এলোমেলো ছন্দ এবং অস্পষ্ট বাণী। কিন্তু শরৎকালের কড়ি ও কোমলে কেবলমাত্র আকাশে মেঘের রঙ নহে সেখানে মাটিতে ফসল দেখা দিতেছে। এবার বাস্তব সংসারের সঙ্গে কারবারে ছন্দ ও ভাষা নানাপ্রকার রূপ ধরিয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছে।

এবারে একটা পালা সাঙ্গ হইয়া গেল। জীবনে এখন ঘরের ও পরের, অন্তরের ও বাইরের মেলামেলির দিন ক্রমে

ঘনিষ্ঠ হইয়া আসিতেছে। এখন হইতে জীবনের যাত্রা ক্রমশই ডাঙার পথ বাহিয়া লোকালয়ের ভিতর দিয়া যে সমস্ত ভালোমন্দ সুখদুঃখের বন্ধুরতার মধ্যে গিয়া উত্তীর্ণ হইবে তাহাকে কেবলমাত্র ছবির মতো করিয়া হাল্কা করিয়া দেখা আর চলে না। এখানে কত ভাঙাগড়া, কত জয়-পরাজয়, কত সংঘাত ও সম্মিলন! এই সমস্ত বাধা বিরোধ ও বক্রতার ভিতর দিয়া আনন্দময় নৈপুণ্যের সহিত আমার জীবন-দেবতা যে একটি অন্তরতম অভিপ্রায়কে বিকাশের দিকে লইয়া চলিয়াছেন তাহাকে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেখাইবার শক্তি আমার নাই। সেই আশ্চর্য্য পরম রহস্যটুকুই যদি না দেখানো যায় তবে আর যাহা কিছুই দেখাইতে যাইব তাহাতে পদে পদে কেবল ভুল বুঝানই হইবে। মূর্ত্তিকে বিশ্লেষণ করিতে গেলে কেবল মাটিকেই পাওয়া যায়, শিল্পীর আনন্দকে পাওয়া যায় না। অতএব খাষমহালের দরজার কাছে পর্য্যন্ত আসিয়া এইখানেই আমার জীবনস্মৃতির পাঠকদের কাছ হইতে আমি বিদায়গ্রহণ করিলাম।